কথামৃত – দ্বিতীয় পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য

শুরু হচ্ছে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে' প্রথম পরিচ্ছেদ। আগের পর্ব শেষ হয়েছিল যেখানে মাস্টারমশাই ঠাকুরের কাছে জানতে চাইছেন, আজ আর গান হবে কিনা? ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলরাম বাবুর বাড়ি আসতে বললেন।

কথামৃতে এখান থেকে আমরা দেখছি একটু একটু করে তারিখ আসতে শুরু হয়েছে। তবে এখনও সব তারিখ সেভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া নেই। যখনই উনি তারিখ দিচ্ছেন, পরে পরে ফুটনোট দিয়ে বলা হচ্ছে পঞ্জিকা অনুসারে তারিখ মিলছে না, এই তারিখ না হয়ে অমুক তারিখ হবে। তবে আমাদের কাছে এগুলোর কোন গুরুত্ব নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ট্রেনে দিল্লী গেলেন, সেই ট্রেন হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর না চার নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়ল, এর কোন দাম নেই। কিছু কিছু গবেষকরা আছেন, যাঁরা এর উপরেই বই এর পর বই লিখতে থাকেন। যদি তিন নম্বরের বদলে চার নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে ট্রেন ছাড়ত তাহলে কি হত?

'ক্যাণ্ডিট' ফরাসী সাহিত্যিক ভল্টায়ারের একটা খুব বিখ্যাত উপন্যাসের নাম, ফরাসী ভাষায় 'কোঁদা'। তাতে একজন ফিলজফার আছেন, যিনি সব কিছু জানেন, সবেতেই বিচিত্র বিচিত্র ব্যাখ্যা দেন। ক্যাণ্ডিটের শরীরের একটা সমস্যা হয়েছে, তখন ফিলজফার বলে দিলেন 'এ বাঁচবে না, এই এই সমস্যা হবে'। তারপর দেখা গেল ক্যাণ্ডিটের একটা ফোড়া হয়েছে। পুঁজ বেরিয়ে যেতেই ঠিক হয়ে গেল। এরপর ভদ্রলোক একটা বই লিখলেন, এই ফোড়া যদি বাম কানে না হয়ে ডান কানে হত, তাহলে এ-রকম হত। ক্যাণ্ডিট বইটা পড়েননি। পণ্ডিতরা এই রকমই, একটা কিছু বলে দিয়ে সেটাকে justify করবে, আর যদি ওটার conclusion দেখার সুযোগ না থাকে, তখন আরও বেশি বেশি করে justify করার চেষ্টা করতে থাকবে।

এক-একটা সাবজেক্টকে নিয়ে যখন কেউ পিএইচডি করে, বিশেষ করে বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী সাহিত্যে, পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয়। একা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরেই ভগবান জানেন কত পিএইচডি হয়ে গেছে। যদি রবীন্দ্রনাথকে সব থিসিসগুলো পড়তে দিয়ে বলা হয়, 'মশাই জানেন আপনার মনে এই এই ভাবনা ছিল, আর আপনি এই এই জিনিসগুলো লিখতে চেয়েছিলনে'? উনি আঁতকে উঠবেন, 'কি-সব লিখেছেরে ভাই! চিন্তা করা দূরে থাক, এ-জিনিসগুলির ব্যাপারে আমি তো কিছু জানিই না'। সেইজন্য আমাদের কাছে এই তারিখের কোন গুরুত্ব নেই। তবে এখান থেকে সেকশানটা পাল্টে যাচ্ছে।

যাই হোক, মাস্টারমশাই বলরাম বাবুর বাড়িতে এসেছেন, এখন যে বাড়ির নাম 'বলরাম মন্দির'। এখানে 'দোলযাত্রা' লিখছেন, দোলযাত্রার দিনই হবে, এতটা ভুল হবে না, কিন্তু তারিখটা মিলছে না। দেখছেন কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরকে ঘেরিয়া হরিনাম সংকীর্তনে মত্ত হয়ে আছেন। মাস্টারমশাই কয়েকটা নাম লিখছেন, তার মধ্যে রাখাল আছেন, পরবর্তিকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সবাই

সংকীর্তনে মত্ত, তার মধ্যে রাখালের ভাব সমাধি হয়ে গেছে, কোন হুঁশ নেই, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। রাজা মহারাজের এই রকম ভাব মাঝে মাঝেই হত। রাজা মহারাজের একটা বিখ্যাত ছবি আছে, উনি তামাক খাচ্ছেন, তামাক খেতে খেতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আছেন। বলা হয় যে, ঠাকুর যেমন সহজেই ভাব জগতে চলে যেতেন, রাজা মহারাজও চলে যেতেন। মনটাকে নামিয়ে রাখার জন্য উনি প্রায়ই ছেলেমানুষী করতেন বা কখন ছিপ ফেলে মাছ ধরতেন, কখন তাস খেলতে বসে যেতেন। মাস্টারমশাই বলছেন, রাখালের এই প্রথম ভাবাবস্থা, কিন্তু এনারা বলছেন, এটা দ্বিতীয় ভাব-সমাধি। এখন এত লোকের মাঝখানে রাখাল বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আছেন, ঠাকুর তাঁর বুকে হাত দিয়ে বলছেন, 'শান্ত হও শান্ত হও'।

ঠাকুরের এই জিনিসটা খুব মজার ব্যাপার। অন্য জায়গায় নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, নরেন দেখতে শুরু করলেন, জগৎটা ভুল, কলকাতা ভুল, গ্রহ, নক্ষত্র সব যেন মিলে এক হয়ে যাচ্ছে। নরেন চিৎকার করে বলছেন, 'এ কি করলেন আমার, আমার বাবা আছে, মা আছে'। ঠাকুর নরেনের বুকে হাত দিতেই নরেনের ওই ভাবটা উপশম হয়ে গেল। হৃদয়রাম একটু ভাবাবস্থা পাওয়ার জন্য ঠাকুরকে খুব পীড়াপিড়ী করছিল, ঠাকুর হৃদয়রামকে ছুঁয়ে দিলেন। হৃদয়রাম দেখছে জগৎ জ্যোতির্ময়, চিৎকার করে বলছে, 'মামা মামা চলো জগৎকে আমরা উপদেশ দিই'। ঠাকুর আবার বুকে হাত দিতেই হৃদয়রাম শান্ত হয়ে গেল। মথুর বাবুর সাথেও একই ব্যাপার হয়েছিল।

এই ধরণের একটা দুটো রেকর্ডই আমরা পাচ্ছি না, কত এই ধরণের ঘটনা আমরা ঠাকুরের জীবনে দেখছি। ভবিষ্যতে কেউ হয়ত বলবে – নরেনকে ঠাকুর ছুঁয়ে দিলেন আর নরেন দেখতে লাগল মানুষ, বাড়ি, ঘর, গাছপালা, নদী, গ্রহ, নক্ষত্র সব লয় হয়ে যেতে শুরু করে দিল, এগুলো সব বুজরুকি। হতেই পারে বুজরুকি। যদি একটা বুজরুকি হয়, তাহলে বলা যেতে পারে কাকতালীয় ব্যাপার, কোন ভাবে হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যদি কথামৃতি পড়ি, ঠাকুরের জীবনী যদি পড়ি, ঠাকুরের সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁদের জীবনী যদি পড়ি তখন দেখছি এই জিনিস মুহুর্মুহু ঘটছে। ছুঁয়ে দিচ্ছেন, ভাবাবস্থায় চলে যাচ্ছে; ছুঁয়ে দিচ্ছেন, ভাব প্রশমিত হয়ে যাচ্ছে। ধর্মের যত ইতিহাস আছে, কোথাও আমরা এই জিনিস পাই না। হয়ত কেউ করতেন, অবতাররা নিজের শক্তি দেখাবার জন্য কিছু তো একটা করতে হবে। কিন্তু এই জিনিসটা – ছুঁয়ে দিচ্ছেন ভাব হয়ে যাচ্ছে, ছুঁয়ে দিচ্ছেন ভাব উপশম হয়ে যাচ্ছে, আর কোথাও পাওয়া যায় না।

ঠাকুরের কথামৃত যদি না আসত, তাহলে আমরা ধরেই নিতে পারি ঠাকুর হারিয়ে যেতেন। স্বামীজীর কথা দিয়ে ঠাকুরকে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার থেকেও বেশী, শুধু কথামৃত যদি আমরা পড়তে থাকি, তাহলে আধ্যাত্মিক জগৎকে সে-ভাবে বুঝতে পারব না। প্রায়ই এই রকম হয়েছে যে, ঠাকুর কারুর দিকে একটু তাকিয়েছেন, তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন জীবন পরিবর্তনের কথা ভাবি, আমরা মনে করি তার টাকা-পয়সা এসে এল, মান-সম্মান বেড়ে গেল; জীবন পরিবর্তন একেবারেই তা না। জীবন পরিবর্তন মানে, ছোট্ট নদী, নৌকা যাচ্ছিল, কোথাও কোন বাঁকের মুখে আটকে গেছে, নৌকা আর এগোতে পারছে না। মাঝি মনে করছে নৌকা চলছে। পাশে দেখছে নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে নৌকাও চলছে। নদীর পারে একজন দাঁড়িয়েছিল, সে নৌকাকে ছোট্ট করে একটা ধাক্কা দিয়ে দিল, নৌকা আবার চলতে শুরু করল। আমার আপনার জীবনে এটাই হয়, নৌকাটা কোথাও ফেঁসে যায়।

ইদানিং কালে লুপস এণ্ড হুকস দেওয়া চেন এসেছে, লাগিয়ে দেওয়ার পর খুলতে গেলে চ্যাড় চ্যাড় আওয়াজ হয়। যেমনি লাগানো হবে হুকস গুলো লুপসের মধ্যে ফেঁসে যায়। আমাদের জীবন এই লুপস এণ্ড হুকস। জীবনে এত হুকস রয়েছে আর জগতে চারিদিকে এত লুপস রয়েছে, একটু অসাবধান থাকলে চারটে হুকস গিয়ে চারটে লুপসের মধ্যে ফেঁসে যায়। মহাপুরুষরা যখন আসেন, তাঁরা আমাদের

লুপসগুলো থেকে হুকসগুলোকে ছাড়িয়ে দেন। জগতের লুপসগুলির সাথে আমার হুকসগুলো ফেঁসে আছে, আমি মনে করছি আমি বেশ আছি। চাঁদ পৃথিবীকে চক্কর মেরে যাচ্ছে, সে কি জানে এর মধ্যে ও ফেঁসে আছে, চাঁদ মনে করছে আমি বেশ আছি। আমরা যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছি, আমরা কি টের পাই যে আমরা বন্ বন্ করে ঘুরে যাচ্ছি? জানি না, মনে করছি বেশ তো আছি। অবতাররা এসে একটা evolutionary push দেন।

আজকে আমরা যখন ভগবান বুদ্ধের কথাগুলো নিয়ে ভাবছি, যীশুর কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছি, তখন আমরা বলছি, ইনিই সেই। কথামৃত দিয়ে আমরা জানতে পারছি, অবতাররা শুধু কথা দিয়ে জগৎ, সমাজ, মানুষকে পাল্টান না। শুধু একটু তাকালেন, তাতেই ভিতরে যেন কি একটা হয়ে গেল, কিংবা একটু ছুঁয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কি যেন হয়ে গেল, সব কিছু অন্য রকম মনে হতে শুরু হয়ে গেল। শুধু যে কাউকে ভাবরাজ্যে ঠেলে দিচ্ছেন তা না, আবার ওখান থেকে নামিয়েও আনছেন। ঠাকুর এখন রাখালের ভাবাবস্থাটাকে শান্ত করে দিলেন।

সেখানে বর্ণনা করছেন, বলরাম বোস বাড়ির কর্তা, কিন্তু দেখলে বোধ হয় না যে তিনি বাড়ির কর্তা। এই বর্ণনার সাথে ঠাকুরের কোন সম্পর্ক নেই। বলরাম বোস ছিলেন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবরা স্বভাবেই খুব বিনয়ী হন। ভারতবর্ষে চিরদিনের এটা প্রথা ছিল যে, কোন উৎসব, অনুষ্ঠানাদি হলে বাড়ির যিনি কর্তা, বা বাড়ির যিনি সবচেয়ে বড়, তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করতেন। এখনও যখন বিবাহ আদি হয়, এটাই আমাদের প্রথা, এটা ভারতের সংস্কৃতি, বাড়ির যিনি সবচেয়ে বড় তিনি সবাইকে হাতজোড় করে আপ্যায়ন করেন। এনারা বাড়িতে থাকার সময়েও খুব বিনয়ী হন। কোন দুষ্ট লোক বা বদমাইশ যদি অতিথি রূপে বাড়িতে এসে যায়, তাকেও তিনি বিনয় সহকারেই সৎকার করেন। বলরাম বোস হলেন ভারতের যে পরম্পরা, আর যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বড় হয়েছেন তার মূর্তরূপ। সেখানে এখন গান আদি হচ্ছে। তার কিছু বর্ণনা নেই। মাস্টার সবে আসছেন, সব ভক্তদের তিনি জানেন না।

এর কদিন পর মাস্টারমশাই আবার দক্ষিণেশ্বর গেছেন, সেখানে তিনি দেখছেন, শিবমন্দিরের সিঁড়ির উপর ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। ঠাকুর যে কখন ভাবে চলে যাবেন তার কোন ঠিক ছিল না। ভাবে কখন কখন তিনি যেখানে সেখানে পড়েও যেতেন, একবার ভাবের অবস্থায় পড়ে গিয়ে দাঁত ভেঙে গেল, আরেকবার হাত ভেঙে গেল, এগুলো ওনার হতেই থাকত। সেইজন্য ঠাকুরের সঙ্গে সব সময় একজনকে থাকতে হত। কদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন লিখেছে, লোকেরা বলে ঠাকুরের নাকি epilepsy ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার উত্তর দিলাম – এই epilepsy দিয়ে যদি স্বামী বিবেকানন্দের মত লোক তৈরী হয়, আমরা এই ধরণের অনেক epilepsy কেস চাই।

আমাদের দেশ চিরদিনই মুর্খের দেশ, আমরাও চিরদিন মুর্খই ছিলাম, এখন সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে, ঠাকুরের অশেষ কৃপায় যেখানে পুরোদমে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার কথা, বদলে সেখান পুরো অজ্ঞান ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি লোকেদের তাই বলি, আজকের দিনে একজন সফল ব্যক্তি হওয়া অনেক সহজ। কারণ মানুষ এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দৈত্য দানবের পাল্লায় পড়ে গিয়ে এত শ্যালো থেকে শ্যালোতর হয়ে গেছে যে কল্পনাই করা যাবে না। একটু নিজেকে আলাদা করে নিন, দেখবেন ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে, গোলের পর গোল দিয়ে যান। ইউটিউবের চ্যানেলগুলো একবার খুলে দেখুন, কি-সব জঘন্য জঘন্য জিনিসগুলো লোকেরা আপলোড করে যাচ্ছে। টকস্ গুলো শুনুন, কি শ্যালো। কিন্তু তাদেরই নাম। কেন? ঠাকুর বলছেন, ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা, যারা বক্তা তারাও সেই রকম, আর যারা শ্রোতা তারাও সেই রকম, দু-জন দু-জনকে নিয়ে আনন্দ করছে। কদিন চলবে? কোন দিন চলবে না, এখানেই শুরু এখানেই শেষ।

আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও জীবনে সাফল্য পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। কারণ তখন লোকেদের মধ্যে দম ছিল, পড়াশোনা করা জ্ঞানী, মননশীল লোক প্রচুর ছিল। তাঁদের মাঝখানে নিজেকে জায়গা পেতে গেলে প্রচুর পরিশ্রম করে ওই পর্যায়ে আগে নিয়ে যেতে হত। তখন নিউজপ্যাপারে ইংরাজীতে তাঁরা যা কিছু লিখতেন, সেই ইংরাজীর একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল, বাংলাতেও যখন কিছু লিখতেন, সেখানেও একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল। এখন কোন স্ট্যাণ্ডার্ডই নেই। সবাই লিখছে, সবাই ছাপাচ্ছে, সবাই নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে যাচ্ছে – আমি বড়, আমি বড়, আমি বড়। কিন্তু বর্তমান কালে কোন কিছুতে যদি কেউ সাফল্য পেতে চায়, তার জন্য এটা অত্যন্ত সহজ। ভিতরে যদি দম থাকে সাফল্য পাওয়া অত্যন্ত সোজা, দম যদি ভিতরে না থাকে, তাহলে আপনি কোথাও সফল হতে পারবেন না। সবাই সমান ভাবে মনে করে যাচ্ছে, ফেসবুক, ইউটিউব দিয়ে রাতারাতি আমি ফ্যামাস হয়ে যাব, কোটিপতি হয়ে যাব। কিন্তু জানে না যে, ওর মত একগাদা লোক আগে থেকেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কারুর মধ্যে কোন seriousness নেই। এই অজ্ঞানগুলো ছড়ায় বলেই, ঠাকুরের ভাবগুলিকে কেউ মৃগিরোগ বলছে, কেউ মাথার গণ্ডগোল বলছে, কেউ নার্ভের রোগ বলছে। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে একটু জানেন, বোঝেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন, ঠাকুরের এটা কি অবস্থা।

এরপর মাস্টারমশাই কয়েকদিন পরের কথা বলছেন। ঠাকুর মায়ের মন্দির থেকে ঘরে ফিরছিলেন। আর তখনই মাস্টারমশাই কলকাতা থেকে এসেছেন, ঠাকুর তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের সামনের শিবমন্দিরের সিঁড়িতে এসে বসলেন। কিন্তু মা কালীর মন্দিরে চোখ পড়তেই হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েলেন। ঠাকুর জগন্মাতার ভাবাবিষ্ট হয়ে মার সাথে কথা বলছেন। কেউ যদি এই অবস্থায় ঠাকুরকে দেখেন, মনে করবেন, ঠাকুর নিজের সাথেই বক্ বক্ করে যাচ্ছেন। ঠাকুরকে যারা একটু সন্দেহ করছিল যে, ঠাকুরের মাথায় গণ্ডগোল আছে, তারা এবার নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, লোকটা সত্যি সত্যিই পাগল। কিন্তু কেউ যদি একটু মনযোগ দিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন ঠাকুর কি বলছেন, তাহলে তাঁরা শুনতে পেতেন ঠাকুর মাকে বলছেন – "**মা সব্বাই বলছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান–সকলেই বলে, আমার ধর্ম ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়ি তো ঠিক চলছে না**"।

মানুষ কখনই নিজের ভুল মানতে পারে না, ছোট বাচ্চাও নিজের দোষ কখন স্বীকার করে না। আমরা অনেক সময় দেখি, যাকে আমরা দোষী প্রমাণিত করে দিতে পারি, তাকে আমরা পিষে ফেলার মতলব করে বলতে থাকি – মেনে নিন আপনি ভুল করেছেন। কেন সে মানতে যাবে! কারণ যে দোষ করেছে, সে যদি মেনে নেয় দোষ করেছে, লোকটি মরে যাবে। যদি আপনি না মনে করেন যে, আপনি জগতের শ্রেষ্ঠতম, আপনি যদি মনে না করে আপনি পুরো ঠিক, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মানসিক সমস্যা আছে, আপনার উচিত একজন মনোবিদের পরামর্শ নেওয়া। মানুষ মাত্রই মনে করে, I am the best, I am always correct, কেউ এটা মুখে বলে বেড়ায়, কেউ মুখে বলতে চায় না। যারা মুখে বলে না, অনেক সময় বড়দের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলবে, হ্যাঁ যা বলছেন ঠিক। বুঝবেন দুটোর মধ্যে একটা – হয় লোকটি ভিতর থেকে একেবারে শেষ হয়ে গেছে, তাকে পিষে ফেলা হয়েছে, আর তা নাহলে লোকটি দু-রকম জীবন চালাচ্ছে, এখানে এক রকম অন্য জায়গায় আরেক রকম দেখাবে। যাদের এই রকম দাসসুলভ মনোভাব থাকে তারাই পরে ডিক্টেটার হয়, এরাই বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করবে। যাদের দেখবেন খুব বিনয়ের ভাব, যেখানে বিনয় দেখাবার দরকার নেই, সেখানেও ইয়েস স্যার, ভেরি গুডমর্নিং স্যার, আপনি স্যার একেবারে ঠিক বলছেন; এরাই বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করবে। আর যদি বাড়িতে স্ত্রী বস্ থাকে, স্ত্রী যদি ডিক্টেটরশিপ চালায়, তাহলে রাস্তায় যখন থাকবে, তখন যে কোন ছুতোতে যে কোন লোককে শেষ করে দিতে চাইবে। সেখানেও যদি ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে, তাহলে বুঝবেন লোকটাকে পিষে শেষ করা হয়ে গেছে। যাদের মধ্যে সত্যিকারের বিনয় থাকে, তাদের মধ্যে একটা আলাদা individuality থাকে, ওই individuality

কোথাও compromise হয় না। মানুষ মাত্রই মনে করে, I am the best. I am always correct। একবার যদি তার বোধ হয়ে যায়, আমি ভুল, তার এমন sense of guilt, sense of sin আসবে যে সে মরে যাবে, বাঁচতে পারবে না।

আমাদের মনে হতে পারে, তাহলে সে শিখবে কি করে? শিখবে, যদি কোন ভাল আচার্য পায়। মানুষ ইদানিং কালে এত শ্যালো হয়ে যাচ্ছে কেন? কারণ সোস্যাল মিডিয়া এখন গুরুর জায়গা নিয়ে নিয়েছে। আগেকার দিনে লোকেরা জানত, পাড়াতে ইনি ভাল লোক, তাঁর সঙ্গে হয়ত কথা হল, প্রথমের দিকে তাঁকে হয়ত মানতে পারছে না, কিন্তু ধীরে ধীরে মানতে শুরু করে। কারুর সামনে গিয়ে মাথা নত করে দেওয়া এত সহজ ব্যাপার না, মাথা যতক্ষণ কারুর সামনে নত না করা হচ্ছে ততক্ষণ আপনি কিছু শিখবেন না। কিন্তু আচার্যে বিশেষত্ব এটাই যে, আপনাকে তিনি কখন কেঁচো বানাবেন না। একজন সত্যিকারের ভাল আচার্য আর একজন শিষ্যের মধ্যে সব সময়ের সম্পর্ক হল পিরামিড আর মরুভূমির মত। পিরামিড রয়েছে, আর তার সামনে বালি রয়েছে, বালির সাথে পিরামিডের সম্পর্ক হল, বালি জানে আমি কোন দিন পিরামিড হতে পারব না, আবার পিরামিডের অস্তিত্বকে পূর্ণ করে বালি, বালির অস্তিত্বকে পূর্ণ করে পিরামিড, যেখানে পিরামিডগুলি আছে। যে আচার্য শিষ্যকে individuality দিচ্ছে না, সে আচার্য হওয়ার যোগ্য না।

আমাদের ভালর জন্য কেউ যদি কিছু বলে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা রেগে তাকে বলি – উপদেশ দেবেন না, আগে উপদেশগুলো নিজের কাজে লাগান। কারণ আমাদের যারা কিছু বলছে, তারা আমাদের যে ব্যক্তিত্ব, আমাদের যে individuality তার উপর পা রেখে উপদেশ দেয়। আমি কি যা তা লোক নাকি যে আপনার কথা আমাকে শুনতে হবে। আমি যদি আপনার সামনে মাথা নত করি, আমি শেষ হয়ে যাব, আমি নিশ্চিত যে আমি শেষ হয়ে যাব। আমি যদি জানিও যে আমি ঠিক না, তাও মানব না, কারণ মেনে নিলে আমি শেষ, আমার identity crisis তো পরে তার আগে আমার identityকেই দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দেবে, এ জিনিস আমি কখনই হতে দেব না। নরেন যখন স্কুলে পড়ছেন, সেখানে শিক্ষকের সাথে কি নিয়ে একটা মত বিরোধ হয়েছে, নরেন স্কুল ছেড়ে দিলেন – আপনার কথা আমি মানব না। নরেন ঠিক ছিল তাই স্কুল ছাড়লেন, আপনার ছাড়ার দম আছে? আপনার বাবা-মা স্কুল থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে আনবেন? আর নরেন যদি ভুল থাকত, তাও স্কুল ছাড়ত। একজন মজা করে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলকে নিয়ে বলছিলেন – শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থাৎ গদাধর চট্টোপধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে কোন দিন ভর্তি হতেই পারতেন না। আর নরেন যদি ভুলে ভর্তি হয়ে যেত, কদিন পরে মিশনের স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসত। কাউকে যদি আইডেনটিটি না দেওয়া হয়, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে যদি সত্যিকারের নজর না দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু আপনি তাকে বিনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আর ধর্ম পথে যদি আপনি এটা করেন, যেমন যারা ধর্মের নাম করে খুন, বদমাইশি করে বেড়াচ্ছে; আপনি তাদের মত একজন হয়ে যাবেন। ঠাকুর ধর্ম স্থাপনের জন্য অবতার হয়ে এসেছেন। এই ধর্ম স্থাপনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল, আপনি সমাজে, পরিবারে যা কিছু করছেন, কার সামনে মাথা নত করছেন, কার সামনে করছেন না, এগুলো গুরুতপূর্ণ না, আপনার আসল স্বরূপ হল আত্মা। আপনাকে জানতে হবে সত্যটা কি। আপনি মনে করবেন যে, আপনিই ঠিক। সেটাই ঠাকুর বলছেন, মা সবাই বলছে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। কারণ যে জানে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে না, সে সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা ঠিক করে নেবে।

অনেক আগেকার একটা জোক, ইদানিং কালে এটা আর খাটবে না। বলা হয় যে, চীন দেশে একটা কারখানায় একজন লোক পাঁচ মিনিট দেরীতে গেছে। বলা হল এর গলাটা কেটে দাও। তখন মাও সে তুঙের কাল, খুব কড়া শাসন। দেরীতে এসেছে মানে দেশের ক্ষতি করেছে। আরেকজন লোক কারখানায় পাঁচ মিনিট আগে এসেছে, বলা হল, ওর গলাটা কেটে দাও, গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য এখানে

আগে এসে বসে আছে। আরেকজন একেবারে টাইমে এসেছে, এক্ষুণি ওর গলা কাটো, কারণ এ চোরাই চালান করা ঘড়ি পড়েছে। কারণ চাইনিজ ঘড়ি কখন ঠিক টাইম দেবে না।

মানুষ যদি জানে আমার ঘড়ি খারাপ, সে ঘড়িটা ঠিক করে নেবে। যাদের ঘড়ি পাঁচ মিনিট ফাস্ট চলে, বুঝবেন এরা নার্ভাস প্রকৃতির লোক, জীবনে কোন দিন সফল হতে পারবে না, কারণ আত্মবিশ্বাসটা নেই। যাদের ঘড়ি স্লো চলে, এরা এক-একটা অপদার্থ, এদের এতটুকু হুঁশ নেই যে, আমার ঘড়ি ঠিক রাখতে হবে। আর যারা তাদের ঘড়িকে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে রাখে, বুঝবেন এদেরই মধ্যে পোটেনশিয়ালিটি আছে যারা জীবনে উঠবে, কারণ সে particular to perfection, I want to be perfect। আগেকার দিনে রেডিওর সামনে ঘড়ি নিয়ে বসে থাকত, রেডিওতে সিগন্যাল ট্যুনিং শেষ হওয়ার পর যখন বলত, 'আকাশবাণী কলকাতা' মানে সকাল ছটা বাজল, লোকেরা তখন নিজেদের ঘড়িটা কাঁটায় কাঁটায় মেলাতেন। সবাই বলে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে, এমনিতে মনে হবে খুব সাধারণ কথা, আসলে কিন্তু খুব গভীর এর তাৎপর্য।

ঠাকুর বলছেন, **"খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান – সকলেই বলে আমার ধর্ম ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়ি তো ঠিক চলছে না। তোমাকে ঠিক কে বুঝতে পারবে। তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হলে সব পথ দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছান যায়"**। ঠাকুর যে খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমানের কথা বলছেন, যারা ধর্মের অনুশীলন করছেন, তাঁদেরকে নিয়ে ঠাকুর বলছেন। যীশু যদি থাকতেন, মহম্মদ যদি থাকতেন, তাঁদেরকে নিয়ে বলতেন না, ভগবান বুদ্ধের নামেও বলতেন না, ঠাকুর এখানে যারা তাদের নিজস্ব ধর্মের অনুগামী, তাদেরকে নিয়ে বলছেন। সব ধর্মের আচার্যরা ঠিক থাকেন, কিন্তু আচার্যের যে চেলাগুলো হয়, এরাই সব গোলমাল করে বসে। পরে পরে আমরা ঠাকুরের অনেক উপমা পাবো, যেখানে ঠাকুর পরিষ্কার করে বলছেন যে, তিনি মাকে জেনেছেন।

অনেক আগে একবার আমেরিকার একজন প্রফেসর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলাত্মক ধর্ম পড়াতেন। কিভাবে কিভাবে আমার সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। একটা আশ্রমে কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন, তাঁরা ওনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উনি খুব জোর দিয়ে বড় গলায় বলতে লাগলেন, 'রামকৃষ্ণ বলছেন কারুর ঘড়ি ঠিক চলছে না। উনি গিরগিটির কথা বলছেন, যে গিরগিটিকে দেখেছে, সে মনে করছে গিরগিটির এই রঙ, কিন্তু গাছের তলায় যিনি বসে আছেন, তিনি জানছেন গিরগিটির অনেক রঙ'। বলছেন যে, 'আমি কি করে মেনে নেব, রামকৃষ্ণ ঠিক আর বাকিরা সবাই ভুল? ঠাকুর বলছেন, কারুর ঘড়ি ঠিক চলছে না। তাহলে আপনি যখন বলছেন, তখন আপনার ঘড়িটাও ভুল চলছে। যদি আপনিও ভুল থাকেন, তাহলে কে কার সঙ্গে মেলাবে? আপনি যখন বলছেন, সবাই মনে করছে তার ধর্মই ঠিক, কিন্তু তা নয়। কিন্তু আপনি যখন বলছেন, তখন সেটাও তো ভুল হয়ে যায়। যদি কারুরই ঘড়ি ঠিক না চলে, তাহলে মশাই আপনার ঘড়িও ঠিক চলছে না। তাহলে আপনার কথাও নেওয়া যাবে না'। এটা ছিল অধ্যাপকের মত।

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ঠাকুরের কথা এই জন্যই নেওয়া যাবে, কারণ ঠাকুর বলছেন, যিনি সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেন বা আমরা যেটা বললাম, রেডিও থেকে যিনি মিলিয়ে নেন। মেলানো হয় তাঁদের সাথে, যাঁরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করেছেন। ইদানিং কালে তো হাজার হাজার পরমহংস, বাবাজীরা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে, কাদের আমি বিশ্বাস করে আমার ঘড়ি মেলাবো? কিন্তু পরমহংসের লক্ষণ আছে, কথামৃতে মাঝে মাঝেই ঠাকুর লক্ষণের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, যিনি পরমহংস, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁর কি কি লক্ষণ আছে। তার মধ্যে প্রথম লক্ষণ হল, তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী হবেন, নামযশের পিছনে দৌড়াবেন না। যাঁকে দেখবেন মেয়েরা সব সময় ঘিরে রেখেছে, মেয়েরা পূজো করছে, প্রচুর টাকা-পয়সা আছে, মান-সম্মানে একজন সেলিব্রেটি হয়ে গেছেন, বিশাল আশ্রম চালাচ্ছেন,

বুঝবেন, আর যাই হয়ে থাকুক, জ্ঞান হয়নি। আজ এই সেমিনার, কাল অমুক সেমিনার, এখানে ওখানে লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছে, বুঝবেন গোলমাল আছে।

যিনি জ্ঞানী, তাঁর কথার মধ্যে একটা ওজন থাকে। আমরা যেটা পপুলারিটি মনে করি, সেটা থাকে না। আপনি বলতে পারেন, কেন তা হবে, স্বামীজী জীবনের দিকে তাকান, তিনি কত পপুলার, তাঁর কত ভক্ত, কত আশ্রম, কত টাকা। না, একেবারেই না। ওনার কাছে একটা কানাকড়িও ছিল না, যা ছিল সব রামকৃষ্ণ মিশনের ছিল। আমরাও যখন ডোনেশান চাইতে যাই, নিজেদের জন্য চাই না, সঙ্ঘের জন্য চাই। সঙ্ঘ কিসের জন্য? মানুষের সেবার জন্য। আর ভক্ত ভক্তানি? তাঁরাও কাজের জন্যই ছিলেন, সবার বায়োগ্রাফি যদি দেখেন, দেখবেন সবাই বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত। আর ঠাকুর তো সব কিছু থেকে আলাদা ছিলেন। যিনিই পরমহংস, যেমন যীশু, তিনি যেমন পরিষ্কার করে বললেন, তোমরা যে মনে করছ তোমাদের ঘড়ি ঠিক, আসলে তোমাদের ঘড়ি ঠিক নেই। ভগবান বুদ্ধ হিন্দুদের ঠিক একই কথা বললেন, তোমরা মনে করছ তোমাদের ঘড়ি ঠিক, কিন্তু তোমাদের ঘড়ি ঠিক নেই, কারণ আমি দেখেছি, আমার ঘড়ি ঠিক। প্রমাণ কি? এক্ষুণি দেখতে পাবে প্রমাণ, আমাকে যদি ক্রুশবিদ্ধ করে দাও, আমাকে যদি শূলে চড়িয়ে দাও, দেখবে আমার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। তাতেই বোঝা যাবে তুমি ভুল। তাহলে খ্রীশ্চান আর জুহুরা যদি লড়াই করে? দুজনেই ভুল। কারণ যতক্ষণ তুমি যীশুর উপর confine থাকছ, যীশুকে নিয়ে যতক্ষণ বলছ, ততক্ষণ তুমি ঠিক থাকবে। কারণ ওটা ঈশ্বরীয় কথা, ওটা অবতারের কথা। যেমনি তুমি নিজের উপর চলে আসবে, তখনই তোমার গোলমাল লাগবে। কারণ, খ্রীশ্চানরা বলবে, আমার পথ একমাত্র ঠিক, ইসলাম বলবে, একমাত্র আমার পথটাই ঠিক, হিন্দুরা বলবে, একমাত্র আমার পথই ঠিক। তার মানে বাকিদের তুমি জানো না।

সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, **"মা, খ্রীষ্টানরা গির্জাতে তোমাকে কি করে ডাকে, একবার দেখিও"**। ঠাকুরের উদার ভাব, যেটা মাস্টারমশাই একটু আগে বললেন। এই ভাব শুধু ঠাকুরের না, হিন্দুরা স্বভাবেই inclusive হয়। সবাইকে নিয়ে চলতে গিয়ে হিন্দুদের প্রচুর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের এখানে শূদ্রদের নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়, যদি ভাল করে আমরা দেখি, এগুলো আমাদের খুব serious problem। তবে বিভিন্ন সভ্যতার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে ধর্মের নামে ওরা বিভিন্ন দেশকে গোলাম বানিয়ে রেখে ছিল, কিভাবে অন্য জায়গা থেকে সব কিছু লুট করে নিয়ে আনত, আর কিভাবে এক অপরকে মারত। হিন্দুর কখন ধর্মের নামে এই ধরণের লুণ্ঠন, গোলাম করে রাখার মত কোন কাজ করত না। হিন্দুরা সবাইকে হৃদয়ে একটা স্থান দিত। ওই স্থানে কেউ উঁচু থাকবে, কেউ নিচু থাকবে; কিন্তু খুন করা, শোষণ করা, লুট করা, এই জিনিসগুলো হিন্দুদের মধ্যে কখনই ছিল না। এত অত্যাচার নিপীড়ণ হলে মানুষ নিজেকে তখন বাঁচাতে চায়, এই যে inclusivenessএর কথা বলা হল, সবাইকে নিয়ে চলার যে মানসিকতটা, এটা তখন দমে যায়। এখন ভারত স্বাধীন, হিন্দুদের উপর অত্যাচার হওয়ার কথা না। আমরা এখন যেমনটি তেমনটি হতে পারি। আমরা মুসলমানদের সাথে নমাজ পড়তে পারি, খ্রীশ্চানদের সাথে গির্জায় গিয়ে পূজা করতে পারি। কিন্তু একটা সময় অবস্থা খুব খারাপ ছিল, তখন এগুলো করা যেত না।

সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, **"কিন্তু মা, ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালীঘরে যদি ঢুকতে না দেয়? তবে গির্জার দোরগোড়া থেকে দেখিও"**। ঠাকুর খ্রাইস্টের সাধনা করেছিলেন, পরে তিনি চার্চে গিয়ে ওদের পূজা আদি করার পদ্ধতি দেখেছিলেন। ঠাকুর অবতার, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু মা কালীকে ছাড়তে পারবেন না। ঠাকুরকে আমরা অবতার বলি, কেউ সিদ্ধ পুরুষ বলেন, কেউ একজন বড় মহাত্মা বলেন; কিন্তু একটু গভীরে গেলে আমরা দেখছি, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এক শিশু, মা কালীর শিশু। শিশু যেমন মায়ের কোলে বসে লাফালাফি করে, দাপাদাপি করে, অনেক কিছু করে, ঠিক তেমনি ঠাকুর যেন মা কালীর কোলে আছেন, আর মায়ের কোল থেকে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন। ঠাকুর যাই করুন, তিনি মাকে ছাড়তে পারবেন না।

অদ্বৈত সাধনা হয়ে গেছে, তিনি নিজেও জানেন যে তিনি অবতার, অনেক কিছু করেছেন, অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি মাকে ছাড়ছেন না। দেববাণীতে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ ঈশ্বরও আছেন, সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও তিনি অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত, তাও তিনি তাঁর মা কালী অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছাড়েননি। আচার্য শঙ্কর ছিলেন অদ্বৈতের শেষ কথা, তিনিও দেবী-দেবতাদের নিয়ে প্রচুর সুন্দর সুন্দর স্তব-স্তুতি রচনা করেছেন।

এরপর মাস্টারমশাই আরেক দিনের কথাতে চলে যাচ্ছেন, যেখানে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণের কথা আসছে। এখনও তারিখগুলো সঠিক ভাবে আনতে পারছেন না। কালীকৃষ্ণ খুব নেশা করতেন। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বললেন, “**শুঁড়ির দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এসো; সেখানে এক জালা মদ আছে**”। কালীকৃষ্ণের বন্ধুটি হলেন আমাদের মাস্টারমশাই। ভাল মদ আছে শুনে কালীকৃষ্ণ এসে গেছেন। “**মাস্টার আসিয়া বন্ধুকে যাহা বলিয়াছিলেন, প্রণামান্তর ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন**”।

ঠাকুর হেসে বলছেন, “**ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা; প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার। জ্ঞানবিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড়ই কঠিন**”। এই কথা বলে ঠাকুর গান করছেন – কে জানে কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন, ইত্যাদি।

এখানে দুটো স্তরে কথা চলছে। যে কোন মানুষ, যিনি একটা বিষয়ের মধ্যে গভীর ভাবে ডুবে থাকেন, তা যে কোন বিষয়েই হোক না কেন; যেমন একজন নামকরা গণিতজ্ঞের কাছে গিয়ে যদি কথা বলতে শুরু করেন, দেখবেন দু-মিনিটের মধ্যে তিনি অঙ্কের ইক্যুয়েশানস্, প্যারামিটারস, পেরিমিটারস্ ইত্যাদির মধ্যে ঢুকে যাবেন। একজন পদার্থবিদের কাছে যান, তিনি যদি সত্যিই ফিজিক্সের মধ্যে ডুবে থাকেন, দু মিনিটের মধ্যে ফিজিক্সের থিওরীগুলোর মধ্যে ঢুকে যাবেন। বিষয়ী লোকের কাছে যান, দু মিনিটের মধ্যে নারী-শরীর নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দেবে। আর হাভাতে লোকের কাছে যান, যাদের কোন বিষয় নেই, দু মিনিটের মধ্যে মমতা-মোদীকে নিয়ে বলতে শুরু করবে, পাড়ার অমুকের ছেলে কোন মেয়ের সাথে কি করছে, অমুক অফিসে কত ঘুষ নেয়, আর তা নাহলে পলিটিক্স নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দেবে। এরা হল সেই গরু, ঠাকুর আগে যে গরুর কথা বললেন, ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে। নিজের সময় সবাই চরিত্রবান ছিল কোন কাজে লাগেনি। একটা মিথ্যা কথা বলারও ভিতরে দম নেই, এরা আবার অপরের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করে।

ঠাকুরের ভিতরটা সব সময় মায়ের প্রতি ভালবাসায়, ঈশ্বরীয় ভাব বা ধর্মভাবে একেবারে টইটুম্বুর হয়ে আছে। মজা করে শুধু বলা হল, সেখানে চল এক জালা মদ আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর সুরাতে চলে গিয়ে ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দের কথা বলতে শুরু করেছেন। ঠাকুর সব জায়গায় এই তিনটে আনন্দের কথা বলতেন – বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। সংসারে যে সুখ, এটাকে বলছেন বিষয়ানন্দ। বিষয়ানন্দে মানুষ আনন্দ পায় ঠিকই, কিন্তু ওই আসল আনন্দটা সেখানে পায় না। ভজনানন্দ হল, মানুষ যখন ভগবানের নামগুণগান করতে করতে মাতোয়ারা হয়ে যায়। একটু আগে দেখলাম, রাখাল কি রকম মাতোয়ারা হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছেন। ব্রহ্মানন্দ, অর্থাৎ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করে যে আনন্দ হয়, এই আনন্দের তুলনা কোন কিছুর সাথে করা যায় না।

মানুষ মদ্যপান করে সুরার রসে ডুবে যায়, রসে আমরা সবাই ডুবে আছি। আচার্য শঙ্কর বলছেন *বালস্তাবৎক্রীড়াসক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন পরমিব্রহ্মহি কপি ন লগ্নঃ।* এই যে *রতঃ*, ডুবে থাকা, সবাই কিছু না কিছুর মধ্যে ডুবে আছে। মানুষ বাচ্চা বয়সে খেলাধূলাতে ডুবে থাকে। তরুণ হয়ে গেল মানুষ কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত হয়ে যায়, বৃদ্ধাবস্থায় সবাই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। বাড়ির গৃহিণীরা টিভি সিরিয়ালে মত্ত, সিরিয়ালের চরিত্রগুলি দেখে কখন হাসবে, কখন কাঁদবে। একবার যদি কেউ হরিনামের আস্বাদ পেয়ে যায়, তখন সে দেখে এর স্বাদ একেবারেই অন্য ধরণের। আর ঈশ্বরের

কৃপায় একবার যদি ব্রহ্মানন্দের একটু আস্বাদ পায়, তখন সে বুঝতে পারে, তাই তো এতক্ষণ এগুলো আমি কি করছিলাম!

মানুষ কিভাবে সাধারণ জিনিসকে বিরাট কিছু মনে করে, এগুলোকে নিয়ে আমাদের পরম্পরায় অনেক মজার মজার কাহিনী আছে। অশ্বত্থামাকে তার মা আটাগোলা জল দিয়ে বলছে দুধ। অশ্বত্থামা যেদিন আসল দুধ খাবে তখন বুঝবে আটাগোলা জল আর দুধের কি তফাৎ। এই বলে ঠাকুর বলছেন, "**মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা**"। কথামৃতে এই কথাটা অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসবে। "**ভক্তিই সার**"। কি রকম ভক্তি? ঠাকুর বলছেন, গোপ-গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে যে-রকম ভালবাসতেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে গেলেন, এরা সবাই কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন।

মানুষ যাকে ভালবাসে তার নাম সে নেয়, যাকে ভালবাসে তারই সঙ্গ পেতে চায়। ঠাকুরকে যদি ভালবাসি, ঠাকুরের দুটো কথা শুনতে ইচ্ছে করি, ঠাকুরের যারা ভক্ত তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই, ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের মুখপানে দু-মিনিট তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঠাকুরের প্রতি আমাদের সেই ভালবাসাটা কই? আর যতটুকু আছে সে-টুকু উপদেশ দেওয়ার জন্য তো সাধু-মহাত্মারাই আছেন। ঠাকুরের যেটা শেষ কথা, সেখান থেকে লোকেরা উপদেশ দিতে শুরু করবেন। ঠাকুরের শেষ কথা হল প্রেম।

প্রেম মানে, যেখানে মানুষ নিজের শরীরের কথা ভুলে যায়, নিজের মন ভুলে যায়, নিজের অহঙ্কার ভুলে যায়, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে শুধু তুমি তুমি তুমি করে। কালীকৃষ্ণকে ঠাকুর বলছেন, তুমি যে মদের নেশা করছ, মদে ডুবে থাকছ, এটা কিছুই না; এর থেকে ভাল কিছুর নেশা করো। যে তাড়ি খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছে, সে যদি একবার বিলিতি খায় তখন বলে, আর বাহ্, এ কি জিনিস মাইরি! বিষয়ানন্দে যে ডুবে আছে, সে যদি একবার ভজনানন্দের আনন্দ পায়, তখন বিষয়ের আনন্দকে ভুলে যায়; নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, আমার আর এগুলো লাগবে না। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আস্বাদ যে একবার পেয়েছে, ফিল্মি গান, চটুল গান, রক মিউজিক কানে ভেসে এলে কানে আঙুল দেবে।

সেখান থেকে ঠাকুর শেষ কথা বলছেন, "**ঈশ্বরকে ভালবাসা – এইটি জীবনের উদ্দেশ্য;** মুখের ভালবাসা না, প্রেম, কেমন প্রেম, বলছেন, **যেমন বৃন্দাবনে গোপ-গোপীরা, রাখালরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসত। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, রাখালেরা তাঁর বিরহে কেঁদে কেঁদে বেড়াত**'।

সমস্যা হল, কথামৃতে এই ধরণের কথা পড়ে লোকেরা মনে করে, ঠাকুরের জন্য যদি কাঁদতে না পারি, তাহলে কিছুই হল না। এরপর ভক্তরা ঢং ঢাং করতে শুরু করে দেয়। একটু আগে রাখালের কথা হল, হরিনাম-সংকীর্তন হচ্ছে, রাখালের ভাব হয়ে গেছে। অল্প বয়সে স্কুলে পড়ার সময় দেখতাম, ঠাকুরের আরতির হচ্ছে, আর হস্টেলের কিছু ছাত্রের ঢং করে ভাব হয়ে যাচ্ছে। তাদের কয়েকজন চ্যাং দোলা করে ডিসপেন্সারিতে নিয়ে গেল। ডিসপেন্সারির কম্পাউণ্ডর যারা ছিল, ওরাও ওস্তাদ, একটা পিন ফুটিয়ে দিত, ওতেই চেঁচামেচি শুরু করে দিত আর সব ভাব উধাও হয়ে যেত।

ভক্তরা প্রায়ই এসে বলতে শুরু করেন, 'মহারাজ, ঠাকুরের নামে তো চোখে জল আসে না'। কোথা থেকে জল আসবে? ঠাকুরের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন না। বেদান্তে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়। ঠাকুরের ভাবে আপনি এখনও ডুবতে শিখলেন না, যখন ডুববেন, ঠাকুরের ভাব যখন আপনার মধ্যে টগবগ করবে, তখন দেখুন ঠাকুরের জন্য চোখে জল আসে কিনা। ঠাকুর গোপ-গোপীদের কথা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ কত বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, চব্বিশ ঘন্টা কৃষ্ণের সাথে ঘুরঘুর করছেন। ঠাকুর আপনার সাথে ঘুরঘুর করছেন না, আপনি ঠাকুরের সঙ্গ করছেন না, তাই ওই ভাবকে আনার জন্য এখন আপনাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আপনার সংস্কার যদি সেই রকম উচ্চমানের থাকত, আপনার কর্ম যদি সেই রকম থাকত, তাহলে ঠাকুরের সময়ই আপনার জন্ম হত।

যেহেতু ঠাকুরের সময় জন্ম হয়নি, এবার তাই আপনাকে পুরোপুরি অন্য রকম চলতে হবে। এখন আপনাকে বিশ্বাস, ভক্তি নিয়েই চলতে হবে। বিশ্বাস ভক্তি বাড়াবার জন্য দরকার সাধুসঙ্গ। পরে ঠাকুর বলবেন, কিভাবে সাধুসঙ্গে লেগে থাকতে হয়, ওর মধ্যে থাকতে থাকতে তারপর অঙ্কুরোদ্‌গমন হয়। ঠাকুরের জন্য চোখের জল আসা অত সহজ না।

ঠাকুর তারপর গান করছেন, ‘দেখে এলাম এক নবীন রাখাল’। সেই একই ভাবের গান। মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন – “**ঠাকুরের প্রেমমাখা গান শুনিয়া মাস্টারের চক্ষুতে জল আসিয়াছে**”। ঠাকুরের গান, তার উপর কৃষ্ণ-গোপীদের নিয়ে এমন মধুর নাম করছেন, এই জিনিসগুলো মাস্টারমশাইয়ের কাছে একেবারে নূতন, উনি এগুলো জানেনও না, এই প্রথম এই জিনিসগুলির প্রতি তাঁর exposure, তাঁর চোখে জল আসছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে – প্রাণকৃষ্ণের বাটীতে

ঠাকুর শ্যামপুকুরে প্রাণকৃষ্ণের বাড়িতে এসেছেন। প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন। কলকাতার লোকেরা সব সময় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসতে পারতেন না, সেইজন্য অনেক সময় ঠাকুর নিজেই কলকাতায় গৃহী ভক্তদের বাড়িতে চলে যেতেন। একজন ভক্তের বাড়িতে গেলে সেখানে কলকাতার অন্যান্য ভক্তরা ঠাকুরের কাছে আসতে পারতেন। তাঁদের সাথে ঠাকুর কথাবার্তা করতেন, আর ঠাকুরের কথাবার্তা একটা সীমারেখার নীচে কখনই আসত না। যেখানেই ঠাকুর যেতেন সেখানে বেশীর ভাগ সময় গান, কীর্তন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হত।

এখান থেকে মাস্টারমশাই তারিখ দিতে শুরু করছেন। “**আজ ২রা এপ্রিল, রবিবার, ১৮৮২ খ্রীঃ, ২১শে চৈত্র, ১২৮৮, শুক্লা চতুর্দশী; এখন বেলা ১/২টা হইবে**”। মাস্টারমশাই লিখছেন, ঠাকুরের ইচ্ছে যে, বিশ্রামের পর প্রাণকৃষ্ণের বাড়ি থেকে কাপ্তেন, যাঁর নাম বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ওনার বাড়ি যাবেন, কাপ্তেন ওই পাড়াতেই থাকেন। সেখান থেকে ‘কমলকুটির’ যেখানে শ্রীযুক্ত কেশব সেন আছেন, তাঁকে দর্শন করতে যাবেন। কলকাতায় এলে ঠাকুর অনেকের সঙ্গেই দেখা করে নিতেন। শ্যামপুকুর এবং তার আশেপাশের এলাকা, এটাই তখন কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ছিল, বর্তমান কালে উত্তর কলকাতা বলা হয়। প্রাণকৃষ্ণের বাড়িতে অনেকেই এসেছেন, মাস্টারমশাই অনেকগুলো নাম বলছেন, রাম, মনোমোহন, কেদার, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, রাখাল, বলরাম আর মাস্টার।

“**পাড়ার বাবুরা ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও আছেন, ঠাকুর কি বলেন – শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া আছেন**”।

১৮৮২ খ্রীঃ কেশব সেন পত্র-পত্রিকায় ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লেখালেখি করেছেন, তাতে ঠাকুরের কথা কিছু কিছু লোক জানতে পারেন। আর এমনিও তখনকার দিনের লোকেদের সময় বেশী ছিল, পাড়াতে কারুর বাড়িতে কোন বিশেষ লোক এলে পাড়ার লোকেদের নিমন্ত্রণ করা হলে অনেকেই আসতেন। এখন হয়ত সম্ভব হবে না, কিন্তু আগেকার দিনে এগুলো ছিল। আমেরিকাতেও স্বামীজী কারুর বাড়িতে যদি যেতেন, বাড়ির লোকেরা অন্যান্য অনেককে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন।

এখানে বলছেন, ঠাকুর ‘বলিতেছেন’, এতে বোঝা যাচ্ছে না যে এতক্ষণ ঠাকুর কিছু বলছিলেন কিনা। মাস্টারমশাই তখনও পরিষ্কার ভাবে ডাইরি রাখছেন না বা হতে পারে যে মাস্টারমশাই একটু দেরীতে ঢুকেছেন। কারণ প্রথম কথা যেটা লিখছেন, ঠাকুর ‘বলিতেছেন’, তার মানে ঠাকুর ইতিমধ্যে কিছুক্ষণ কথা বলে নিয়েছেন, যে সময় মাস্টার ঢুকলেন সেই সময় থেকে মাস্টার ঠাকুরের কথা শুনছেন। কি বলছেন ঠাকুর?

"ঈশ্বর ও তাঁহার ঐশ্বর্য। এই জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য"।

এই কথা কথামৃতের খুব পরিচিত কথা। কথায় কথায় ঠাকুর বলবেন, ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য। ঈশ্বর শব্দ এসেছে ঐশ্বর্য থেকে, ঈশ্বর আর ঐশ্বর্য একই। 'ঈশ্' থেকে ঈশ্বর শব্দ আসে, যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, যিনি রাজা। ঈশোপনিষদে যখন *ঈশাবাস্যমিদং সর্বং* বলছেন, সেখানেও তখন 'ঈশ্' মানে হয় যিনি নিয়ন্তা। ঐশ্বর্য মানে হয়, সেই নিয়ন্তার ক্ষমতাগুলি। বর্তমান কালে আমরা যখন ঐশ্বর্য শব্দের ব্যবহার করি, তখন অর্থগুলো অন্য রকম হয়ে যায়। ঐশ্বর্য বলতে আমরা এখন বুঝি, টাকা-পয়সা, সোনা, বাড়ি, গাড়ি; আর যার এগুলো আছে তাকে আমরা ঐশ্বর্যবান বলছি। কথামৃতেও ঠাকুর অনেক ক্ষেত্রে ওই অর্থে ঐশ্বর্য শব্দ ব্যবহার করছেন। কিন্তু যখন ঈশ্বরের ব্যাপার আসে, তখন ঈশ্বরীয় গুণগুলো, যে গুণের দ্বারা তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এই গুণগুলিই তাঁর ঐশ্বর্য।

এরপরে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎকার আসবে, সেখানে ঠাকুর শক্তি ও শক্তির প্রকাশের কথা বলবেন। শক্তির প্রকাশ আর ঐশ্বর্য প্রায় কাছাকাছি। শক্তির প্রকাশ কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বা কোন বস্তুর মাধ্যমে আসে। আর ঈশ্বরের যে সমষ্টি শক্তি, সেটাকে আমরা ঐশ্বর্য রূপে আলোচনা করি। ঈশ্বরের বর্ণনা করার সময় তাঁর ঐশ্বর্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়। অনেক ভাবে ঈশ্বরের বর্ণনা করা হয়, তার মধ্যে ঐশ্বর্যের বর্ণনাটাও একটা বিধির পর্যায়ে পড়ে। ঈশ্বরের রূপের বর্ণনা হয়, তাঁর গুণের বর্ণনা হয়, তাঁর নামের বর্ণনা হয়, তার সাথে ঐশ্বর্যের বর্ণনাও হয়।

ঠাকুর বলছেন্ **"কিন্তু ঐশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর ঐশ্বর্য তাঁকে খোঁজে না"**। ঠাকুরের এই কথার মধ্যে মনে হয় যেন তন্ত্র মত বা শক্তি মতের আভাস রয়েছে। শক্তি মতের সাধকরা প্রচুর ঐশ্বর্যের কথা বলেন। তবে এটা যে পুরোপুরি শক্তি মত থেকে এসেছে তা না, বেদের পুরুষসূক্তমেই আমরা পাই, পুরুষের বর্ণনা করে বলা হচ্ছে *এতাবানস্য মহিমা*, এই সৃষ্টি তাঁর মহিমা, তাঁর ঐশ্বর্য। তিনি তাঁর ঐশ্বর্যের থেকে বড়। সাধারণ মানুষের যদি দুটো টাকা হয়, সে সবাইকে দুটো টাকা দেখিয়ে নিজেকে বড় মনে করে, আমিও ধনী। যাদের কিছু টাকা এসে যায়, হয়ত একটা বড় বাড়ি বানাবে, কি একটা গাড়ি কিনবে, লোকেদের দেখানোর একটা ভাব থাকে, আমার এগুলো হয়েছে। কিন্তু যারা সত্যিকারের বড়লোক তারা এভাবে দেখাতে যাবে না।

তাঁর যে ঐশ্বর্য, তাঁর যে মহিমা, তার থেকে তিনি অনেক বড়। সাধারণ মানুষ ওখানেই শেষ হয়ে যায়, অতটুকুই তার আছে, তার বেশী নেই। তবে মানুষের ভিতর চৈতন্যশক্তি থাকার জন্য আমরা কখনই বলতে পারি না যে, ওখানেই তার ইতি হয়ে যায়। মানুষের স্বভাব, সে যখন গভীরে যেতে চায় তখনও সে কখন আসল জিনিসটাকে নিতে চায় না, সাধারণ মানুষ তো কোন মতেই নিতে চাইবে না। সাধারণ মানুষ সব কিছুতে সব সময় ঐশ্বর্য খোঁজে। যখন কাউকে আমরা কোন ভাবে সাহায্য করতে যাই, বা কারুর সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে যাওয়া হয়, সব সময় আমাদের মাথায় থাকে, এতে আমার কি লাভ হবে। মেলামেশা যখন হয়, যখন উপহার দেওয়া নেওয়া হয়, তখন এটাই দেখা হয়। বৈজ্ঞানিকরা যখন বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, কোন গবেষণা করতে যান, যারা তাঁদের স্পনসর করতে এগিয়ে আসে, তখন তারা এটাই হিসাব করে, এতে আমার কি লাভ হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক পরে, আমেরিকার এক নামকরা রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের ডিরেক্টর সরকারের কাছে টাকা চাইতে গেছেন, বিরটা অঙ্কের গ্রান্ট দরকার। সরকারি অফিসার ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস করছেন, এটা আমাদের যুদ্ধে কিভাবে সাহায্য করবে। বিশেষ করে আইনস্টাইনের থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি, সেখান থেকে এ্যটম বোমা, এরপর থেকে লোকেরা সব সময় হিসাব করতে থাকে, এতে আমাদের কি সুবিধা হবে। ডিরেক্টর খুব বিচক্ষণ লোক, একজন বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি বললেন, আমি

জানি না যুদ্ধে কোন সাহায্য করবে কিনা, তবে এটা জানি, আমরা হলাম সেই জিনিস, যেটার জন্য একটা দেশ যুদ্ধ করে।

সব বাবা-মায়েরা যেমন নিজের সন্তানকে বলে, বাবা আমার যা কিছু আছে, সব তোমার। এই যে আমি চাকরি করতে গিয়ে এত পরিশ্রম করছি, তোমার মা এই যে রাতের পর রাত তোমার জন্য জেগে থাকে, সব তোমার জন্য। মা-বাবা রূপে মা-বাবার যে অস্তিত্ব, এটা সন্তানের জন্য। একটা দেশ যখন যুদ্ধে নামে, তখন দেশের যৌবন শক্তি হলে বেস্ট। যে কোন সমাজে যুবকরাই হল বেস্ট। তারা মৃত্যুর জন্য বর্ডারে চলে যায়, বৃদ্ধরা পিছন থেকে উৎসাহ দিতে থাকে, দেশের জন্য তুমি প্রাণ দাও, কারণ নিজের মরার দম নেই কিনা। বয়স হলেই মানুষ ভীতু হয়ে যায় আর নিজের শরীরের প্রতি আসক্তিটা বেড়ে যায়। কম বয়সে শরীরের প্রতি আসক্তিটা কম থাকে। সেইজন্য যাঁরা সন্ন্যাসী হন, তাঁরা কম বয়সেই ঘরবাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী হন। এই যে যারা যুদ্ধ করতে চলে যাচ্ছে, এরা কি কোন পলিটিশিয়ানের খামখেয়ালীর জন্য যাচ্ছে, না কি কারুর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ চরিতার্থ করার জন্য? না, দেশের এমন কিছু আছে, যেটাকে রক্ষা করার জন্য তারা যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে।

বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য হল টেকনলজি। বিজ্ঞান আর কজন বোঝে, সবাই বোঝে টেকনলজি, তারা বোঝে ইলেক্ট্রিসিটি। কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটির কটা সিদ্ধান্ত তারা জানে, বাচ্চা বয়সে ফিজিক্সের কিছু পড়েছে, অতটুকুই সে জানে। ইলেক্ট্রিসিটির বিজ্ঞানকে কজনই বা বোঝেন বা জানেন। লোকেরা বোঝে ইলেক্ট্রিসিটির টেকনলজিকে, লাইট আছে, পাখা আছে, হীটার আছে, ফ্রীজ আছে। এগুলো হল ইলেক্ট্রিসিটির ঐশ্বর্য। ইলেক্ট্রিসিটি নিজে একটা বিদ্যা। ইলেক্ট্রিসিটির বিদ্যা আছে বলেই টেকনলজি রূপে তার ঐশ্বর্য বেরিয়েছে। ঠিক তেমনি বিজ্ঞান একটা বিদ্যা, এই বিদ্যা আছে বলেই বিজ্ঞানের যে ঐশ্বর্য টেকনলজি, সেটা আমাদের সামনে আসছে। সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক মুষ্টিমাত্র কয়েকজন হন। তাঁরাও বিজ্ঞানকেই চান। তাঁরা বলেন, আমি বিজ্ঞানের লোক, টেকনলজির দিকে আমার কোন আগ্রহ নেই।

আমরা হলাম সাধারণ মানুষ, নিজের অস্তিত্বের বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারি না, কল্পনা করতে পারি না; আমরা বুঝি বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য, যেটা বিজ্ঞানের টেকনলজি। ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য হল এই সংসার। এই সংসারের যা কিছু ভাল, সংসারে যেখানে যেখানে ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়, যে জিনিসগুলোর জন্য একজন মানুষকে সবাই মানে গণে; এই সব কিছু তাঁর ঐশ্বর্যেরই প্রকাশ। যেমন বিজ্ঞান থেকে তার টেকনলজি অনেক নিকৃষ্ট, অথচ টেকনলজিকেই সবাই খোঁজে, টেকনলজির পিছনে সবাই দৌড়ায়, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ঈশ্বর থেকে অনেক নিকৃষ্ট, ঈশ্বরই হলেন আসল। মানুষ যেমন বিজ্ঞানের দিকে না গিয়ে টেকনলজির দিকে যায়, কজন আর ফিজিক্স নিয়ে এমএসসি, পিএইচডি করতে যায়, সবাই এখন ইঞ্জিনিয়ারিং আর আইটি ইণ্ডাস্ট্রির দিকে যাচ্ছে, কারণ ওখানে পয়সা বেশী পাবে। সবারই এখন ভোগের দিকে দৃষ্টি। কোন রকমে যদি ডাক্তারিটা পাশ করে নিতে পারে, টাকা লুট করে বেড়াবার একটা রাস্তা খুলে গেল, সবাই যে এ-রকম তা নয়। কিন্তু এই ডাক্তারির পিছনে যে বিজ্ঞান আছে, খুব কম লোকই পড়ে। যারা পড়ছে, তারাই আসলে ওই বিজ্ঞানটাকে ধরে রেখেছে। ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের পিছনে খুব কম মানুষ যান।

যারা পিওর সাইন্সের লোক, পিওর লিটারেচারের লোক, তাঁরা খুঁজে বেড়ান, একজন যদি ভাল পাত্র পেতাম, ভাগ্যক্রমে যদি কাউকে পেয়ে যান, তাঁকে তাঁরা বলেন, বাপু তুমি এই বিজ্ঞানের যে শুদ্ধরূপ সেটার দিকে চলে এসো। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ অল্প একটু কোন রকমে ধরে নিয়ে, সেটাকে ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত করে, ওই ঐশ্বর্য নিয়েই জীবন চালাবে। বিজ্ঞানে, ডাক্তারিতে, সঙ্গীত জগতে, শিক্ষকতায় এই জিনিস সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। ঠাকুর এটাই এখানে বলছেন, ঐশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়। ঐশ্বর্য দেখলে বোঝা যায়, যাঁর এই ঐশ্বর্য তিনি তাহলে কেমন হবেন। গীতাতেও অর্জুন প্রশ্ন করছেন, স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবহার কেমন, কথাবার্তা কেমন, হাঁটাচলা কেমন। এটা ঠিক ঐশ্বর্য না, কিন্তু প্রায়

ওটাই, বহিঃপ্রকাশ দেখে আমি তার ভিতরটা বুঝতে চাইছি। এখানেও ঠিক তাই, কিন্তু ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ দেখে ঈশ্বর কেমন, এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা কারুর নেই।

ঠাকুর বলছেন, **“কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু দুঃখ, অশান্তিই বেশি”**।

কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য। সবার কাছে একটাই সত্য আছে – আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। বেদান্তীরা বলবেন, আমি সেই আত্মা। আমরা এখানে বেদান্তের আলোচনা করছি না, আমরা ঠাকুরের ভক্ত, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আমার একটাই চাই, আমার যিনি ইষ্ট, তাঁকে পেয়েই আমার শান্তি। এটা ঠিক যে জীবনে আমরা খুব কম সত্যিকারের কাউকে ভালবেসে থাকি, সেইজন্য এই জিনিসগুলো বোঝাও আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কাউকে ভালবাসি কি না ভালবাসি, ভালবাসা বুঝি কি না বুঝি এগুলো হয়ত নাও জানতে পারি, কিন্তু ভালবাসার এই অভিজ্ঞতা মোটামুটি সবারই আছে যে – ছোট্ট একটা শিশু, দু-আড়াই বছরের, মায়ের কাছ থেকে ওকে যদি সরিয়ে আনা হয় বা মা যদি কিছুক্ষণের জন্য আড়ালে চলে যায়, তখন সেই শিশু কি রকম কান্নাকাটি করতে শুরু করে দেয়। শিশু মাকে ছাড়া থাকতে পারে না, কারণ সেই হল তার পরম আশ্রয়।

আমরা মানি আর নাই মানি, ঈশ্বরই হলেন সবার পরম আশ্রয়, সেখানেই আমাদের সত্যিকারের শান্তি, সেখানেই আমাদের পরম সুখ, আর সেখানেই আমাদের শক্তি। যার কাছে থাকলে আমি শান্তি অনুভব করি, যার কাছে থাকলে নিরাপদ মনে করি, যার কাছে থাকলে আমার মধ্যে একটা শক্তি জাগরণের বোধ হয়, বুঝতে হবে, আমার জন্য ঈশ্বরের প্রকাশ সেখানেই। উচ্চমানের সন্ন্যাসী বা উচ্চমানের মহারাজ যাঁরা আছেন, দূর দূর থেকে মানুষ আসে তাঁকে দর্শন করতে। তাঁদের সামনে কিছুক্ষণ বসলে মন শান্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশে নামকরা যত মন্দির আছে, কত দূর দূর থেকে ভক্তরা দর্শন করতে যাচ্ছে। বিগ্রহের একবার দর্শন করে নিল, তাতেই মন অনেক শান্ত হয়ে গেল। এ-সব জায়গায় যেন শক্তির প্রকাশ বেশী।

উদ্দেশ্য হল যেখানে যে অবস্থাতে গিয়ে পরম শান্তি সেখানে গিয়ে অবস্থান করা। মার কোল যেমন শিশুর ঠিক ঠিক স্থান। মাঝে মাঝে কোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে খেলাধূলো করছে, আবার মায়ের কোলে আশ্রয় নিতে চলে যায়। একবার আমি দেখেছিলাম, তিন-সাড়ে তিন বছরের একটি বাচ্চা বন্ধুদের সাথে খেলে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে বাচ্চাটি দৌড়ে আমাদের কাছে চলে এলো, যেখানে ওর মা বসেছিল। দৌড়ে এসে দেখে নিল মা আছে কিনা, মাকে একটা ছোট্ট করে চুমু দিয়ে আবার বন্ধুদের সাথে খেলতে চলে গেল। বন্ধুদেরও সে ভালবাসে, কিন্তু মা তার প্রাণ, মাঝে মাঝে এসে ভেরিফাই করে নিচ্ছে।

উদ্দেশ্য হল, সেই শান্তির সাথে জুড়ে থাকা বা সেই পরম শান্তির অবস্থায় সর্বদা অবস্থিত থাকা। এই জগৎ থেকে হয় পুরোপুরি বেরিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের ভাবে অবস্থিত থাকা বা জগৎ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে না পারা যায়, তাহলে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য ঈশ্বরের ভাবে নিজেকে জুড়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে ঈশ্বরের কাছে যদি না যায়, কি করে সে শান্তি পেতে পারে! বিষয়ীরা যাই বলুক, ইন্টেলেকচুয়ালরা, লিবারালরা যাই বুঝিয়ে দিক, এদের চিন্তা-ভাবনা আজকের কিছু না, এই চিন্তা-ভাবনা চিরদিনই ভারতে ছিল, যুক্তি দিয়ে এরা যা কিছুই দেখিয়ে দিক, এটা সত্য যে আমাদের স্থূল শরীর থেকে আমাদের মন অনেক সূক্ষ্ম। মন থেকে আমাদের বুদ্ধি অনেক বেশী সূক্ষ্ম। বুদ্ধি থেকে আমাদের যে ভাব, ইমোশানস্ অনেক বেশী সূক্ষ্ম। এই ইমোশানের মধ্যে সংসারকে নিয়ে ইমোশানস আছে, ঠিক তেমনি আমাদের যে আমিত্ব, যার দাম সবার উপরে, এর উপরে কিছু নেই; কঠোপনিষদে সেইজন্য বলছেন, *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*, এটা হল শেষ অবস্থা, যেখানে মানুষ মূক হয়ে যায়, স্থির হয়ে যায়।

ঠাকুর যে কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছেন, এটাকে আমরা কোথাও বুঝতে ভুল করি। কারণ ঠাকুর যখন ব্যাখ্যা করছেন, ব্যাখ্যাটা ওই ভাবে করছেন, যেন এটা খুব নিন্দার বিষয়। পরের লাইনেই তিনি বলবেন, 'বিশালাক্ষীর দ'। এই পৃথিবীতে যে জন্ম নিয়েছে, এই সংসারে যে রয়েছে, কিছু তো তার দুর্বলতা আছে; দুর্বলতা আছে বলেই তাকে সংসারের মাঝখানে এসে জন্ম নিতে হয়েছে। আমি যদি পূর্ণ হতাম, তাহলে তো আমার জন্মই হত না। জন্ম নিয়েছি মানেই কোথাও আমার একটা অপূর্ণতা আছে, কোথাও দুর্বলতা আছে। আর আমি যদি বিরাট উচ্চমাপের কোন যোগী হতাম, তাহলে তো জন্ম নিয়ে জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি শঙ্করাচার্যের মত বেরিয়ে যেতাম, তা না হলে হিমালয়ের কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে ধ্যানে ডুবে থাকতাম। কিন্তু অনেক বেশী দুর্বলতা থাকার জন্য জগতের মাঝখানে আমাকে ঘুরঘুর করতে হচ্ছে। কিছু অপূর্ণ কামনা-বাসনা রয়েছে বলেই জগতে ঘুরঘুর করতে হচ্ছে, খুব সহজ যুক্তি।

অবিদ্যা, কাম, কর্ম, এই তিনটে শব্দ দিয়ে পুরো সংসার। অজ্ঞান – তার মানে আমি ভুলে গেছি আমি কে; আমি যে ঈশ্বরের সন্তান আমি মনে করতে পারছি না। যে কোন কারণেই হোক, মায়া হোক, বা কোন দোষ-ত্রুটির জন্য, আমি নিজেকে ভুলে গেছি। ফলে আমি নিজেকে অপূর্ণ বোধ করছি। অপূর্ণতার বোধ এলে তখন মনে হয় যে, এইটা যদি আমি পেয়ে যাই, এই কামনাটা যদি আমার পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলেই আমি পূর্ণ হয়ে যাব। কামনা পূর্ণ করা মানেই আমাকে কাজ করতে হবে। কাজ যত আমি করব তত আমার অবিদ্যা বাড়বে। অবিদ্যা যত বাড়বে তত কামনা বাড়বে, যত কামনা বাড়বে কাজ তত বাড়বে। যত কাজ করব তত অবিদ্যা বাড়বে। অবিদ্যা-কাম-কর্ম এটা একটা vicious cycle। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সমগ্র সৃষ্টি এই তিনটের মধ্যে ঘুরঘুর করে যাচ্ছে।

উপনিষদে 'কাম' জিনিসটাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে বলছেন – পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা – সন্তান লাভের ইচ্ছা, বিত্ত অর্থাৎ টাকা-পয়সা পাওয়ার ইচ্ছা আর মৃত্যুর পর স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির ইচ্ছা, এষণা মানে ইচ্ছা। আমাদের ঋষিরা দুই ধরণের ছিলেন। একদল ছিলেন যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাঁদের কাছে ঈশ্বর জ্ঞানই সব কিছু। আরেক দল ছিলেন, যাঁরা বলতেন স্বর্গপ্রাপ্তি জীবনের উদ্দেশ্য। তার মানে প্রথম উদ্দেশ্য স্বর্গপ্রাপ্তি, স্বর্গপ্রাপ্তিতে সন্তান পিতৃকর্মাদির দ্বারা বিরাট সাহায্য করে, আর যজ্ঞাদি করার জন্য অর্থের প্রয়োজন – এই তিনটেকে বলছেন পুত্রৈষণা মানে পুত্রের ইচ্ছা, লোকৈষণা মানে স্বর্গাদি লোকের ইচ্ছা এবং বিত্তৈষণা বিত্ত অর্থাৎ টাকা-পয়সা অর্জন করার ইচ্ছা। এটাকেই আমাদের জাগতিক অর্থে নামিয়ে আনলে দাঁড়িয়ে যাবে কামিনী-কাঞ্চন, আর নামযশে। সন্তানের ইচ্ছা ইদানিং লোকেদের কমে গেছে, সবাই এখন কামের পিছনে দৌড়াচ্ছে। কামের পিছনে যারা দৌড়াচ্ছে না, অবশ্যই তারা টাকা-পয়সার পিছনে ছুটছে। কারণ টাকা-পয়সা ছাড়া এখন কিছুই হয় না। এখন জল খেতে গেলেও টাকা দরকার, কোথাও বসতে গেলেও টাকা গুণতে হবে, হাঁটার জন্য টাকা লাগে। পার্কে হাঁটতে যাব সেখানে একটা দক্ষিণা দিতে হবে। আর শেষে আসে নাম-যশ। রাজ্য স্তরে, দেশের স্তরে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, সেগুলো পাওয়ার জন্য লোকেরা কত কত টাকা ডোনেট করে, দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। কেন টাকা খরচ করছে? যাতে নাম পায়। ঘুরে ফিরে এই তিনটে – কামিনী-কাঞ্চন-নামযশ।

এর আবার derivatives প্রচুর রয়েছে। সন্ন্যাস নেওয়ার সময় সন্ন্যাসীরা নিজেদের এষণাগুলি এক এক করে ত্যাগ করেন, তার মধ্যে আছে কেশৈষণা, লোমৈষণা। চুল-দাড়ি বড় হবে, দেখে লোকেরা প্রশংসা করবে, বাবাঃ বাবাজীর দাড়িটা কি সুন্দর; এই ইচ্ছাগুলিকেও বিসর্জন দিতে হয়। আমরা যে আধ্যাত্মিক আলোচনা করছি, এর আসল উদ্দেশ্য হল, যে দুর্বলতাগুলি আছে সেগুলো তাড়াতাড়ি মিটিয়ে মায়ের দিকে চোঁচাঁ দৌড় মারা। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন, যোগীরা যাঁরা ধর্ম পথে এগোনর চেষ্টা করছেন, এগোতে না পারলে তখন কি হয়? সবই তো নাশ হয়ে যায়, শরৎকালের ছিন্নভিন্ন মেঘের মত, যেটাকে আবার হাওয়াতে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। ভগবান বলছেন,

কক্ষণ নাশ হয় না – *ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি*। যাঁরা *কল্যাণকৃৎ*, যাঁরা এই রকম সাধনাদি করেন, তাঁদের সাধনা কখন নাশ হয় না।

ভগবান বলছেন, এনারা একটা সাধারণ বাড়িতে জন্ম নেন। কারণ বিরাট বড়লোকের বাড়িতে জন্ম নিয়ে সেখানে বাস করে ঈশ্বরে মন দেওয়া অসম্ভব, কারণ বড়লোকের বাড়ি মানেই ভোগের জায়গা। কদাচিৎ কখন কেউ যোগীর বাড়িতেও জন্ম নেন, সেখানে *লভতে পৌর্বদেহিকম্*। যোগীর বাড়িতে জন্ম নিয়ে থাকতে থাকতে কোন এমন একটা যোগাযোগ হয়ে যায় যে, আগের জন্মে যে পথে ছিল, সেই পথের কর্ম তাঁকে ঠেলে তাঁর কাছে নিয়ে আসবে। ঠাকুর প্রায়ই কথামৃতে এই কথাটা বলছেন, যার শেষ জন্ম তাকে এখানে আসতেই হবে। ঠাকুর এই কথা তাঁর সময়ে বলেছিলেন। ইদানিং কালে আপনি যদি বেলুড় মঠে গিয়ে সন্ন্যাসীদের খোঁজ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা আপনি কি করে রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হয়ে এলেন? তখন দেখবেন সন্ন্যাসীরা কেউ আমেরিকা থেকে আসছেন, কেউ বা কোন সুদূর জাপান থেকে, কেউ ইংল্যাণ্ড থেকে আসছেন।

অনেক দিন আগে আমাদের একজন খুব নামকরা বিদেশী মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহারাজ আপনি কি করে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথা জানলেন? উনি ট্রেনে না কিসে কোথাও যাচ্ছিলেন, পুরো ঘটনাটা আমার এখন মনে নেই। রেলওয়ের প্ল্যাটফর্মের একটা বুকস্টল থেকে একটা বই কিনলেন, বইটা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশন থেকে ছাপা। বইতে লেখা ছিল, যদি আরও জানতে চান, তাহলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ঠাকুরের উপরেই কোন বই ছিল। বইটা পড়ে ওনার খুব ভাল লেগেছিল। তারপর তিনি ওই ঠিকানায় যোগাযোগ করলেন। যোগাযোগ হতেই তিনি দেখছেন, আরে এতো দেখছি আধ্যাত্মিক সাহিত্যের বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার। এরপর যাতায়াত হতে হতে শেষে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। বর্তমানে তাঁর আশি বছর বয়স।

এ-রকম আরেকজন মহারাজকে জানি, তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন, সেখানে মন নিয়ন্ত্রণের একটা বই দেখে পড়তে শুরু করলেন। ওনার সাত পুরুষ আগে পিছে কেউ ধর্মের ধারে কাছে ছিল না। বইটা পড়ে তাঁর খুব ভাল লেগেছে। যার বই ছিল সে বলল, এই ব্যাপারে তোমার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ বই আছে, সেটা পড়তে পার। খুঁজে খুঁজে উনি রাজযোগ বইটা বার করলেন। দেখছেন বইটা অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যস্ অদ্বৈত আশ্রমের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়ে গেল। বর্তমানে তিনি মঠের একজন নামকরা সন্ন্যাসী। কোথা থেকে কিভাবে যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে, ভাবতে গেলেই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

এখানে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ ভগবান গীতাতেই বলছেন *লভতে পৌর্বদেহিকম্*, আগের জন্মে যে সাধনা করা ছিল, এই জন্মে তার হয়ত কিছু মনে থাকবে না, কিন্তু এমন একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে যে, যারা দেখছে তারাও বুঝতে পারবে না, যার হচ্ছে সেও বুঝতে পারবে না। আমাদের পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী কোথায় কেরালার কোন অজ গ্রামের ছেলে ছিলেন। সেই ১৯০২ সালে তাঁর জন্ম। বন্ধুর বাড়িতে কথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ পড়লেন, তারপর লাইব্রেরী থেকে স্বামীজীর বই এনে পড়লেন, তারপর একটা ইতিহাস হয়ে গেল। ওই অল্প বয়সে, স্কুলের গণ্ডীও তখন পেরোননি, সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে এলেন।

গীতার ওই জায়গাতে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর ভাষ্য লিখছেন, যে দুর্বলতার জন্য বা যে বিষয় ভোগের জন্য তার জন্ম হয়েছে, আগে সেটাকে বার করে দেবে। সংসারে কোন ভোগের প্রতি কার কি দুর্বলতা আছে সেটা বলা খুব মুশকিল। সন্ন্যাস হওয়ার আগেও ওই দুর্বলতা আসতে পারে, সন্ন্যাস হওয়ার পরেও আসতে পারে। ওই ভোগটা যখন চুটিয়ে ভোগ হয়ে যাবে, তখন সে বলবে আমার আর এই ভোগ লাগবে না। মন ভরে গেল, ভগবন বুদ্ধের মত অন্তর্জগতের অভিযানে সব ছেড়ে বেরিয়ে

গেল। আবার হয়ত পতন হতে পারে, আবার জন্মাবে। কিন্তু আসল যে যাত্রা, সেটা কোন দিন তার থেমে যাবে না।

সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও সেই একই জিনিস। এখানে সংসারী আলাদা, সন্ন্যাসী আলাদা, সে-রকম কিছু না। সংসারী যাঁরা অল্প একটু হয়ত সাধন-ভজন করেছেন, কিন্তু মনের মধ্যে অনেক ভোগের ইচ্ছা থেকে গেছে, সেইজন্য ঘুরে আবার সংসারে জন্ম নিল। কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ ভোগ করে করে দেখল এতে কিছু নেই, তখন আবার আরেকটু এগোল। যে কোন কাজে প্রথমের দিকে খাটনিটা অনেক বেশী করতে হয়। ধীরে ধীরে খাটনিটা সহজ হতে শুরু হয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চন বা মেয়েদের জন্য কাম-কাঞ্চন এটা মুক্তিদায়ী শক্তি। শরীরে কোন ঘা হলে যেমন পুঁজ হয়, তখন ওই পুঁজটাকে যে করেই হোক বার করতে হয়। ঠিক তেমনি মানুষের মনে যখন চাঞ্চল্য তৈরী হয়, এই চাঞ্চল্যটাই বেশী হয়ে গেলে মানসিক পুঁজ জমে, সেটার জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে যেতে হয়।

ঠিক সেই রকম আধ্যাত্মিক পুঁজ হল কামিনী-কাঞ্চন। মানুষ যখন সংসারে ভোগ করতে নামে তখন ওই পুঁজটা বেরিয়ে যেতে থাকে। পুঁজ বেরিয়ে গেল, এবার যার জন্য তুমি এই সংসারে এসেছ, সেটাকে ধরো, ধরে এগিয়ে যাও। যদি মনে কর আমার জন্য সংসার ভোগটাই ভাল, তাহলে সেই সংসারেই পড়ে থাক, যাকে ঠাকুর বলছেন বিশালাক্ষীর দ। ওই দ-এর মধ্যে নৌকা যদি একবার পড়ে যায়, আর রক্ষা নেই। দহ হল, যেখানে নদীর জলের একটা প্রচণ্ড ঘুর্ণি তৈরী হয়। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, গঙ্গার উত্তর দিকে বিশালাক্ষী নামে একটা জায়গা আছে, ওখানে কোন কারণে গঙ্গায় একটা ঘুর্ণি তৈরী হয়েছিল। অনেকে আবার এর অন্য রকম ব্যাখ্যা দেন, মা বিশালাক্ষীর যেন জলের ঘুর্ণি।

অনেক আগে আমি একবার একজন পণ্ডিত মহারাজকে 'বিশালাক্ষীর দ' এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, গঙ্গার উত্তরে ব্যারাকপুরের দিকে গঙ্গার পারে একটা বিশালাক্ষীর মন্দির ছিল, সেই মন্দিরের কাছে গঙ্গায় একটা ঘুর্ণি ছিল, যেটাকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'দ', 'দ' মানে দহ। যার জন্য ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, নৌকা একবার দহে পড়লে আর রক্ষা নেই। বন্যার জল যখন গঙ্গায় আসে তখন এই ধরণের অনেক ঘুর্ণি বিভিন্ন জায়গায় তৈরী হয়। ঘুর্ণির মধ্যে একটা এমন শক্তি তৈরী হয় যে, যে কোন জিনিস যদি ওর মধ্যে পড়ে যায়, সোজা ভিতরে ঢুকে যাবে, আর ওটা দেখা যাবে না। আমরা অল্প বয়সে গঙ্গার পারে যেখানে ঘুর্ণি তৈরী হত, খেলা করার জন্য দূর থেকে কাঠের টুকরো, কাগজের ডেলা ওর মধ্যে ফেলে দিতাম। নদী নদীর মত এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক ওই জায়গাতে কোন গর্ত হয়ে যাওয়ার জন্য ওখানে একটা প্রচণ্ড ঘুর্ণি তৈরী হয়।

জীবন ধারা এগিয়ে চলে যাচ্ছে, আমরা সবাই মুক্তির দিকে, আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, মুক্তি সবারই হবে, আজ হোক, কাল হোক। কিন্তু মাঝখানে একটা ঘুর্ণি সৃষ্টি হল। দহটা হল, যে দুর্বলতাগুলোর জন্য এই মানব জন্ম নিতে হল, ওই দুর্বলতার জায়গাতে ফেলে আমাদের আচ্ছা করে ঘোরাবে। আগে গরমকালে রাস্তাঘাটে ঘুর্ণি ঝড় দেখা যেত, এখন বড় বড় বাড়ি হয়ে যাওয়াতে আগের মত ঘুর্ণি দেখা যায় না। গ্রাম দেশে এখনও প্রচুর ঘুর্ণি ঝড় দেখা যায়। ফাঁকা মাঠ, কিছু নেই, সব শান্ত, হঠাৎ মাঠে একটা জায়গায় কাঠকুটো কাগজ, শুকনো পাতা, ধুলো সব একসাথে হয়ে একটা জায়গায় প্রচণ্ড ঘুরতে শুরু করে, আর একটা স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে যেতে থাকে। জলে যে ঘুর্ণি হয়, সেখানেও ঠিক তাই হয়। যারা এই জিনিসগুলো জানে না, এই জিনিসগুলো বোঝে না, যাদের এখনও চেতনা জাগেনি, তাদের নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে না। যাদের চেতনা জেগেছে, তাদের বুঝতে হবে, আমার জন্ম হয়েছে আমার নিজের কিছু দুর্বলতার জন্য। আমার মন ভরে গেছে, আর আমি নূতন করে কোন কিছুতে জড়াবো না। এটা যদি না করা হয়, তাহলে একটার পর একটা লাগতেই থাকবে, আর এই বিশালাক্ষীর দ-এর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে।

এটাই ঠাকুর পরের বাক্যে অন্য ভাবে বলছেন, **“সেঁকুল কাঁটার মতো এক ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসা পোড়া হয়ে যায়”।** গোলকধান্দা এখনকার দিনের লুডোর মত একটা খেলা, ঘুটি একবার ওর মধ্যে ঢুকে গেলে ওখান থেকে আর বেরুনো যাবে না। “মানুষ যেন ঝলসা পোড়া হয়ে যায়” – এটা হল concluding remark।

এখানে সংসার বলতে ঘর-সংসার যেটা মনে করি, সেটা না, এর নাম সাংসারিকতা। সাংসারিকতা মানে, মানুষ যখন টাকা-পয়সা, ভোগ-বাসনা, নাম-যশ, এগুলোর পিছনে দৌড়ায়। সংসার মানে, যেখানে একজন বিয়ে করে আছে, সন্তান নিয়ে আছে, এই জিনিসটাকে নিয়ে কখন আলোচনা করা হয় না। একজন যিনি সংসার ত্যাগ করে ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁর মধ্যেও সাংসারিকতা থাকতে পারে। আবার যিনি সংসারে আছেন, তাঁর ভিতর সাংসারিকতা নাও থাকতে পারে। সংসার সংসার শব্দ যখনই আসে, এর অর্থ হয় সাংসারিকতা, অর্থাৎ ভোগ-বাসনার ইচ্ছা। মানুষ যখন এই ভোগ-বাসনার মধ্যে পড়ে যায়, তার মন পুরো টেনে নেয়, মনের মধ্যে যে একটা শান্ত ভাব থাকে, ওই ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাকে দেখে মনে হয় যেন ঝলসা পোড়া হয়ে গেছে।

যাঁরা ঠাকুরের কথা শুনতে এসেছেন, তাঁদের মনেও স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন হবে, এই যদি সংসারীদের হাল এখন তাহলে উপায় কি? আমরা কথামৃত পাঠ করছি, পাঠ করে আলোচনা করছি, মন দিয়ে যাঁরা শুনছেন, দেখবেন তাতেই আপনাদের মনের উপর একটা ছাপ পড়বে। আর সেখানে ভগবান নিজের মুখে এই কথাগুলো বলছেন। যিনি বলছেন, তিনি এই জিনিসগুলিকে পুরো জানেন, আর এগুলোকে পেরিয়ে এসেছেন। উদ্দেশ্য হল, নিজের যে স্বভাব, আমি যে ঈশ্বরের সন্তান, এই ভাবটাকে বুঝে নিয়ে ঈশ্বরের দিকে পুরোপুরি নিজেকে দৌড় করানো। যাঁরা এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরাই মহাপুরুষ। ছাড়া বলতে আমরা ঠিক ত্যাগের অর্থে বলছি না, কথাটা হল outgrowing, তার মানে, কামিনী-কাঞ্চন ভোগ হয়েছে ঠিক আছে, এটাও একটা সময় দরকার ছিল, এর অনুভব হয়ে গেছে, ভোগের শান্তি হয়ে গেছে, এবার ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন। আর ওই বিশালাক্ষী দ-এর মধ্যে পড়তে যাবেন না।

ঘোর সংসারী বলতে বোঝায়, যাদের ভিতরে ইচ্ছা, কামনা-বাসনা এত বেশী রয়েছে যে, যতটুকু ভোগ করে নিয়েছে এতটুকুতে তার ভোগের তৃপ্তি হবে না, তার আরও চাই। তখন সেঁকুল কাটার মত একটা ছাড়বে তো আরেকটা ফাঁসবে। আগেও ঠাকুর বলেছেন, পরেও বলবেন। আমরা তো ভোগ করি না, সংসারই আমাদেরকে নিয়ে ভোগ করে, Drug addictionএর মত। যারা ড্রাগ নেয়, তারা মনে করে আমি এখন তুঙ্গে আছি। কিন্তু পরে দেখা যায় যে ড্রাগ নিচ্ছিল তার কিছুই হল না, মাঝখান থেকে ড্রাগ ডিলার্সরা বড়লোক হয়ে গেল, আর যে ড্রাগ, সে তোমাকে শেষ করে দিল, তুমি কিছুই পেলে না।

মানুষ বিয়ে করে, কখন বাবা-মা ঠিক করে দেন, কখন নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করে। তারপর কত পয়সা খরচ করে, কত লোকজন সঙ্গে নিয়ে আনন্দোৎসব করতে করতে বিয়ে করতে যায়। দু-দিন যেতে না যেতে বুঝতে পারে এগুলোতে কিছুই নেই। সরকার এখন তার কর্মচারীদের প্রচুর টাকা দিচ্ছে, লাখ টাকা কোন ব্যাপারই না। হিসাব করে দেখুন, যারা লাখ টাকা কি পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে, তার মধ্যে কটা টাকা সে নিজের উপর খরচ করে। ঠাকুর পরে বলবেন, কৃপণের টাকা কিভাব নষ্ট হয়। একগাদা টাকা ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম আর ইনকাম ট্যাক্স দিতে বেরিয়ে যাবে, একগাদা টাকা স্ত্রীর শাড়ি গয়না কিনতে, মোটা টাকা ছেলেমেয়ের স্কুলের ফীস দিতে চলে যায়, আর বাকি ডাক্তারদের পিছনে, হাসপাতালে, মরে গেলেও যেখানে ভেন্টিলেশনে ঢুকিয়ে দিয়ে বিল বানিয়ে যাবে। এই যে এত বড় বড় ডিগ্রী, এত দৌড়াদৌড়ি, শেষে হিসাব করে দেখুন, কটা টাকা নিজের উপর

খরচ করলেন? মানুষ মনে করে, আমি এবার ভোগ করতে নামছি। পরে দেখা যায় কি ভোগ করে, এই পৃথিবীটাই তো পরজীবি, এ ওকে ভোগ করছে, সে তাকে ভোগ করছে, সবাই সবাইকে চুষে যাচ্ছে, যে যতটা পারে পরস্পর পরস্পরকে চুষে নিচ্ছে। জগৎ মানেই তাই, এক অপরকে চুষছে। কিন্তু মায়া এমন এক জিনিস, মোহ, আশা এমন জিনিস যে, আমরা ওর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না।

সেইজন একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন – **"এখন উপায় কি"**?

"শ্রীরামকৃষ্ণ – উপায় : সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা"।

যখনই ঠাকুরকে ভক্তদের সাথে, সাধারণ লোকেদের সাথে কথা বলতে দেখা যেত, তখনই ঠাকুর এই দুটি কথা ছাড়া আর কিছু বলতেন না। অনেক সময় কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য কিছু হয়ত বলতেন; কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, এই প্রসঙ্গ যখন আসে, ঠাকুর সব সময় এই দুটো জিনিসকে নিয়ে বলতেন – সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা। একটা ক্লাশ ফোরের ছেলেকে আপনি যদি বুঝিয়ে বলেন, এখন যেটা পড়ছ এটা কিছুই না, এরপর স্কুল ফাইনাল আছে, উচ্চ মাধ্যমিক আছে, বিএ আছে, এমএ আছে। এই কথা শোনার পর ক্লাশ ফোরের ছেলেটি হতাশ হয়ে যাবে – সারাটা জীবন ধরে শুধু পড়াশোনাই করে যেতে হবে? ইদানিং কত রকম ডিগ্রী, লোকেরাও ডিগ্রী করেই যাচ্ছে। কি করবেন ডিগ্রী নিয়ে? যদি কেউ বলে, আমি এই বিষয়টাকে জানার জন্য পড়ছি, সেটা না হয় ঠিক আছে, কিন্তু এই ধরণের লোক আর কজন আছে! এই কারণে দুম্ করে কোন কথা বলে হতাশার ভাব জাগিয়ে দিতে নেই। যারা পারবে না, তাদেরকে বলে কোন লাভ নেই। ঠাকুর সেইজন্য যতটুকু সে পারবে সেইটুকু বলছেন – সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা। এর বেশী তারা পারবে না।

এরপর ঠাকুর বলছেন, **"বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না, সর্বদাই দরকার; রোগ লেগেই আছে"**।

রামকৃষ্ণ মিশনে আমার সন্ন্যাস জীবন প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল, মিশন স্কুলের ছাত্র হিসাবে ধরলে আরও দশ বছর, তার মানে পঞ্চাশ বছর আমি সাধুসঙ্গ করছি। ছাত্রাবস্থায় সচেতন ভাবে সাধুসঙ্গ হয়নি, কিন্তু টুকটাক সাধুসঙ্গ তো হতই। একটা জিনিস বুঝলাম, নিজের মনের মত যে কয়েকজন সাধুর সঙ্গ পাওয়া গেছে, তাঁদের পায়ে গিয়ে পড়ে থাকতে হয়। কিন্তু আমাদের মন এমনই যে, আগে আমরা বিচার করি, ইনি ভাল সাধু, না মন্দ সাধু। তার চেয়েও বাজে, এনার কিছু ক্ষমতা আছে কিনা। ক্ষমতা মানে, ইনি কোন বড় পোস্ট হোল্ড করছেন কিনা, মাঝে সাজে টুকটাক সুবিধা পাওয়া যেতে পারে কিনা। ভক্তরা দেখেন, এনার সঙ্গ করলে গেস্ট হাউসে ঘর পাওয়া যাবে কিনা, ছেলেকে ভর্তি করা যাবে কিনা, সেবাপ্রতিষ্ঠানে একটা বেড পাওয়া যাবে কিনা। এখানে যে উপায় নিয়ে প্রশ্ন, সেই উপায় তো অন্য জিনিস। একজন সন্ন্যাসী, তিনি যেমন সন্ন্যাসীই হন, একজন গৃহস্থ থেকে তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সংসারকে ত্যাগ করে দিয়েছেন, সংসার ত্যাগ করে দেওয়া সেতো সাংঘাতিক ব্যাপার। এরপর যা গোলমাল থাকুক ওর কোন দাম নেই, একটা ফুঁ দেবে সব উড়ে বেরিয়ে যাবে। একটা কাঙালী ভিখারী নিজের ভিক্ষাপাত্রটাও ছাড়তে পারে না। আগেকার দিনে ভিখারীরা সাধুর ভেক ধরে মেলাটেলাতে ভিক্ষা চাইত। ভিক্ষার পর সাধুর বেশ খুলে আবার সেই সংসারে নেমে যাচ্ছে, সাধুর বেশ ধরে থাকতে পারবে না, সম্ভবই না। সব কিছুকে ছেড়ে একটা জিনিসকে নিয়ে পড়ে থাকা অত সহজ জিনিস না। যে কোন সাধুর কাছে গিয়ে যদি কেউ পড়ে থাকে, দিনের পর দিন পড়ে থাকছে, তারপর ধীরে ধীরে তার উত্থান হতে শুরু হয়ে যাবে, হতে বাধ্য।

ঠাকুর বলছেন, সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না। আমাদের এখানে অনেককে বলতে দেখি, ওমুক সাধু এমন কিছু না। আরে না ভাই না, কেউ একজন সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, সংসারে এ-জিনিস কল্পনাই করা যায় না। 'সর্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার; রোগ লেগেই আছে' – এটাই সব

থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই যে রোগ লেগেই আছে বলছেন, যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁদেরও এই সমস্যা আছে। বলা হয় গুরুর পায়ে পড়ে থাকো। আগেকার দিনে এই রকম মঠ মিশন ছিল না। সেইজন্য তখন গুরুর পায়ে পড়ে থাকার কথা বলা হত, গুরুভাইদের সঙ্গে থাকতে বলা হত। যাঁরা মনের স্তরে খুব উপরে চলে গেছেন, তাঁরাও জানেন যে তাঁদেরও সঙ্গ দরকার। মনের অবস্থায় যাঁরা যত উপরে উঠে গেছেন, তাঁদের অবস্থা তত খারাপ হয়। কারণ এরপরে সংসারী লোকেদের থেকে তাঁর ব্যবধান এত বেশী বেড়ে যায় যে, উনি লোকেদের সাথে কথাই বলতে পারবেন না, বিষয়ী লোকেদের সাথে তো কোন মতেই না। সেইজন্য হয় তাঁকে নিজের ভিতরেই চুপচাপ থাকতে হবে, চুপচাপ থেকে যেখানে তিনি আসলে ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের পরম সঙ্গ করে যান। কিন্তু যাঁরা এখনও সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গ করতে পারছেন না, তাঁকে সাধুসঙ্গ করতেই হবে – কারণ রোগ লেগেই আছে। আপনি যত শাস্ত্র পড়ুন, যত লেকচার শুনুন, যত জপধ্যান করুন, জানবেন রোগ লেগেই আছে। রোগ লেগেই আছে – আধ্যাত্মিক জীবনে এটা শেষ সত্য। সাধুসঙ্গ সদা সর্বদা যদি না হয়, তাহলে তাঁদের কথা মনে করা, তাঁদের আলাপ আলোচনাগুলোকে চিন্তন করা খুব দরকার।

বলছেন, “**আবার বৈদ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়। তবে কোন্‌টি কফের নাড়ী, কোন্‌টি পিত্তের নারী বোঝা যায়**”।

এক সময় আমি উত্তরকাশীতে ছিলাম। সেই সময় সেখানে একজন বয়স্ক ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন, তিনি নাড়ীতে হাত দিয়ে বলে দিতে পারতেন কি গোলমাল হয়েছে। আমাদের কুঠিয়াতে কিছু আখ হয়েছিল, একদিন বিকেলবেলা আখ কেটে আখ চিবিয়ে খেয়েছি। তারপর বিকালে হাঁটতে বেরিয়ে দোকানে এক কাপ চা খেয়েছি। তার কিছু দিন আগে খুব সর্দি-কাশিতে ভুগেছিলাম। আমি সেই ব্রহ্মচারীর কাছে গেছি। উনি আমার নাড়ী ধরেই বলছেন, ‘ও মহারাজ আপনি কি করে এসেছেন? আপনার নাড়ী যে ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে’। আমি বললাম, ‘সে-রকম কিছু তো খাইনি, উত্তরকাশীর যা সাধারণ খাবার তাই খেয়েছি’। ‘না না, কিছু একটা হয়েছে, ঘোড়ার মত নাড়ী দৌড়াচ্ছে, মাঝখানে কিছু দিন শান্ত ছিল’। আমার কিছুতেই মনে পড়ছিল না। বললাম, ‘এই এখন এক কাপ চা খেয়ে এসেছি’। তখন মনে পড়ল চা খেতে আসার কিছু আগে আখ খেয়েছিলাম। ‘তারপর অনেকটা হেঁটে আসলাম, সেইজন্য হতে পারে’। ‘আপনি কি সর্বনাশ করেছেন, ফল খেয়ে চা খেয়েছেন, আখ তো ফলই। এত কষ্টে আপনাকে সারালাম, নাহলে আবার আপনার সর্দি লাগবে’। তখন আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁকে বললাম, ‘আমাকে নাড়ী দেখাটা একটু শিখিয়ে দিন’। উনি তখন কথামৃত থেকে ঠাকুরের ঠিক এই কথাটা আমাকে বললেন, ‘বৈদ্যের সঙ্গ করতে হয়, তবে জানা যায় কোনটা পিত্তের নাড়ী, কোনটা কফের নাড়ী’। সাধুসঙ্গে কোনটা পিত্তের নাড়ী, কোনটা কফের নাড়ী, এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভক্ত প্রশ্ন করলেন –

“**ভক্ত – সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়**”?

শরীরে কোন রোগ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, রোগের বাড়াবাড়ি হলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ঠাকুর যে বলছেন, রোগ লেগেই আছে, ঠাকুর ভবরোগের কথাই বলতে চাইছেন, শরীরের ব্যাধির কথা বলছেন না। পরে আমরা দেখব, ঠাকুর এক জায়গায় বলবেন, হাসপাতালে নাম লেখালে রোগের কসুর না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া পাওয়া যাবে না। ভবরোগ যার মধ্যে লেগে আছে, তিনি পুরোপুরি সারিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাকে ছাড়বেন না।

ঠাকুর রোগ সারাবার জন্য বলছেন, সাধুসঙ্গ দরকার, সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না, সব সময় দরকার। সাধুসঙ্গের কথা একমাত্র ঠাকুরই বলছেন না, যেখানেই ভক্তিশাস্ত্র আসে সেখানেই সাধুসঙ্গের কথা বলা হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে গুরুসঙ্গ, কারণ বেদান্তে সাধু ওই ভাবে নেওয়া হয় না, বেদান্তে গুরু সব সময় দরকার। ভক্তিশাস্ত্রে গুরুর ব্যাপারটা সাধুর উপর নিয়ে আসেন। এর অনেকগুলো কারণ আছে,

সাধু মানে তিনি ত্যাগ বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, বা ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে চলছেন। তার সাথে বোঝা যায় এনার ঈশ্বরে মন আছে। হয়ত তিনি সংসারও করছেন, তাঁর মধ্যে সাংসারিকতাও কিছু আছে, কিন্তু তিনি ত্যাগ বৈরাগ্যের ওই আস্বাদটা পেয়ে গেছেন। সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়, এর উত্তরে ঠাকুর বলছেন –

"শ্রীরামকৃষ্ণ – ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না"।

ঠাকুর সাধুসঙ্গে তিনটে লাভের কথা বলছেন। একটু পরে চতুর্থ আরেকটা বলবেন। প্রথম লাভ – ঈশ্বরে অনুরাগ হয়, দ্বিতীয় লাভ – ঈশ্বরে ভালবাসা হয় আর তৃতীয় লাভ বলছেন, ব্যাকুলতা হয়। আর চতুর্থ একটু পরে বলবেন, সেটা হল, সদসৎ বিচার; সৎ কি অর্থাৎ কোনটা ঠিক এবং অসৎ, ভুল কি; এই বিচারটা আসে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞের আলোচনা করছেন, সেখানে মানুষের বিনাশ কিভাবে হয় সেটাকেও বলছেন – *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধহভিজায়তে*, ইত্যাদি। মানুষ যখন কাম-বাসনার যে কোন বিষয়কে নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে ওই বিষয়ের প্রতি তার একটা আসক্তি তৈরী হয়। আর সেই বস্তুকে না পেলে মনে একটা ক্ষোভ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেখান থেকে পর পর কিভাবে তাকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায় বর্ণনা করছেন। কিন্তু এর প্রথমটারই গুরুত্ব বেশি। একটা জিনিসকে চিন্তা করতে করতে সেই জিনিসের প্রতি অনুরাগ জন্মায়, এই অনুরাগ বা আসক্তিটাই মানুষকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। এটাকে বলে vicious cycle।

ঠিক তেমনি এর উল্টোটা হল virtuous cycle, virtuous cycleও শুরু হয় ঠিক একই processএ। যেমন এখানে বলছেন, *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ*, একটা জিনিস বা বস্তুকে নিয়ে চিন্তা করছেন, এবার মনে মনে যদি ঈশ্বর চিন্তন হয়, তাহলে এবার virtuous cycle শুরু হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে তাকে টেনে উপরের দিকে নিয়ে চলে যাবে। এর শুরুটা কোথা থেকে হয়? সাধুসঙ্গ থেকে। সাধুসঙ্গ করছে, সাধুর মুখে দুটো ঈশ্বরীয় কথা শুনল, শুনে ভাল লাগল। তারপর সেখান থেকে ঈশ্বরের প্রতি একটা ভালবাসা জন্মায়।

যখন বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, সেখানেও একটা জিনিসের প্রতি তার exposure হয়েছে। গীতায় exposure জিনিসটা বলছেন না, গীতা ধরেই নিয়েছেন যে, সংসারে আমাদের অনেক কিছুর exposure হয়। সেইজন্য চেষ্টা করা হয় বাচ্চারা যেন অনেক কিছু জানতে না পারে, কারণ exposure হলে তবেই ওটার ব্যাপারে curiosity আসবে। একটা কিছুর বাসনা তখনই হবে, যখন ওই জিনিসটাকে সে জানে। আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার কি ইন্দ্রপদ চাই? সঙ্গে সঙ্গে বলব, না না আমার ইন্দ্রপদ লাগবে না, আমার ঠাকুরকে লাগবে। আপনি কি স্বর্গে যেতে চান? না না আমার স্বর্গফর্গ লাগবে না, আমি ঠাকুরকে চাই। একটা ভাল বাড়ি চাই? হ্যাঁ হ্যাঁ পেলে খুবই ভাল হয়। কারণ আপনার দৌড় ভাল বাড়ি পর্যন্ত আছে, তার বাইরে নেই। আমরা ভাল পোশাক, ভাল খাওয়া, ভাল বাড়ি, একটা ভাল গাড়ি, এই জিনিসগুলিকেই জানি, বুঝি, আমাদের দৌড়টাও তাই এই পর্যন্ত।

যে জিনিসের ব্যাপারে আমাদের কোন আইডিয়াই নেই, আমরা কত অনায়াসে বলে দিতে পারি, না না, আমার ওটা লাগবে না। এই জিনিসটা আমি চাই, এটা বলার জন্য আগে ওই জিনিসটাকে জানতে হয়। বর্তমান কালে টিভি, ইন্টারনেট এসে যাওয়ার জন্য, মানুষ যে জিনিসগুলো জানত না, সেই জিনিসগুলি এখন জানছে, আর তার ফলশ্রুতিতে সেই জিনিসের প্রতি তার আসক্তি তৈরী হয়ে যাচ্ছে, আর এর কারণে অনেক রকম সমস্যাও তৈরী হয়েছে।

ঈশ্বর কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এটাও তাই। এটাকে আগে জানতে হয়, এটার exposure পেতে হয়, যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ আসবে না। ওটার

exposure হলেই যে অনুরাগ আসবে তা না। আমাদের মন এমন, সিনেমা, টিভি সিরিয়ালে সাধুদের এমন ভাবে দেখানো হয় যে, বাইরে সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখলেই বলবে, ব্যাটা একটা দু-নম্বরী, এক নম্বরের ফ্রড। প্রথমেই বলে দেবে, এ নির্ঘাৎ একটা ফ্রড, তা নাহলে বলবে, পেটের দায়ে এই পথে এসেছে। সমাজে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে এত নেতিবাচক ধারণা ছড়িয়ে আছে যে, চিন্তাই করা যায় না। সমাজে একটা ভাল হলে, চারটে মন্দ হবে, এটাই নিয়ম। আর আপনি যত যাই করে নিন, যদি আপনাকে ঈশ্বরের দিকে এগোতে হয়, আপনি যদি চান ঈশ্বরের প্রতি একটু যেন অনুরাগ জন্মায়, তাহলে আপনাকে এমন লোকের কাছেই যেতে হবে, যিনি ঈশ্বরকে ভালবেসেছেন। চারজন সাধারণ সাধুর সঙ্গ করলেও দেখবেন ধীরে ধীরে আপনি নিজেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবেন। ঈশ্বরের প্রতি যতক্ষণ অনুরাগ না হয়, ঈশ্বরীয় কথার প্রতি যদি অনুরাগ না জন্মায়, ততক্ষণ কিছু হবে না।

ঈশ্বরের দিকে চলার পথে অনুরাগ হল প্রথম পদক্ষেপ। আগেকার দিনে বিয়ের সময় মেয়েরা তাদের হবু স্বামীর সম্বন্ধে কিছু জানতই না। কিন্তু বিয়ের পর একসাথে থাকতে থাকতে দুজন দুজনের প্রতি একটা আসক্তি তৈরী হয়, একটা বণ্ডিং হয়। দুজনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়ে গেল, তখন দেখা যাবে, সবাই তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করছে, অথচ বিয়ের আগে কেউ কাউকে জানতই না। অনুরাগ একটা চারা গাছের মত, যেমন আপনি সার দেবেন, জল দেবেন, তেমন তেমন চারা গাছটা ধীরে ধীরে বড় হবে, পরে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে। আর যদি মনের করেন এটা আপনা থেকেই হবে, তাহলে সেই রকমই হবে। যে কোন রিলেশানে, তা বন্ধুত্ব হোক, ভাই-বোনের সম্পর্ক হোক, ভাই-ভাইএর সম্পর্ক হোক, মা ও ছেলের সম্পর্ক হোক, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক হোক, একটা কোম্পানিতে আপনি যেখানে চাকরি করছেন, সব জায়গায় সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য খাটতে হয়। প্রত্যেকটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধুত্ব, ভাই-বোন, যে কোন রিলেশানে খাটতে হয়। যে কোন রিলেশানে if you take it granted, রিলেশান আপনার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে।

রিলেশানে মানুষ খাটছে, তাহলে তার প্রথমটা হল অনুরাগ। এরপরে অনুরাগকে নিয়ে খাটছেন, খাটতে খাটতে এরপর ভালবাসা আসবে। ভালবাসা হল মানে, এবার বণ্ডিংটা হয়ে গেছে। কোন ভাবে এক অপরের কাছে চলে এসেছে, সেটা দিয়ে কোন বণ্ডিং হয় না। আমরা যেমন ট্রেনে বাসে যাই, যাতায়াতে কত লোকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে, কিন্তু সবার সাথে তো বণ্ডিং হয় না। যখন আপনার মনে হল, আপনার মনের মত। এরপর আপনি খাটতে শুরু করলেন, এখান থেকে ভালবাসা জন্মায়। ভালবাসা জন্মে গেল মানে, কেল্লা ফতে হয়ে গেছে, আর বেশী বাকি নেই। কারণ তারপরের ধাপই হল ব্যাকুলতা।

ঠাকুর নরেনকে এতো ভালবাসছেন, নরেনকে বলছেন নরঋষি; বলছেন, সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে তিনি নরেনকে নিয়ে এসেছেন, কত কি নরেনকে নিয়ে বলছেন। পরে কাশীপুরে বলছেন, নরেন শিক্ষে দেবে। আমরা সবাই দেখছি ঠাকুরের সাথে নরেনের কি রিলেশান। কিন্তু দেখুন, প্রথমের দিকে কত খাটছেন, দুজনের মধ্যে যে রিলেশান তৈরী হচ্ছে তার জন্য ঠাকুর কত খাটছেন, নরেনও কত খাটছেন। আর দুজন দুজনের জন্য আটুপাটু করছেন, ঠাকুর নরেনকে ছেড়ে থাকতে পারছেন না, নরেন ঠাকুরকে ছেড়ে থাকতে পারছেন না। রিলেশানশিপে যদি আপনি ক্যাজুয়াল হয়েছেন, রিলেশানের নটে গাছটিও মুড়িয়ে যাবে।

ঈশ্বরের ব্যাপারেও ঠিক তাই। বেলুড় মঠে দীক্ষা নিয়েছেন। মাঝসাজে বিশেষ দিনে একশ আটবার জপ করে নিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার যে বণ্ড, সেটাও একটা রিলেশানশিপ, খাটতে হয়। আপনি বলবেন যে, তিনি ডাকছেন না তাই মঠে যাচ্ছি না, তিনি আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন না, তাই জপধ্যান করছি না। তাঁর ভারি বয়ে গেছে আপনাকে দিয়ে করাতে, মাঝখান থেকে আপনি ডুববেন। গরজটা আপনার, দরকার আপনার। ভগবান বলছেন, *সমঃ সর্বভূতেষু*, সবারই প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি।

তাঁর ভারি বয়ে গেছে আপনাকে মঠে নিয়ে আসার। আপনার লাগবে কিনা বলুন? বড় বড় সুপার মার্কেট আছে, সেখানে আপনি এলেন কি এলেন না, তাতে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু আপনি যত বার সেখানে মার্কেটিং করতে যাবেন, আপনার কেনাকাটার উপর স্কোরিং হবে, আপনাকে সার্টিফিকেট দেবে, ইনি আমাদের ভ্যালুউড কাস্টমার। আপনার জন্য এই এই জিনিসে এত এত পারসেন্ট ছাড় দেওয়া হবে।

ভালবাসার পর এই যে ব্যাকুলতা আসছে, তখন বুঝতে পারা যায় যে, এর উপর প্রচুর খেটেছেন। আধ্যাত্মিক উত্থান প্রকৃত অর্থে শুরু তখনই হয়, যখন ব্যাকুলতা আসে। ঠাকুর যে বার বার সতীর উপমা দিচ্ছেন, মায়ের উপমা দিচ্ছেন, এটা বোঝানর জন্য যে, সংসারে যারা আছে, তারা এই জিনিসগুলিকে বোঝে, তাই বেছে বেছে সেই সেই উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন। সন্তানের কিছু হয়ে গেলে মায়ের মন ছটফট করে, ঈশ্বরের জন্য যেন সেইভাবে ছটফট করে। যখন একজন কাউকে ভালবাসছে, কোন কিছু চাইছে, তখন সেটার জন্য পাগলের মত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই রকম যখন ঈশ্বরের জন্য মন ছটফট করে, তবেই সে এগোয়।

ঠাকুর বলছেন, ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। আধ্যাত্মিক যাত্রা, শুধু অনুরাগেও হয় না; ভালবাসা, এতেও হয় না; শুরু হয় ব্যাকুলতা দিয়ে। আমি আর পারছি না, আমি তোমাকে ছাড়া পাগল হয়ে যাব, যতক্ষণ না এই ভাব আসছে ততক্ষণ ব্যাকুলতা এসেছে বলা যাবে না। আপনি বলতে পারেন, কেন, আমারও তো মাঝসাজে বেলুড় মঠে না আসতে পারলে মনটা কেমন ছটফট করে। না এটাকে ব্যাকুলতা বলা যাবে না। ব্যাকুলতা হল, যখন প্রত্যেকটা মুহুর্ত মন ঈশ্বরকে নিয়ে ডুবে আছে। অনুরাগ হলে ধর্মভাব আসে, ভালবাসা এলে ধর্মভাব আসে। মন্দিরে গেলাম, দর্শন করলাম, পূজো দিলাম, এগুলো হচ্ছে ধর্মভাব। আধ্যাত্মিকতা হয় মানুষ যখন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, দুটো আলাদা জিনিস।

ধার্মিকতা সব সময় চলে ritual আর recital এর মধ্য দিয়ে। Ritual মানে আমাকে এই এই পূজা করতে হবে, আমাকে এত জপ করতে হবে, এতক্ষণ ধ্যান করতে হবে, এখানে-ওখানে গিয়ে পূজা করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে। আর recital হল কথামৃত পড়ব, ভাগবত পাঠ করব, গীতা পাঠ করব, চণ্ডী পাঠ করব। আর realization mode হল আধ্যাত্মিকতা, ব্যাকুলতা না হলে realization mode আসে না।

বলছেন, সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। একটু আগে যে বলা হল, relationshipএ খাটতে হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে relationship তৈরীর জন্য প্রচুর খাটতে হয়। যাকে আমি কোন দিন দেখিনি, যার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই, কোথা থেকে একটা মন্ত্র নিয়ে নিলাম, কটা বই পড়ে নিলাম, এই দিয়ে কি কখন বণ্ডিং হয়! কখন কি সম্ভব! বলছেন, শিবের মন্ত্র নিয়েছেন, শিবের কাহিনী জানা আছে, শিব মহাপুরাণ টিভি সিরিয়াল দেখা আছে। আপনি কোথায় নর্মদার তীরে, হরিদ্বারে শিবের মন্ত্র নিয়েছেন, টিভি সিরিয়াল দেখেছেন, আর ভাবছেন আপনার শিবের realization হয়ে যাবে? কিচ্ছু হবে না। আপনি তাঁকে কোন দিন দেখেননি, তিনি আপনাকে দেখা দেননি, তাঁর সাথে আপনার আলাপ আলোচনা হয়নি, তাঁর সাথে ঝগড়া-ঝাটি হয়নি, প্রেম-ভালবাসা হয়নি, কি করে আপনি তাঁকে ভালবাসতে পারবেন? কখনই সম্ভব না। সেইজন্য সাধুসঙ্গের দরকার। সাধু হলেন সেই মাধ্যম, যেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ সব চাইতে বেশী।

বাইবেলে যীশু খুব সুন্দর বলছেন, He who has seen the son, has seen the Father। সব সময় যে বাবাকেই দেখতে হবে, তা না, সন্তানকে দেখলেও হবে। সব সময় ঈশ্বরকে দেখার দরকার নেই। ঈশ্বরের যিনি সন্তান, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ সব থেকে বেশী, তিনি হলেন সাধু, তাঁর সঙ্গ করলেই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা এসে যাবে। যদি কেউ মনে করে, তিনি তো আমাকে

দেখা দেননি, আমি কি করে তাঁকে ভালবাসব? আমি তাঁকে কি করে জানব? এদের কোন দিন হবে না, এরা ওই রকমই বসে থাকবে। এভাবেই এদের কোটি কোটি জন্ম কেটে যাবে। শুরু যদি করতে হয়, এখনই এবং এখান থেকেই শুরু করতে হবে। সেইজন্য যেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ, সেখানে গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গ করতে হয়।

মহাভারতে নল-দময়ন্তির কাহিনী আছে। দেবতারা চাইছেন, নল আর দময়ন্তির বিবাহ হোক। নল ও দময়ন্তি দুজনেই দুটো আলাদা রাজ্যের বাসিন্দা। কয়েকটা রাজহংস দময়ন্তির কাছ থেকে ঘুরে এসে নলের কাছে দময়ন্তির রূপ ও গুণের বর্ণনা করতে শুরু করেছে। ওদের বর্ণনা শুনে নলের মনে একটা ভাব জেগে গেল। নল হাঁসগুলিকে ধরতে গেলেন, পারলেন না। সেখান থেকে হাঁসেরা দময়ন্তির কাছে গিয়ে নলের রূপ আর গুণের বর্ণনা করতে শুরু করল। এই ভাবে দুজন দুজনের ব্যাপারে জানার পর আরও কৌতুহল জন্মাল।

ঠাকুর বিভীষণের গল্প বলছেন। একজন মানুষ কিভাবে লঙ্কায় এসে পড়েছে। বিভীষণ মানুষ দেখে খুব খুশী, আহা রামচন্দ্রের দেশ থেকে এসেছে। এটাই ভালবাসা, রামচন্দ্রকে তো সশরীরে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু রামচন্দ্রের দেশ থেকে সে এসেছে। মানুষ রূপ কিনা। বিভীষণ তাকে বিরাট আদর-যত্ন করতে লাগলেন।

ঈশ্বরের সঙ্গ হয় না, তাই সাধুর সঙ্গ করেই ঈশ্বরের সঙ্গ করতে হয়। সাধুসঙ্গ করে যদি মনে হয় মন ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হয়, এখানে ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গই হচ্ছে। ওই সঙ্গ হতে হতে, ঠাকুর বলছেন, ধীরে ধীরে ভালবাসা জন্মায়, ঠাকুর বলছেন, সেখান থেকে প্রাণ ব্যাকুল হয়। ব্যাকুলতাতে ইমোশানালিজিমের কিছু নেই। কারণ এতে যা কিছু হয়, সেটা আপনার খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার, আপনার ব্যাকুলতাকে কেউ জানতেও পারবে না, কারুর জানার দরকারও নেই। ঠাকুর যে সাধনা করলেন, সেই সাধনাতে ঠাকুর নিজে থেকে একটা স্তরে চলে গেছেন, ওনাকে সেখানে কারুর সাহায্য নিতে হয়নি, আর তাঁর যা কিছু হয়েছে তাতে কোন কৃত্রিমতা কিছু নেই। কিন্তু পরে যাঁরা ঠাকুরের পরম্পরাতে আসছেন, তাঁদের ওই পরম্পরায় সাহায্য নিতে হচ্ছে। কারণ আমরা সাধারণ মানুষ।

ঠাকুর বলছেন, **“যেমন বাড়িতে কারুর অসুখ হলে সর্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারুর যদি কর্ম যায়, সে ব্যক্তি আফিসে আফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল হতে হয়, সেইরূপ। যদি কোন আফিসে বলে কর্ম খালি নেই, আবার তার পরদিন এসে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি কোন কর্ম খালি হয়েছে**”?

মানুষ যে জায়গাটাতে নিজের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে, অস্তিত্বের যেটা তার কেন্দ্র, অস্তিত্বের ওই কেন্দ্রে যদি কোন ঘা পড়ে, তখন সে পাগলের মত হতে শুরু করে। ওই মুহুর্তে সে প্রাণপন চেষ্টা করতে থাকে, কিভাবে অস্তিত্বের কেন্দ্রটাকে রক্ষা করা যায়। সেইজন্য দেখা যায়, যাকে আমি ভালবাসি, তার যদি শরীর খারাপ হয়, মরণাপন্ন যদি হয়ে যায়, তার জন্য আমরা দৌড়ে দৌড়ে সব রকম ব্যবস্থা নিতে থাকি, যাতে সে বেঁচে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারে। যাদের আমরা পছন্দ করি না, তার যদি একই রকম কিছু হয়, তখন মনে মনে বলি, আপদটা বিদেয় হলে বাঁচি। ঠিক তেমনি যার অর্থাভাব হয়ে যায়, সে কেমন চারিদিকে ছোটাছুটি করে কিভাবে দুটো টাকার ব্যবস্থা করা যায়। যার অস্তিত্বের কেন্দ্র ঈশ্বর হয়ে গেছেন, সেও তখন ওই রকম পাগলের মত ছটফট করতে শুরু করে, কিন্তু এটা কাউকে সে বুঝতে দেয় না। যেমন কারুর অর্থাভাব হয়ে গেলে সমাজে কাউকে জানতে দেয় না, আমার এখন অর্থাভাব চলছে। এটাকে ঠাকুর বলছেন ব্যাকুলতা।

সেখান থেকে ঠাকুর বলছেন, **“আর একটি উপায় আছে – ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি যে আপনার লোক, তাঁকে বলতে হয়, তুমি কেমন, দেখা দাও – দেখা দিতেই হবে – তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ কেন**”?

ব্যাকুলতার কথাই বলছেন, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। এখানে প্রসঙ্গ থেকে সরে কয়েকটা কথা বলা দরকার। প্রথমের দিকে ঠাকুর যে ব্যাকুলতার কথা বলছেন, ওই ব্যাকুলতাতে ঠাকুর পরা ভক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। পরা ভক্তি মানে খুব উচ্চমানের ভক্তি, যেখানে সাধুসঙ্গ করে করে মনটা একেবারে পাকা হয়ে গেছে, ওই পাকা মন এখন শুধু ঈশ্বরের কথা চিন্তন করে যাচ্ছে। সেখান থেকে ঠাকুর এবার অন্য দিকে চলে আসছেন – প্রথম প্যারাগ্রাফ আর দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে একটা বিরাট তফাৎ আছে।

প্রথম প্যারাগ্রাফ হল, যেখানে আপনি একটা অবলম্বন পেয়ে গেছেন – সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ করে করে আপনার মন এখন ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ হল – যেখানে সেই অবলম্বনটা নেই। একবার এক সুফি মহাত্মার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সাধাসিধে মানুষ, সুফিদের যেমন ঘর-সংসার থাকে, এনারও সবই আছে। একদিকে তাঁর অনেকগুলো গরু, মোষ আছে, অন্য দিকে মাজাহারও আছে, সেখানে গিয়ে তিনি আরতি করেন। কথা হতে হতে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ভক্তি কিসে হয়’? উনি বললেন, ‘জমিদারি যেভাবে অর্জন করতে হয়, ভক্তিও সে-ভাবে অর্জন করতে হয়’। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। আমি যতটুকু বুঝেছি, উনি সে-রকম পড়াশোনা করা লোক নন। আমাদের পরম্পরারও নন, একজন মুসলমান সুফি ফকির। ঘর সংসার আছে, ঘর-সংসার চালাবার জন্য গরু-মোষও আছে। আমি একজন অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। উনি সেই সময় মাজাহারে ধুপধুনো দেখাচ্ছিলেন। উনি ওই অবস্থায় এক কথায় আমাকে বলে দিলেন – জমিদারি যে ভাবে অর্জন করা হয়, ভক্তিও সে-ভাবে অর্জন করতে হয়। আমার কাছে যেটা আশ্চর্যের, তা হল, আমি ভক্তিলাভের এই রকম পরিভাষা কখন শুনিনি। যদিও পরে পরে বয়সের সাথে সাথে আমারও পরিপক্কতা বেড়েছে, তখন দেখছি কথামৃতে ঠাকুরও এই কথা বলছেন।

এখানে ঠাকুর এটাই বলছেন, জমিদারি অর্জন করার কথা বলছেন। এর জন্য ব্যাকুল হয়ে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। সুফির সাথে দেখা হওয়ার অনেক আগে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, তখন উনি মঠের সহাধ্যক্ষ ছিলেন। তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম, বয়স কম। একদিন কাঁকুড়গাছি মঠে হাঁটতে হাঁটতে মহারাজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথা হতে হতে ব্যাকুলতার কথা উঠল। আমি বললাম, ব্যাকুলতা কি করে হবে মহারাজ, ব্যাকুলতা তো হয় না। তিনি তখন খুব নামকরা একটা গল্প বললেন। এই ঘটনাটা আগে আগে কয়েকবার আমি অন্যান্য ক্লাশেও বলেছি।

এক জায়গায় বৈষ্ণবদের কীর্তন হচ্ছে, সবাই খুব নাচ-গান করছে। কীর্তনে যা হয়, কীর্তন করতে করতে ওদের চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। একজন ইয়ং ছেলে, ওর কোন ভাব-ভক্তি নেই, তার কিছুই ভাব হচ্ছে না, চোখ দিয়েও তার জল বেরোচ্ছে না। হঠাৎ তার খুব খারাপ লাগল, এখানে সবাই এত সুন্দর কীর্তন করছে, কৃষ্ণ নাম করতে করতে সবার চোখে জল আসছে, আমার কিছুই হচ্ছে না। সে তখন ওই বাড়ির রান্নাঘরে সরাসরি ঢুকে হাতে করে লঙ্কার গুড়ো নিয়ে নিজের চোখে ঘষে দিয়েছে। ‘পোড়া চোখ, তোর জল বেরোচ্ছে না! এই নে লঙ্কার গুড়ো, এবার চোখের জল বার কর’। স্বাভাবিক ভাবে এবার তার চোখ দিয়ে জল বেরোতে শুরু হয়েছে। ঘটনাটা শোনার পর মহারাজকে বললাম, ‘এটা আবার কি ধরণের ভক্তি, এখানে চোখের জলটা তো কৃত্রিম’। মহারাজ তখন খুব মিষ্টি করে আমাকে বললেন, ‘তুমি এভাবে কেন দেখছ, ওর ব্যাকুলতাটা দেখ। তার মনে আফশোষ হচ্ছে, আমি এমনই অভাগা যে, কৃষ্ণ নামে চোখ দিয়ে জল পর্যন্ত বেরোচ্ছে না! ঠিক আছে, আমিও দেখাচ্ছি, বলে লঙ্কা ঘষে দিল’। ঠাকুর এখানে ব্যাকুলতা বলতে এটাকেই বলতে চাইছেন। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা – তুমি কেমন দেখা দাও, দেখা দিতেই হবে। এখানে ভাবের আরোপ করা হচ্ছে।

এই জায়গাতে আমাদের মনে রাখতে হবে, আগে যে ব্যাকুলতার কথা বলা হল, ওটার সাথে এই ব্যাকুলতার বিরাট তফাৎ আছে। আগের ব্যাকুলতায় প্রথমে আসে অনুরাগ, অনুরাগ থেকে ভালবাসা, ভালবাসা থেকে ব্যাকুলতায় চলে গেল। এখানে প্রার্থনা করে, জোর খাটিয়ে সরাসরি ব্যাকুলতাতে চলে যাওয়া একটা আপ্রাণ চেষ্টা, দুটো আলাদা পথ। এই ব্যাকুলতাতে হল – আমার মধ্যে ভাব নেই, আমার ভিতরে ভক্তি নেই, আমার কিছু নেই। চণ্ডী পাঠ যাঁরা করেন, তাঁরা জানবেন চণ্ডী পাঠের শেষে চণ্ডী পাঠে যা যা অপরাধ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার একটা স্তব আছে। ওই ক্ষমা প্রার্থনার স্তোত্রে ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়ে বলা হচ্ছে – *ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো*, মা! আমি না জানি মন্ত্র, না জানি যন্ত্র, আমার স্তুতিজ্ঞানও নেই, আমি না জানি আবাহন, না জানি ধ্যান, মা! আমি জানি তুমি আছ, আর আমি আছি, আমি তোমার সন্তান। *কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি*, আমি কুপুত্র হতে পারি, মা কখন কুমাতা হয় না, তোমাকেই আমাকে দেখতে হবে। বলছেন, তুমি আমাকে সৃষ্টি করলে কেন? ঠাকুরও ঠিক একই ভাব নিয়ে আসছেন, আমাকে সৃষ্টি তুমি করেছ, আমার চাইই চাই। সমস্যা হল, আমরা যে এগুলো করি না তা না, পাঁচ বছরে, ছ-বছরে হয়ত একবার করলাম। এই জিনিসটাকে টেনে নিয়ে ঠাকুর আবার বলছেন –

"**শিখরা বলেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়'; আমি তাঁদের বলেছিলাম, দয়াময় কেন বলব**"?

ব্যারাকপুরে চানক বলে জায়গা ছিল, সেখানে ইংরেজ সিপাহীদের ব্যারাক ছিল। ১৮৫৭ সালে মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনা এখানেই ঘটে। ঠাকুর সেই সময় গভীর সাধনায় নিমগ্ন। চানকে শিখ রেজিমেন্টও ছিল। শিখরা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মাঝে মাঝে ঘুরতে আসত। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, ঠাকুরের কাছে তখন হৃদয়রাম ছিল। হয়ত হৃদয়রাম এসে ঠাকুরকে বলছে, মামা জানো চানকে এই রকম কিছু হয়েছে। ঠাকুর তখন নিজের মত 'মা' 'মা' বলে পঞ্চবটীতে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, কোথায় চানকে কি হয়েছে ঠাকুরের কি আর সেদিকে কোন হুঁশ আছে। যাই হোক, শিখরা বলছে, 'ঈশ্বর দয়াময়', এগুলো মুখের কথা।

ঠাকুর বলছেন, "**দয়াময় কেন বলব? তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তা যদি করেন সে কি আর আশ্চর্য! মা-বাপ ছেলেকে পালন করবে, সে আবার দয়া কি**"? এই জিনিস ভারতবর্ষে ছিল না, বিদেশে এগুলো হয়, অনেক সময় মা-বাবা সন্তানকে বলে, জান আমরা তোমার জন্য কত কি করেছি। কি আর করেছেন, জন্ম আপনি দিয়েছিন, সারা জীবনের মত দায়ীত্ব আপনার। যদি বলেন, আমি যা করার করে দিয়েছি, এবার তুমি ফ্রী। তা বললে হবে না।

"**সে তো করতেই হবে, তাই তাঁকে জোর করে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ। ছেলে যদি খাওয়া ত্যাগ করে, বাপ-মা তিন বৎসর আগেই হিস্যা ফেলে দেয়**"। হিন্দুদের যে উত্তরাধিকার আইন, তাতে বাবা-মার যে সম্পত্তি, তার উপর ছেলের অধিকার হয়। উত্তরাধিকার আইনগুলো স্থায়ী কিছু না, বিভিন্ন স্মৃতিকাররা বিভিন্ন সময় এক-একটা আইন করে গেছেন। যাজ্ঞবল্কের স্মৃতি খুব নামকরা স্মৃতিগ্রন্থ, মনুস্মৃতির পরেই তাঁর সম্মান।

যাজ্ঞবল্কের স্মৃতির নামকরা ভাষ্য মিতাক্ষরী, সেখান থেকে হিন্দুদের উত্তরাধিকার আইন তৈরী হয়েছে। ওতে ওদের অনেক নিয়ম-কানুন আছে। সেখানে বলা হয়, মা-বাবার সম্পত্তির উপর সন্তানের অধিকার, এই অধিকারকে খর্ব করা যায় না, করতে গেলে অনেক জটিলতা আছে। বাবা যদি চায় আমার ছেলেকে আমার সম্পত্তির অধিকার থেকে বার করে দেব, এটা অত সহজ না। বাবা যদি ছেলেকে বলে, আমি তোমাকে কোন হিস্যা দেব না, এটা করা যায় না। যেমনি ছেলে কিংবা মেয়ে আদালতে যাবে, বাবা যদি অন্য রকম উইল করে থাকে, সবটাই বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ওটা পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি (ancestral property), পৈতৃক সম্পত্তি (paternal property) না। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বাপ-ঠাকুর্দা থেকে চলে আসছে, ওই সম্পত্তির উপর সবার অধিকার থাকে।

সেইজন্য আমি প্রায়ই এই কথাটা বলি, বাপ-ঠাকুর্দার যে সম্পত্তি, সেখান থেকে কটা টাকা পাবে, তার জন্য লোকেরা কত মামলা মোকদ্দমা করে, কত লড়াই করে। আর দেখুন ঋষিরা এত খাটাখাটনি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত তপস্যা করে এই আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জন করে আমাদের জন্য রেখে গেলেন, সেটাকে একটু যে খেটেখুটে আমরা বুঝে নেব তারও আমাদের সময় নেই। ঠাকুর বলছেন, ছেলে হয়ত তিন বৎসর পরে তার সম্পত্তির হিসাব বুঝে নিত, কিন্তু তার আগেই বুঝে নেওয়ার জন্য খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মা-বাবাও অশান্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলে দেন, নে বাবা, এই তোর হিস্যা ফেলে দিলুম, তুই তোর হিস্যা নিয়ে নিজে শান্ত হ, আমাদেরও শান্তি দে। বিদেশেও এই ধরণের অনেক কিছু আছে। বাইবেলেই প্রডিগ্যাল সানের গল্প আছে। ছোট ছেলে বাবাকে বলছে, আমার হিস্যাটা আগেই দিয়ে দাও।

"আবার যখন ছেলে পয়সা চায়, আর পুনঃপুনঃ বলে, 'মা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে দুটি পয়সা দে', তখন মা ব্যাজার হয়ে তার ব্যাকুলতা দেখে পয়সা ফেলে দেয়"। ঠাকুরের এটা খুব পছন্দের উদাহরণ ছিল। এটাকে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বলছেন। এক জায়গায় বলবেন, 'না না তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি রাগ করবেন, তাও ছেলে ছাড়ছে না। তখন মা চাবি নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে আলমারি খুলে পয়সা বার করে মাটিতে ফেলে দেয়'। ছেলের ভারি বয়ে গেছে, পয়সা তুমি হাতে তুলে দিলে, না মাটিতে ফেলে দিলে, ওর পয়সা পাওয়া নিয়ে কাজ, পয়সাটা তুলে বেরিয়ে যাবে। বোঝানর জন্য ঠাকুর যে উপমাগুলো দিচ্ছেন, এই রকমই হয়; এর প্রসেসটা কি আমাদের ওর বিস্তারে যাওয়ার দরকার নেই।

বেদান্ত বলবে, প্রসেস এই; ভক্তিমার্গ বলবে প্রসেস এই; আমাদের কাছে সত্য এই। আপনি ত্যাগের জন্য যোগ্য কিনা কি করে জানবেন? আপনি ভক্তির যোগ্য কিনা কি করে বুঝবেন? আপনি জ্ঞানের যোগ্য কিনা কি করে জানবেন? ঈশ্বরের ভালবাসার যোগ্য কিনা কি করে বুজতে পারবেন? জানার কোন পথ নেই। যদি জানার কোন পথ নেই, তাই বলে যদি কোন সন্ন্যাসী মনে করেন তিনি ঈশ্বরের প্রিয় আর সংসারীদের প্রিয় নন, তা তো না। যেমন আমরা বলি, বড়লোক হলেই যে আপনি ভক্ত হবেন, এই প্রশ্ন তো উঠবে না। কিংবা আমরা বলি যে, শাস্ত্র পড়লেই যে ঈশ্বরকে জানা যাবে তা নয়। তার মানে ঈশ্বরকে পাওয়ার অধিকার কার আছে, জানার অধিকার কার আছে, আমরা জানি না। তাহলে ঠাকুর যে ভাবে মায়ের দর্শন পেয়েছেন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করেছেন, আমরা কেন পাবো না? যদি কেউ ঠিক ঠিক ভাবে আমাকে বলে দেন, আমি ঈশ্বরের দর্শন পাবো না, তখন নাহয় ওটা দেখা যাবে। সেটাও তো কেউ বলে দিচ্ছে না। কোন প্রসেসে হবে, সেটা আমরা কেউ জানি না। সেইজন্য ব্যাকুল হয়ে যদি চাওয়া হয়, আমার এটা চাইই চাই, তখন পাবে। এই জিনিসটাকে হাইলাইট করার জন্য ঠাকুর বলছেন, কেউ যদি ব্যাকুল হয়ে চায়, মা যেমন ছেলেকে দুটো পয়সা ফেলে দেয়, ঠাকুর তাকে দেখা দেবেন।

বেদান্ত এই জিনিসটাকে বলবে – ব্যাকুল হয়ে হয়ে তার মন এমন হয়ে গেছে যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গিয়ে তার আত্মজ্ঞান হয়ে গেল। আমরা ওই বিস্তারে যাচ্ছি না। ঠাকুর খুব সহজ করে বলে দিয়েছেন, আমরাও খুব সহজ করে ব্যাখা দিলাম। এটাকেই যদি আবার আপনি পাঁচ খানা counter explanation নিয়ে আসেন, ওগুলোর কোন দাম নেই। কারণ এই উপমাগুলি দেওয়া হয়েছে বোঝানর জন্য। শেষমেশ যা কিছু হয়, আপনার মনকে দিয়েই হয়। প্রথমের দিকে যেখানে আমরা এই আলোচনা শুরু করলাম, অনুরাগ, ভালবাসা আর ব্যাকুলতা; ব্যাকুলতা হলেই বোঝা যায় এবার তার ঈশ্বর দর্শন হতে আর বাকি নেই। এখানেও জিনিসটা তাই, কিন্তু প্রথমটাতে সাধুসঙ্গ করে করে তার ব্যাকুলতা এসেছে। কিন্তু কেউ হয়ত বই পড়ে বা কোথাও ঈশ্বরের ব্যাপারে শুনেছে, ওর হয়ত সেই রকম

সাধুসঙ্গ করার সুযোগ নেই, সরাসরি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমে ঠাকুর সাধুসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলেন, সাধুসঙ্গকে আবার নিয়ে আসছেন।

"সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ - নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎপথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতি পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙশ মারে"।

ঠাকুরের এই কথাকেই বেদান্তসারে বলা হয় নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক; আর সাংখ্য দর্শনে যেখানে তত্ত্ববিচার আসে সেখানে পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলছেন। সাংখ্য মতে – পুরুষ হলেন চৈতন্য আর প্রকৃতি মানে জড়। মন থেকে শুরু করে এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, বিশ্বমন থেকে শুরু করে, চেতনা থেকে শুরু করে যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই প্রকৃতির এলাকা, সব কিছু প্রকৃতির অন্তর্গত। এই দুই প্রকার বিচার হয় – প্রকৃতির এলাকার যা কিছু আছে, সব আমি ছেড়ে দিলাম; প্রকৃতির কোন কিছু আমার লাগবে না, আমার মনকে শুধু পুরুষেই নিবদ্ধ করব। দ্বিতীয় হল – বেদান্তীরা যখন নিত্য ও অনিত্যের বিচার করে, সেখানেও একই আইডিয়া, নেতি নেতি বিচার। নেতি নেতি বিচার মানে, আত্মা বাদে যা কিছু আছে সব ছেড়ে আত্মাতে মনকে স্থিত করা।

সাংখ্য দর্শন আর বেদান্ত দর্শনে যে ত্যাগ, তাতে ছোট্ট তফাৎ। সাংখ্য দর্শন বলছেন, প্রকৃতির এলাকার কোন কিছু আমার আর লাগবে না, বেদান্ত দর্শন বলছেন, আত্মা ছাড়া আমি আর কোন কিছুতে মন রাখব না। সাংখ্য মতে উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, আমি পুরুষ, যেটা চৈতন্য, ওটাকেই ধরে রাখব, প্রকৃতির কোন কিছু আমার লাগবে না। বেদান্ত ওই ত্যাগটাই একটু অন্য ভাবে করেন। বেদান্ত অনাত্মবস্তুকে আগেই ধরে রাখে, সাংখ্যবাদীরা বিচার করে বোঝার চেষ্টা করেন কোনটা প্রকৃতি, যেমনি বুঝে গেলেন এটা প্রকৃতির এলাকা, ওটাকে ছেড়ে বেরিয়ে এগিয়ে যান।

ভক্তিপথেও একই ভাব, তবে একটু অন্য ভাবে যান – আমি ঈশ্বর বৈ কিচ্ছু জানি না। ভক্তিপথে সাংখ্য মত ও বেদান্ত যেন একটু মিশে যায়। ভক্তিপথে ভক্ত আগে থেকেই ঈশ্বরকে বসিয়ে নেন, আর মনে করেন, আমাকে ওখানে পৌঁছাতে হবে। সেখানে পৌঁছানর জন্য যা কিছু ব্যবধান আছে, সেটাকে মুছে দিয়ে ঈশ্বরের দিকে দৌড় দেন। সৎ অসৎ বলতে এটাই, যেমনি ঈশ্বর ব্যতিরকে অন্য কোন কিছুর দিকে মন গেল, সঙ্গে সঙ্গে মনকে আটকে দিচ্ছেন।

ঈশ্বরের দিকে মন রাখাকে আমরা বলি পূণ্য আর ঈশ্বরের বাইরে মন যাওয়াটাকে আমরা বলছি পাপ। সাধারণ ভাবে পাপ বলতে আমরা মনে করি, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, এর সব কটার উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বর থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে দেওয়া। ঈশ্বর থেকে মন সরে আসা, তা যে ভাবেই সরুক, সবটাই পাপ। বিচার করে দেখলে, অপরের সেবা করা, এটাও পাপ; কারণ সেখানে ঈশ্বর বোধ নেই। সেইজন্য কথামৃতে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য দুটোকে ছেড়ে দেওয়ার কথা অনেকবার আসবে। আমরা যে অর্থে পাপ-পূণ্য মনে করি – পূণ্য মানে সত্যি কথা বলা, অপরের ভাল করা; কিন্তু যেখানে ধর্ম উচ্চ অবস্থায় চলে, সেখানে এগুলোও পাপ। যে কোন কর্মই পাপ, মনের যে কোন চিন্তাই পাপ; কারণ ঈশ্বর থেকে আমাকে আলাদা করে দিচ্ছে। ঈশ্বর চিন্তন বাদে, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মবোধ হওয়া বাদে সবটাই পাপ। প্রথম প্রথম এই কথাগুলো যাঁরা শুনবেন তাঁদের এগুলো বুঝতে কঠিন মনে হবে। কিন্তু পরে শুনতে শুনতে, চিন্তন করতে করতে সব কিছু পরিষ্কার হয়। আচার্য শঙ্করও গীতার ভাষ্যে বার বার এই কথা বলছেন, আত্মজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে যেটা ধর্ম, সেটাও পাপ।

সাধারণ ভাবে যখন প্রশ্ন করা হয়, পাপ কি? আমরা মনে করি এই জিনিসগুলো পাপ, এই জিনিসগুলো ভাল। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের পথে আছেন, তাঁদের জন্য ঈশ্বর বাদে সবটাই পাপ। সেমেটিক ধর্মে, খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুদাইজম্, এদের কাছে ঈশ্বর আদেশ করে দিয়েছেন, তুমি এটা করবে, এটা

করবে না। ঈশ্বর যেটা আদেশ করে দিয়েছেন, তার বাইরে যেটা করা হবে সেটাই পাপ। আদম আর ঈভকে ভগবান বলে দিলেন, ওই আপেল গাছের ফল খাবে না। তারা ভগবানের আদেশ অমান্য করল, তারা পাপ করেছে। সেই পাপের জন্য তাদের স্বর্গ থেকে বার করে দেওয়া হল।

যখন আমাদের অবস্থায় আসে, আমরা যে শাস্ত্রকে পালন করি, সেই শাস্ত্রে যেটাকে পাপ বলা হয়েছে, সেটাকে পাপ মনে করি। কিন্তু আমরা যদি ঠিক ঠিক ভাবে হিন্দু ধর্মের গভীরে যাই, আমরা দেখছি, এনার বলছেন, আসক্তিই পাপ। অনাসক্তি মানে ঈশ্বর, ঈশ্বর বাদে আমরা যা কিছু করছি, বিধবার চোখের জল মুছে দিচ্ছি, অনাথের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছি, এগুলোও পাপ। এই ধরণের কথা শুনলে আমাদের মনে আতঙ্ক লাগবে, কিন্তু এটাই বাস্তব। তাহলে স্বামীজী কেন বললেন সেবা করতে? কিন্তু স্বামীজী বার বার বলছেন, ঈশ্বর জ্ঞানে, শিব জ্ঞানে সেবা করতে। ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করলে তখন সেটা অন্য জিনিস হয়ে যায়। ঈশ্বর জ্ঞানে করা এসে যাওয়ার পর তখন সেবাটা আর সেবা থাকে না, ওটাই পূজা হয়ে যায়। আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, শাস্ত্রের আলোচনা চলছে; যদি আমরা মনে এটা ঈশ্বরীয় আলোচনা, ঠাকুরের কথা ঠাকুরকেই শোনান হচ্ছে, তখন এটা হয়ে গেল পূণ্য। কিন্তু আপনাকে আমি আমার লব্ধ বিদ্যা শোনাচ্ছি, তখন এটা হয়ে গেল পাপ।

কথামৃত পাঠ করাটা অপরা বিদ্যাতেই পড়ে। মুণ্ডকোপনিষদে যেখানে পরা বিদ্যা অপরা বিদ্যার কথা বলছেন, সেখানে বেদ অধ্যয়নকেও অপরা বিদ্যার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। আমি আপনাকে কথামৃত পড়ে শোনাচ্ছি, এই ভাব আসা মানেই এটাও পাপের মধ্যে পড়বে। আপনি হয়ত বলবেন, এটা তাও পাপের মধ্যে হলেও একটু তো পূণ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। না, আত্মার দৃষ্টি থেকে, ঈশ্বর বোধের দৃষ্টি থেকে যে কোন কাজ আপনি করছেন, ওটা পাপ। যেমনি কাজ ঈশ্বর বুদ্ধি দিয়ে করা হবে, তখন সবটাই পূণ্য। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত আছেন, পাপ; যেমনি ওটা ঈশ্বরকে অর্পণ করে দেওয়া হচ্ছে, ওটা আর পাপকর্ম থাকল না।

এরপর প্রতিবেশী বলছেন, **“মহাশয় পাপবুদ্ধি কেন হয়”**?

‘পাপ’ আর ‘বুদ্ধি’ এই দুটো শব্দে এর মধ্যে আছে। মানুষের মধ্যে পাপবুদ্ধি কেন আসে, এই প্রশ্ন করা হয়েছে। ঠাকুর পাপ জিনিসটা একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না, একবার খুব রেগে বলছেন, ‘যে শালা পাপ পাপ বলে সে শালাই পাপী’। পাপকে পরিভাষিত করার অনেকগুলো মাপকাঠি রয়েছে। আমরা কথায় কথায় বলি, ‘অপরকে কষ্ট দিচ্ছ তো, দেখবে তোমার পাপ হবে’। শাস্ত্রে আবার পাপের পরিভাষা বলছেন, বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন ভাবে পাপকে পরিভাষিত করা হয়। ইংরাজীর ‘sin’ আর ‘পাপ’ এমন ভাবে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে যে, আমাদের এখন পাপ কি, sin কি, আলাদা করে দেখাটা অনেক কঠিন হয়ে গেছে।

ইংরাজীতে যে sin বলা হয়, আর আমরা ভারতীয় ভাষায় যে পাপ বলছি, দুটোর মধ্যে বিরাট তফাৎ। Sin কে যখন বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃতে ট্রান্সলেট করে তখন বলা হয় পাপ, আরা পাপকে ইংরাজীতে অনুবাদ করার সময় sin বলে, সবাই তাই করে। কিন্তু দুটো এক নয়, পুরো আলাদা। Sin মানে ঈশ্বরীয় আদেশকে উল্লঙ্ঘন করা, এর মূল সূত্র আসে বাইবেল থেকে। বাইবেলে আদম আর ঈভের কাহিনী আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। আদম আর ঈভকে ভগবান বললেন, তোমরা ওই আপেল গাছের ফল খাবে না। কিন্তু জ্ঞানসর্প এমন তাকে দংশন করল যে, যার প্রভাবে আদম আর ঈভ গিয়ে আপেল খেয়ে নিল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদমের মধ্যে এই বোধ এসে গেল যে, আমি পুরুষ সে নারী, ঈভেরও বোধ এসে গেল আমি নারী সে পুরুষ। ভগবান দেখেই বুঝে গেলেন, এদের ভিতর পাপ এসে গেছে। আমার লেখা বই ‘The World of Religion’ বইতে যেখানে জুহুদি ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে আমি এটা আলোচনা করেছি, কেন knowledgeকে ভগবান পাপ বলছেন, আর কেন

ভগবান গার্ডেন অফ ইডেন থেকে দুজনকে বার করে দিলেন। জুহুদিদের নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে, খ্রীশ্চানিটি এই কাহিনীকে মানছে, তাদেরও নিজস্ব আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে। ইসলামেও এই কাহিনীকে মানা হয়, এবং তাদেরও আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে।

বেদান্তের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এর খুব সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বেদান্তের দৃষ্টিতে আদম আর ঈভ একটা মুক্তির অবস্থায়, এটাকে ঠিক অদ্বৈত জ্ঞান বলা যাবে না, ভক্তিশাস্ত্রে যে চার রকম জ্ঞানের কথা বলা হয় – সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য ও সারূপ্য – ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করা, ঈশ্বরের সঙ্গে এক লোকে অবস্থান করা, ঈশ্বরের মত রূপ পেয়ে যাওয়া আর ভগবানের কাছে কাছে থাকা। ভক্ত সাযুজ্য চায় না, সাযুজ্য হল, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া। রামানুজ এই মতের ছিলেন, তিনি বলতেন, ভক্ত চিনি হতে চায় না, চিনি আস্বাদ করতে চায়। সেইজন্য ভক্ত সাযুজ্য চায় না। যে ধর্মে বা যে দর্শনে অদ্বৈতের উপর জোর দেওয়া হয় না, সেখানে তাদের কাছে এটাই মুক্তি – সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য। ঈশ্বরের লোকে বাস করছেন, তাঁর কাছে বাস করছেন, সেই রূপে আছেন, এটাই মুক্তি। মুক্তির আলাদা আলাদা ভেদ, তার গভীরতা নিয়ে বলছেন।

আদম আর ঈভ ঈশ্বরের সঙ্গে একসাথে বাস করছিল। সেখানে আদম নেই, ঈভ নেই, ঈশ্বর নেই; এর অর্থ হল, কোথাও কোন ভেদ নেই, তাঁরা একই রকম আছে। এরপর হঠাৎ আদম আর ঈভের এই জ্ঞানটা হয়ে গেল, আর এই জ্ঞানটা নিম্নমানের জ্ঞান, সেইজন্য এটাকে সর্প দিয়ে বলাচ্ছে। কি জ্ঞান? সেখানে পরিষ্কার তাদের দ্বৈত ভাব এসে গেছে। আদম তখন দেখছে ঈশ্বর থেকে আমি আলাদা – আমি পুরুষ সে নারী। এর আগে পর্যন্ত তার মধ্যে পুরুষ নারীর ভেদ ছিল না, এতক্ষণ সে ঈশ্বরের সামীপ্য ভোগ করছিল। এই যে জ্ঞান এখন হল, এই জ্ঞানে এবার তার পতন হবেই, কারণ বেদান্ত মতে তার মধ্যে অবিদ্যা এসে গেছে। অবিদ্যা মানে ঈশ্বর থেকে সে আলাদা হয়ে গেল। সেইজন্য স্বর্গ থেকে তার পতন হবেই। সৃষ্টি চালু হয়ে গেল।

জুহুদি ধর্ম এটাকেই পাপ বলছে। ঈশ্বর আদেশ করেছেন, তুমি আদেশ পালন করোনি, এটাই পাপ। এরপর জুহুদি ধর্ম যখন আরও বড় হতে শুরু করে, তখন জুহুদিদের যিনি ধর্মনেতা, তাঁর সাথে ভগাবনের একগুচ্ছ চুক্তিপত্র তৈরী হল, ওদের ভাষায় এটাকে বলে covenant। ভগবান জুহুদিদের সাথে treaty করলেন, তোমরা যদি এই রকমটি কর, তাহলে আমি তোমাদের এই রকমটি দেব। আমরা এর উল্টোটা করি, মন্দিরে গিয়ে বলি, হে ঠাকুর, এই পাঁচ টাকার সন্দেশ দিলাম, আমাকে একটা চাকরি করে দাও। জুহুদের উল্টোটা হয়, ভগবান বলবেন, আমি তোমাকে চাকরি দেব, বদলে তোমাকে এটা করতে হবে। সব মিলিয়ে জুহুদিদের এই ধরণের প্রায় পাঁচশটা covenant আছে। ওদের পণ্ডিতরা বসে বসে এগুলোকে লোকেদের ব্যাখ্যা করতে থাকেন। যদি চুক্তি খেলাপ করা হয়, তাহলে ওটা পাপ হয়ে যাবে। মোজেসের টেন কমাণ্ডমেন্টস আছে, ওটাকে অতিক্রম করা মানেই পাপ।

খ্রীশ্চানিটিতে যীশু এভাবে কিছু বলেননি, কিন্তু খ্রিশ্চানিটি দাঁড়িয়েছে জুহুদের ধর্মের উপরে। ওনারা এগুলোকে নিজের মত করে একটা ব্যাখ্যা করে দেন। খ্রীশ্চানরাও পাপ বোধ থেকে বেরোতে পারলেন না, সেইজন্য ওনারা নিয়ে এলেন একটা নূতন শব্দ – original sin। আদম আর ঈভ ঈশ্বরের কথা অমান্য করে নিজেদের মত কাজ করেছে। সেই থেকে খ্রীশ্চানিটিতে যত শিশু জন্ম নিচ্ছে তারা সবাই এই অরিজিনাল সিনের ছাপ নিয়ে জন্মাচ্ছে। আর জীবনটা হল, তাকে এই অরিজিনাল সিন থেকে বেরিয়ে আসা, যারা বেরিয়ে আসতে পারবে তারাই স্বর্গে জায়গা পাবে। এখন এর জন্য অনেক কিছু রয়েছে, অনেক কিছু মানে, ঈশ্বর যে আদেশগুলো করে রেখেছেন, সেগুলো পালন করা, নিজেকে পবিত্র করা ইত্যাদি অনেক কিছু আছে।

ইসলাম আবার অরিজিনাল সিনকে মানে না, কিন্তু আল্লা মহম্মদের মুখ দিয়ে অনেকগুলো আদেশ দিয়ে রেখেছেন। যখনই কোন মুসলমান আল্লার কোন আদেশকে উল্লঙ্ঘন করছে, তখন ওটাই

পাপ। ইসলাম আর জুহুদিদের ধর্মে পাপের ধারণা খুব জোরাল, যেখানে তাদের যে ঈশ্বর, তাঁর আদেশকে অমান্য করা বা আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়াটাই ঠিক ঠিক পাপ। খ্রীশ্চানরা অরিজিনাল সিনের সিস্টেমে বড় হয়েছে, সেইজন্য ওখান থেকে ওরা আর বেরোতে পারছে না। ওরা বলে, ঈশ্বর তো যীশুর মাধ্যমে আদেশ দেননি যে, তোমাকে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, বা এটা করা যাবে না। কিন্তু ওদের মাথায় বসে আছে অরিজিনাল সিন, আদম আর ঈভ যে পাপটা করেছিল, সেই পাপটা খ্রীশ্চানরা এখনও বহন করে যাচ্ছে, আর চিরদিন বইতে হবে। খ্রীশ্চানরদের কাছে, জন্ম থেকে তুমি পাপী। অথচ যীশু কোথাও এই কথা বলেননি।

হিন্দুদের ক্ষেত্রে কি হয়, খ্রীশ্চানদের অরিজিনাল সিনকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন খ্রীশ্চানিটি আর হিন্দুদের অনেক মিল এসে যাবে। কারণ আমাদের এখানে কমাণ্ড বলে কিছু নেই। যদিও আমাদের বেদে প্রচুর বিধি নিষেধ রয়েছে। বিধি মানে, যেগুলো করা যাবে আর নিষেধ মানে যেগুলো করা নিষিদ্ধ। হিন্দুরা যখন যে কোন কাজ করে, তার এই পাঁচ রকম কাজ হয়। এখান থেকেই পাপ-পূণ্য কি জিনিস বোঝা যায়। মূল ডিভিশান দুটো, একটা হল বিধি, দ্বিতীয় হল নিষেধ, যেটা করতে বারণ করে হচ্ছে। বিধির আবার চারটে বিভাগ আছে।

নিত্যকর্ম – প্রথমটা হল নিত্যকর্ম, যে কর্ম সবাইকে রোজ করতে হয়। যেমন জপধ্যান, পূজা-অর্চনা, এগুলো নিত্যকর্ম।

নৈমিত্তিককর্ম – যেমন সন্তানের অন্নপ্রাশন, ছেলের উপনয়ন করানো, ষোড়শ কর্ম যেগুলো আছে, মা-বাবার শ্রাদ্ধকর্ম, পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান এগুলো সব নৈমিত্তিককর্ম।

কাম্যকর্ম – অনেক সময় মানুষের ইচ্ছে হয়, আমি এই যজ্ঞ করব, সেই যজ্ঞ করব, কারণ আমি এ-রকমটি হতে চাই, এই এই পেতে চাই; আমি জানি যজ্ঞের দ্বারা আমি যা চাইব তাই পেয়ে যাব। এগুলোকে বলে কাম্যকর্ম, কামনা থেকে কাম্যকর্ম।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম – জান্তা অজান্তায় আমরা অনেক ভুল করি, দোষত্রুটি করে ফেলি, এর থেকে শুদ্ধি পাওয়ার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। তীর্থাদিতে যাওয়াটাও প্রায়শ্চিত্ত কর্মের মধ্যে পড়ে।

নিষেধের মধ্যে ওনারা একটা কর্মের কথা বলেন, সেটাকে বলছেন, নিষিদ্ধ কর্ম। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, সব শাস্ত্রে বিধি নিষেধের যে তালিকা দিচ্ছেন, তাতে কারুর সাথে কোনটা মিলবে না। এমনকি বেদে যে জিনিসগুলিকে বলা হয়েছে সেগুলোকে নিয়ে একগুচ্ছ বিতর্ক রয়েছে। কেউ এটাকে মানবে, কেউ মানবে না। মনুস্মৃতি আদি স্মৃতিশাস্ত্রে ওনারা বলেই দেন যে, দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে এগুলো পালটে যায়। তাহলে পাপ কি? বলছেন, নিত্যকর্ম যদি না করা হয়, অকরণে প্রত্যবায়। সংস্কৃতে পাপ শব্দটা আগে ব্যবহার করা হত না, বদলে তারা বলতেন প্রত্যবায়, প্রত্যবায় মানে পাপ। প্রত্যবায়কে যদি সংস্কৃতের নিয়মে অনুবাদ করা হয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায়, পথ থেকে যেন সরে গেছে।

বলছেন, নিত্যকর্ম যদি না কর তাহলে পাপ, নৈমিত্তিককর্ম যদি না কর তাহলে পাপ, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম না করলেও পাপ। কাম্যকর্ম না করাই ভাল, সন্ন্যাসীরা তো কোন মতেই করবে না। যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে চলে গেছেন, তাঁরা কোন মতে, কোন পরিস্থিতিতে কাম্যকর্ম করবেন না, এমনকি পূজার সময় বেড়াতে যাচ্ছি, এটাও করবেন না। যাঁরা ধর্ম পথে যাচ্ছেন তাঁদের জন্য নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিকিকর্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। সাধারণ মানুষের জন্য বলছেন, যাঁরা ধর্ম পথে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য এই বিধি।

নিষিদ্ধ কর্মের ক্ষেত্রে একটা বিরাট তালিকা দেওয়া আছে, সেই তালিকায় কি কি করা যাবে না বলে দেওয়া হয়েছে। পাপকর্মের ব্যাখ্যা করার জন্য এবং কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, এই ব্যাপারে বিভিন্ন স্মৃতিকাররা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেমন গীতায়, বিশেষ করে গীতার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বার বার করে বলছেন, কাম ও ক্রোধ এবং রাগ ও দ্বেষ, এটাই মহাপাপ। তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান পরিষ্কার বলছেন, *কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা*, কাম আর ক্রোধ পাপ সৃষ্টি করে। অন্য জায়গায় আবার বলবেন, রাগ আর দ্বেষ থেকেই পাপ আসে। রাগ মানে কোন কিছুর প্রতি আসক্তি, আর দ্বেষ মানে সেটা থেকে বিরক্তি। যদি আপনার মনে কোন কিছুর প্রতি আসক্তি হয় বা কোন কিছুর প্রতি বিরক্তি হয়, তাহলে এবার এরা পাপ সৃষ্টি করবে। কারণ যে কারণে বিরক্তি বা যেটার প্রতি বিরক্তি হচ্ছে, তখন মানুষ ক্রোধিত হয়ে যায়। যে জিনিসটাকে মানুষ চাইছে সেটার প্রতি তার কাম ভাব থাকে। কাম আর ক্রোধ যা, রাগ ও দ্বেষও তাই, দুটো একই জিনিস।

পাপ মানে, আপনি যে জ্ঞানের পথে এগোচ্ছেন, যে জিনিসটা আপনাকে টেনে জ্ঞানের পথ থেকে সরিয়ে দেয়, সেটাই পাপ। বেদান্ত মতে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি, মুক্তি এটাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এমন কোন কর্ম করলেন, যার ফলে আপনার মনটা এমন নীচে নেমে গেল যে, আপনি আর জ্ঞানের পথে থাকলেন না, জ্ঞানপথ থেকে ছিটকে অন্য কিছুতে আপনি মজে গেলেন, তখন এটাকে বলছেন পাপ। মনে রাখতে হবে, এই পাপ আর সেমেটিক ধর্মে যেটাকে পাপ বলছে, দুটোতে বিরাট বড় তফাৎ। কথামৃত পড়তে পড়তে এই জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে।

আমরা যে সমাজে আছি, বা যে পরিবারে আছি, সেখান থেকে শুনে শুনে আমরা অনেক ব্যাপারে নিজের মত ধারণা করে নিই। যেমন গুরুজনের কাছে শুনে, আমাদের ধারণা করে নিই যে, আমার এই কাজ করা ঠিক হবে না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মন যখন উন্নত হয়ে যায় তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাপ কি পূণ্য কি পরিষ্কার করে এর কোন পরিভাষা নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমি ঈশ্বরের পথে চলছি, কোথাও আমার মনে একটা দুর্বলতা এসে গেলো, আমি এটা করব কি করব না? এখানে শাস্ত্রকাররা আগেই বিধান দিয়ে রেখেছেন, তুমি করতে পার, কিন্তু পরে তুমি প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করে নেবে।

ঠাকুর পাপের সংজ্ঞা দিচ্ছেন – যেটা করলে মন খুঁত খুঁত করে। আমরা বলতে পারি, ক্রিমিনালরা আরামসে কাউকে গুলি মেরে দিচ্ছে, ডাকাতি করছে, চুরি করছে, ব্যাঙ্কের টাকা জালিয়াতি করে বিদেশে গিয়ে বসে যাচ্ছে। তাদের মন তো একটুও খুঁত খুঁত করছে না। এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে যাঁরা আধ্যাত্মিকতায় একটু জাগ্রত হয়ে গেছেন। কাউকে খুন করে, লুট করে, অপরকে কষ্ট দিয়ে যাদের মন খুঁত খুঁত করে না, বুঝবেন এরা সব অসুর, দৈত্য, দানব। দেবতারা সবাইকে নিয়ে চলেন, অসুররা শুধু নিজেকে নিয়ে চলে, নিজেরটুকু ছাড়া এরা অন্য কিছু জানে না। অসুররাও ধর্ম করে, ওরাও দানধ্যান করে, সেটা হল নিজেকে দেখানোর জন্য। ইদানিং যে বারোয়ারী দূর্গাপূজাগুলো হয়ে, সেখানে কি এলাহি জাঁকজমক, সবাইকে দেখাচ্ছে, দেখো আমাদের কি বিশাল প্যাণ্ডেল! প্যাণ্ডেলের বাহার দেখেছ! কি লাইটিং! আসবেন আমাদের প্যাণ্ডেলে। এদের কাছে মা দূর্গা কিছু না, প্রধান হল প্যাণ্ডেল, আলোকসজ্জা, আর মূর্তির সাজগোজ।

এই যে একটা ভূমিকা দেওয়া হল, সংক্ষেপে এর অর্থ হল – একটা বাচ্চা ছেলে ঠিক কি, ভুল কি জানে না। তার মা তাকে প্রতি পদে পদে বলতে থাকে, বাবা ও-রকমটি করতে নেই, এই বলে বলে বার বার বাচ্চাকে আটকে দিচ্ছে। এখান থেকে ধীরে ধীরে বাচ্চার মনে একটা চেতনা এসে যায়, এটা করা ঠিক, এটা করা ঠিক না। ধর্ম পথেও ঠিক তাই হয়। যিনি গুরু, যাঁরা আচার্য, তাঁরা বার বার বলতে থাকেন, এটা করতে নেই, এটা করতে আছে, এটা করা যায়, এটা করা যায় না। বাচ্চারাও তাদের

বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে, এটা কেন করা যাবে না? মায়েরা বাচ্চার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। ধর্ম পথে খুব সহজে বলে দেওয়া যায় – এটা যদি কর, তাহলে তুমি যে ঈশ্বরের পথে এগোচ্ছ, ওই পথ থেকে সরে যাবে, তোমার দেরী হবে।

তাহলে পাপ আছে কি নেই? বাইবেলকে যারা অনুসরণ করে, বা বাইবেলকে আধার করে যত ধর্ম আছে, তাদের কাছে পাপ আছে। হিন্দুদের কাছে, বিশেষ করে বেদান্ত মতে পাপ বলে কিছু নেই। আছে শুধু কর্ম। ওই কর্মে যদি আপনার মন আসক্ত থাকে, তাহলে পাপ, ওই কর্মে যদি বিরক্তি থাকে তাহলে পাপ, নির্বিকার ভাবে কর্ম করছেন, তাহলে পূণ্য। জিনিসটা নিজের মত চলে যাচ্ছে, আপনার সঙ্গে কারুর কোন সম্পর্ক নেই। মা মনে করছে, সে না থাকলে তার ছেলের কি হবে? অনাথ শিশুরা কি বড় হয় না? অর্ফানে বাচ্চারা কি বড় হয় না? সৃষ্টি যিনি করেছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে দেখেন। কাজ করার সুযোগ যদি পান, তাহলে আগে নিজেকে ধন্য করুন, অপরকে ধন্য করতে হবে না। একটা বাচ্চাকে আপনার মানুষ করতে হবে, বা একটা চাকরি করছেন, ব্যবসা করছেন, যে কোন কাজ আপনি করুন না কেন, সব কাজের একটাই উদ্দেশ্য – ওই কাজের মাধ্যমে নিজে কি করে মহৎ হব।

আপনার কাজ দিয়ে আপনি কাউকে ধন্য করছেন না, একটা শিশুকে পালন করছেন, এতে আপনি শিশুর কোন মঙ্গল করছেন না, ওটা আপনি নিজে ভাবছেন। যখনই আপনি ভাববেন, আমি তার মঙ্গল করছি, আমি তার ভাল করছি, তখনই আপনার আসক্তি হবে। ঠিক তেমনি যখনই মনে করছেন, সে আমার ক্ষতি করছে, তখনই আপনার মনে একটা বিরক্তি আসবে। এটাই সংসার, সংসার মানেই যেখানে আসক্তি আর বিরক্তি রয়েছে। আপনার নিজের ভিতর যে আসক্তি ও বিরক্তি, সেটা আপনার সংসার। আর অপরের মনের আসক্তি ও বিরক্তি যেটা আপনার মনে হচ্ছে, এটা আপনার সংসারটাকে আরও বাড়ায়। প্রথমটা হল অহংতা, পরেরটা হয় মমতা। এই অহংতা আর মমতা, আমি ও আমার, এই দুটো মিলিয়েই সংসার। এর মধ্যেই পাপ-পূণ্যের খেলা চলছে। কর্ম রূপে পাপ নেই, পূণ্যও নেই। ইমোশানস দিয়ে আর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পাপ আর পূণ্য হয়। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত, যাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, যাঁদের উদ্দেশ্য মুক্তি, তাঁরা এগুলোর দিকে তাকান না। তাঁরা জানেন, যে পরিস্থিতি এসেছে, আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছে। দরকার হলে করে দিলেন, দরকার না হলে নির্বিকার থেকে গেলেন, অর্থাৎ যেমন যেমন পরিস্থিতি তেমন তেমন করে এগিয়ে চলে যান। ঠাকুর ঠিক এই ভাব দিয়েই শুরু করছেন।

প্রাণকৃষ্ণের প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয়, পাপবুদ্ধি কেন হয়? এখানে আরেকটা ছোট্ট কথা বলার আছে, যাঁরা সত্যিকারের পণ্ডিত, আমরা শুনেছি নর্মদার তীরে, হিমালয়ে বড় বড় মহাত্মারা আছেন; নিশ্চয়ই আছেন, তা নাহলে লোকেরা যায় কেন। তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে দেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে অত শাস্ত্র নেই, হয়ত ধর্মের একটা কোন ছোট বই আছে, সেটাই সময়ে অসময়ে পড়ছি, কারণ একসের ঘটিতে তিন সের দুধ ধরবে না। আমাদের ছোট্ট বুদ্ধি, এর থেকেই আমরা দু-চারটে কথা ধরে নিই, ধর্মের বাকি সব কিছু আমাদের কাছে অজানা থেকে যায় আর যেটা শুনি সেটাতে সংশয় লেগে থাকে। অন্যান্য ধর্মে কি হয়, কিছু না হোক একটা চটি বই আছে, ওই বইটা পড়ে নিল, তার থেকে যতটা বুঝল, তারপর তাদের চার্চ রয়েছে, নানা রকমের সংগঠন রয়েছে, চিঠি লিখলে তারা আদেশ পেয়ে যান – এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না। হিন্দুদের সে রকম কোন কিছু নেই, না আছে কোন centralized Church, না আছে কোন পোপ, না আছে কোন central book। ফলে লোকেদের মনে হাজার রকমের জিজ্ঞাসা ঘুর ঘুর করতে থাকে।

১৮৮২ সাল, লোকেরা এখনও ঠাকুরের মাহাত্ম্য জানেন না। কেশব সেন ঠাকুরের সম্বন্ধে দু-চারটে লেখালেখি শুরু করেছেন, একটু একটু নাম হচ্ছে। ঠাকুর যেখানেই যাচ্ছেন গান করছেন, নৃত্য করছেন, একটু একটু কথা ছড়াচ্ছে। আবার অন্য রকম কথাও ছড়াচ্ছে, অনেকের কাছে তিনি পাগল,

আবার অনেকের কাছে ঠাকুর এমন কিছু আহামরি কেউ নন। আমরাই যদি সেই সময় থাকতাম আমরা ঠাকুরকে কতটুকু আর সম্মান দিতে পারতাম। আজকে দশজন মানছে বলে আমরাও ঠাকুরকে মানছি। কিন্তু তখন থাকলে যে মানতাম, প্রশ্নই উঠছে না। লোকেরা যে মানত না, এটাই স্বাভাবিক। অবতার মানেই তাই, সময় না হলে অবতারের কথা ছড়াতে শুরু হয় না। লোকেরা ভাবছে ইনি একজন সাধু, জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, পাপবুদ্ধি কেন হয়। এটা যে একটা বিরাট কোন প্রশ্ন তাও না। যেমন স্বামীজী বেশ কিছু দিন আমেরিকায় ক্লাশ নিচ্ছিলেন, তার তিন চার বছর পর যে প্রশ্নগুলি আসবে, সেগুলোর গুণগত মান অন্য রকমের হবে। এটা হল, কয়েকজন মিলে একটা জায়গায় বসে কথাবার্তা হচ্ছে, তার মধ্যেই কথার ফেরে প্রশ্ন করা হচ্ছে। অনেক সময় মনে কোন জিজ্ঞাস উঠছে, অনেক সময় এমনি প্রশ্ন করার জন্য প্রশ্ন করা হয়, আবার অনেকে কথাটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য একটা প্রশ্ন রেখে দেন। কথামৃতেই আমরা পরে দেখব, ঠাকুরই অনেক সময় প্রশ্ন করতেন, 'আচ্ছা মশাই, এই ব্যাপারে আপনার কি মত'? বলার পর, ঠাকুর ওটাকে ধরেই আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কথা চালানোর জন্য অনেক সময় মানুষকে কিছু কথা বলে যেতে হয়। কিন্তু ঠাকুর যখনই কোন কিছু বলবেন, বিশেষ করে ধর্মকে নিয়ে, সেখানে ঠাকুর একশ ভাগ নিষ্ঠা নিয়ে যেটা সত্য সেটাকেই বলবেন, সেখানে কোন ডানদিক বামদিক করবেন না।

ঠাকুর এবার বলছেন, "**তাঁর জগতে সকলরকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, দুষ্ট লোকও তিনি করেছেন, সদ্‌বুদ্ধি তিনিই দেন, অসদ্‌বুদ্ধিও তিনিই দেন**"।

যেমনি এই বাক্যটা পড়বেন তখনই আপনার মনে হবে, এই যে আমি একটা লম্বা ভূমিকা দিলাম, এই ভূমিকার সাথে এর কি সম্বন্ধ আছে। আমি লম্বা যেটা বললাম, ঠাকুর যেটা বললেন, তিনিই এই সব করেছেন, দুটো একই জিনিস। তফাৎ হল, ঠাকুর পাত্রতা বুঝতেন। সব আচার্যরা পাত্রতা বুঝতে পারেন না। আমাদের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ খুব মজা করে বলতেন, উনি একবার হরিদ্বার গিয়েছিলেন। হরিদ্বারের একটা আশ্রমে ধর্মপ্রসঙ্গ চলছিল, পাঞ্জাবের লোকেরা প্রচুর লেকচার শুনতে যায়। মহারাজ একজনকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ধর্মপ্রসঙ্গের আলোচনায় আজ কি শুনলে'? বলছেন, 'বেদান্ত কি বড়ী বড়ী বাঁতে'। 'বেদান্তের কি বড় বড় কথা শুনলে'? 'বোলা আকাশ সে বায়ু উৎপন্ন হুয়া'। আকাশ কি, বায়ু কি, কিছুই বোঝে না। আচার্যরা পাত্রতা বোঝেন না। আচার্যরা পাত্রতা বুঝবেন, বুঝে যারা শ্রোতা তারা যাতে বুঝতে পারে তার মত করে বলবেন। এটা একমাত্র যাঁরা Masters তাঁরাই পারেন।

অনেক আগে একটা ঘটনা পড়েছিলাম, খুব মজার ঘটনা। ওখানকার কম্প্যুটারের এক বড় কোম্পানি ফিনান্স সেক্টরের জন্য একটা প্রোগ্রাম বানিয়েছে। ফিনান্স সেক্টর থেকে লোকেরা কোম্পানিতে প্রোগ্রামের ব্যাপারে যখন খোঁজখবর নিতে এসেছে, তখন এই প্রোগ্রামের যিনি প্রধান তিনি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ওনার এ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে তাদেরকে প্রোগ্রামের ব্যাপারে বোঝাচ্ছে। কিন্তু সে তাদের কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। কোম্পানির সাথে এদের একটা বড় ডিল হতে যাচ্ছিল, না বোঝাতে পারার জন্য ডিলটা বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। প্রোগ্রামের হেডকে ডাকা হল। হেড এসে শুধু দুটো কথা বললেন – ছাদে উঠতে গেলে একটা মই লাগানো হয়। মইকে ব্যবহার করার আগে একবার ঝাঁকিয়ে দেখে নেওয়া হয়, মইটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কিনা। যদি দেখে মই নড়বড় করছে না, স্থির আছে, তবেই মইয়ে উঠবে। আমার এই প্রোগ্রাম আপনাদের যে বাকি প্রোগ্রামগুলো আছে, সেটাকে ঝাঁকিয়ে দেখে নেয়, এই প্রোগ্রামটা দাঁড়াতে পারবে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রোগ্রাম কিনে নিল। একটা বাক্যে বুঝিয়ে দিলেন।

Master মানে, একটা বাক্যে বুঝিয়ে দেবেন। থিয়েটারওয়ালারা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে, মহাশয়, ঈশ্বর দর্শন কেমন? আমি আপনি হলে বলতাম, একেই থিয়েটারওয়ালা, সে আবার ঈশ্বর

দর্শনের কথা জিজ্ঞেস করছে। ঠাকুর কিন্তু ওদের মত করে কি সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন। থিয়েটার হল, দর্শকরা সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, এদিক ওদিক দেখছে, হঠাৎ থিয়েটারের পর্দা উঠে গেল, সব কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল আর সবার দৃষ্টি একবারে থিয়েটারে চলে গেল। কথামৃত অনেক অল্প বয়স থেকে পড়ছি, কিন্তু একটু বয়স হয়ে যাওয়ার পর চিন্তন করে যখন ঠাকুরের ওই বাক্যটা পড়েছিলাম, তখন মনে হয়েছিল – এই হচ্ছেন আচার্য। প্রশ্ন যে করেছে, ঠিক তার মত করে একদম ঠিক উত্তরটা দিচ্ছেন, যাতে ওর মধ্যে আর কোন সংশয় না থাকে। ওখানে বাকি এক পাতা দেড় পাতা জুড়ে ঠাকুর ওটাই বলছেন, এটা আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বললাম। কিন্তু যিনি প্রশ্ন করেছেন তার অত বুদ্ধি নেই, তাকে ঠাকুর ধীরে ধীরে নিয়ে আসছেন। প্রথমে ঈশ্বরকে নিয়ে এলেন, কারণ সাধারণ মানুষ ওই ভাবেই দেখে – ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর ভাল করছেন, মন্দ করছেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি ওটাকে impersonal বানিয়ে দেবেন।

সেই প্রতিবেশী আবার প্রশ্ন করলেন – "**তবে পাপ করলে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই**"?

ঠাকুর তখন বলছেন – "**ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে, তার ঝাল লাগবে না**"?

এই যে কার্য-কারণ সম্পর্ক, Law of কর্মবাদ, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, এটা সবাই জানে। ঠাকুর এই জায়গা থেকে ধরলেন। ঠাকুর ওখান থেকে টেনে টেনে যতক্ষণ যাবেন, আমি আশা করছি যাঁরা শুনছিলেন তাঁরা অতটা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু প্রথমটা বুঝতে পারবেন যে, তিনি এটা করেছেন, এটা তাঁর ইচ্ছা। বক্তব্য হল, পাপ আছে, তুমি সাবধান থাক। কিন্তু এই এক পাতার মধ্যেই দেখবেন, ঠাকুর কিভাবে স্থূল থেকে সুক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলছেন –

"**সেজবাবু বয়সকালে অনেকরকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানারকম অসুখ হল। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হয়ে যত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচফোঁচ করে উনুন নিভিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ – এ-সব থেকে সাবধান হতে হয়**"।

সুঁদরী কাঠ সুন্দরবন থেকে আসে। কিছু কাঠ আছে যার মধ্যে অনেক জল থাকে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সুঁদরী কাঠের ভিতরে অনেক জল থাকে। প্রথমের দিকে এই ধরণের কাঠগুলো খুব জ্বলে, তারপর জলটা পিছিয়ে আসে, শেষ আগুনটাকেই নিভিয়ে দেয়। এটা খুব সাধারণ ব্যাপার, যদি মনে করেন ঈশ্বর করেছেন, তাহলে আপনি ওটা থেকে কোন দিন বেরোতে পারবেন না। ঈশ্বর বিধান করে দিয়েছেন, এ-রকম হলে এ-রকম হবে, তার সাথে, আমরা হাতি নারায়ণ মাহুত নারায়ণের কথা শুনলাম, সেই বুদ্ধিটাও তিনি দিয়েছেন। কিন্তু এই চারটে বাক্যে দুটো উপমা দিচ্ছেন, আর চতুর্থ বাক্য আসতে আসতে ঠাকুর গীতার যে ভাব, সেই ভাবে চলে এলেন। ঠাকুর আর পাপে থাকলেন না, পাপ থেকে সরে পাপ জিনিসটা, যেটা ঈশ্বর থেকে বিমুখ করে দিচ্ছে – কাম, ক্রোধ, লোভ এই জিনিসগুলিতে চলে এলেন। কাম হল অনুরাগ আর ক্রোধ হল রাগ, অনুরাগ আর রাগ – এই দুটোর মধ্যে ঢুকে গেলেন। তোমার ভিতর যে কাম, ক্রোধ আছে, এটাই তোমাকে দিয়ে পাপ করাবে। পাপ করাবে মানে, ঈশ্বর থেকে তোমাকে বিমুখ করে দেবে। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হওয়াটাই পাপ, এ-ছাড়া কোন পাপ হয় না।

ঠাকুর বলছেন, "**দেখ না, হনুমান ক্রোধ করে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়ল, অশোকবনে সীতা আছেন, তখন ছটফট করতে লাগল, পাছে সীতার কিছুর হয়**"।

হনুমান একটা কাজ নিয়ে লঙ্কায় এসেছেন, তিনি মূলতঃ একটা কাজ করছেন। ওই কাজের মধ্যে কোথাও একটা নিজের আমিটা ঢুকে পড়েছে, সেটা হল ক্রোধ। আপনি যত ভাল কাজই করুন, সেই ভাল কাজের মধ্যে মন্দ কিছু থাকবেই, যেমন আগুন থাকলে ধোঁয়া থাকবেই। যেমনি কারুর ক্রোধ এসে গেল, কিংবা ভালবাসা একটা সীমারেখা যখন পেরিয়ে গেল, এবার মাটি আর জল মিশে গেল, ফলস্বরূপ কাদা হবেই। মাটি খুব ভাল জিনিস, জলও খুব ভাল জিনিস, কিন্তু দুটো মিশে গেলে কাদা হবেই। কাম, ক্রোধেরও নিজের নিজের জায়গায় দরকার আছে, আর কাজেরও দরকার আছে। কিন্তু কর্মের মধ্যে যেমনি কাম ক্রোধ ঢুকে যাবে, এবার কাদা তৈরী হবে। চারটেই ‘ক’ – কর্ম+কাম+ক্রোধ=কাদা।

ঠাকুরের কথা শোনার পর প্রশ্নকর্তার সংশয় কিছুটা হয়ত পরিষ্কার হল। সেখান থেকে তিনি এবার প্রশ্ন করছেন – “**তবে ঈশ্বর দুষ্ট লোক করলেন কেন**”?

মানুষ কত sallow হয় এইসব প্রশ্ন শুনলে বোঝা যায়। আমার কাছে একটা টেররিস্ট হল দুষ্ট লোক, আর তার দলের কাছে সে হল একজন মহান বীর। ইংরেজদের কাছে ক্ষুদিরাম বোস, চন্দ্রশেখর আজাদ হল টেররিস্ট, আমাদের কাছে তাঁরা সাচ্চা দেশপ্রেমিক। তাহলে দুষ্ট লোক কিসের, এই সহজ জিনিসটা বোঝার মানুষের ক্ষমতা নেই। শুধু যে ঠাকুরের সময়েই এই ধরণের স্যালো মানুষ ছিল তা না, আজকেও এই অবস্থা, কোথাও কোন পরিবর্তিন হয়নি। কারুর সাথে কথা বলে দেখুন, যে কোন বিষয় নিয়ে এমন ছেলেমানুষী মন্তব্য করবে, একটু গভীরে যে যাবে তার কোন চেষ্টা নেই। স্বামীজীকে যদি কেউ এই প্রশ্ন করতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত দিয়ে বলে একেবারে দাবিয়ে দিতেন। কিন্তু ঠাকুর করুণাময়, ঠাকুরের ভাব পুরোটাই inclusive, তিনি সবাইকে নিয়ে চলছেন, ঠাকুর খুব নরম করে বলছেন, এর কোন ব্যাখ্যা নেই। কোন ব্যাখ্যা নেই, এটাকেই ঠাকুর বলছেন –

“**শ্রীরামকৃষ্ণ – তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা**”।

যখনই দেখবেন তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা বলা হচ্ছে, তার মানে, মনের জগৎ থেকে এর উত্তর পাওয়া যাবে না। যখনই ‘ঠাকুরের ইচ্ছা’ বা ‘God’s will’ শব্দ এলো, বা ‘লীলা’ শব্দ এলো, আমাদের মত লোকেদের কাছে ওর অর্থ সব সময় একটাই হবে – আমার কাছে এর উত্তর নেই। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা, তার মানে, এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। মায়ার জগতে থেকে মায়াকে নিয়ে প্রশ্ন হয় না। অন্ধকারে থেকে অন্ধকারকে দেখব, এটা সম্ভব নয়। সমস্ত ধর্মশিক্ষা, সমস্ত ধর্ম আলোচনার একটাই উদ্দেশ্য, মানুষকে ধর্মের পথে নিয়ে যাওয়া। ধর্মের পথে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যাবে, এতে জগতের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

স্বামীজী জগৎকে তুলনা করে বলছেন, এই জগৎটা হল একটা জিমনাসিয়াম, body-building unit, অনেকবার তিনি এই কথা বলছেন। বলা হয়, জগতের ভাল কর। জগতের ভাল করতে গিয়ে জগৎ ভাল হবে না, তুমি মাঝখান থেকে ভাল হয়ে যাবে। এর আগে আমরা সপুচ্ছবাদ্ নিয়ে বলেছিলাম। জগৎটা হল কুকুরের ল্যাজ, কুকুরের ল্যাজকে যতই সোজা করার চেষ্টা কর, কোন দিন সোজা করতে পারবে না, মাঝখান থেকে তুমি সোজা হয়ে যাবে। কাজ করাটাও তাই। ঠাকুর নিন্দা করে কোন কিছুকে সরিয়ে দেবেন না। জিনিসগুলো এক-একটা কর্ম, এক-একটা পরিস্থিতি, জগৎ একটা জিমনাসিয়াম, যেটাকেই আপনি কাজে লাগাতে পারবেন, আপনি বেরিয়ে যাবেন, এ-ছাড়া আর কিছু না।

ঠাকুর বলতে শুরু করেছেন – “**তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়**”।

এই যে বলছেন, অন্ধকার থাকলে আলোর মহিমা প্রকাশ হয়, ঠাকুর এই কথা দুটো তিনটে অর্থে বলছেন। ঠাকুর আদর্শকে নিয়ে কখন চলতেন না, কোন প্রফেটই কোন আদর্শকে নিয়ে চলেন না, আসলকে নিয়ে চলেন। যত লেখালেখি হয়, তাতেও এক ধরণের লেখা হয়, একটা লেখাকে বলে, Idealistic writing, আরেক ধরণের লেখাকে বলে Realistic writing। ঠাকুর, মা, স্বামীজী, এনারা হলেন Realistic levelএর মানুষ। স্বামী ভূতশানন্দজী আমাদের বলতেন, যদি জানার চেষ্টা কর এটা কেন হল, ওটা কেন হল ন; যতই তুমি খোঁজ না কেন, কোন দিন উত্তর পাবে না। ওর মধ্যেই তুমি ঘুরতে থাকবে, যেটা তোমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য, সেটা তুমি আর পাবে না। ওটাকে ঠাকুরের ইচ্ছা বলে, কর্মফল বলে মেনে নিয়ে এগিয়ে যাও। তোমার উদ্দেশ্য হল ভক্তিলাভের দিকে এগোন, উদ্দেশ্য হল মুক্তির দিকে এগোন।

দুষ্ট লোক আছে, মন্দ লোক আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর মহিমা প্রকাশ হয়; এর ব্যাখ্যা অনেক রকম হয়। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যখন কেউ তোমার নিন্দা করে, আসলে সে যেন তোমার সামনে একটা আয়না তুলে ধরছে, এই দেখ তুমি এই রকম। দুষ্ট লোক আছে, তার মানে ভাল লোকও আছে, ভাল লোক না থাকলে আপনি জানলেন কি করে এই লোকটা দুষ্ট? তার মানে ভাল আছে বলেই দুষ্ট আছে। এবার এলো গুরুর আদেশ, তুমি ওই দুষ্টর মতে হতে যেও না, ভালর মত হও। তার মানে দুষ্ট আছে বলে ভালর মহিমা হল। ভালর মহিমা যখন হল, এবার তুমি ভালর দিকে এগিয়ে যাও। ঠাকুর গল্প বলছেন, সীতা রামচন্দ্রকে বলছে, অযোধ্যার সবার যেন টাকা-পয়সা হয়। রামের মায়া হয়ে গেল, অযোধ্যার সবার টাকা-পয়সা হল। এরপর রামেরই মায়া, সীতার বাড়ির ছাদ ভেঙে গেল। রামেরই মায়া, বৃষ্টি পড়ছে। রামেরই মায়া এবার লোক পাঠালো, যাও মিস্ত্রিদের ডেকে আনো। মিস্ত্রিরা বলল, এখন আমাদের প্রচুর টাকা আছে, এই বৃষ্টির মধ্যে আমার আর কাজ করতে যাব না। তখন সীতা বলছেন, হে রাম! অযোধ্যা যেমনটি ছিল, তেমনটিই থাক। সবটারই দরকার আছে, বৃষ্টিরও দরকার আছে, কারিগরেরও দরকার আছে। এখানে যদি আপনি বলতে যান, এটা কেন, সেটা কেন; আপনি ভুল পথে চলছেন। ঠাকুর বলছেন, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। আলো নিজে ভাল, কিন্তু একটু বৈপরিত্যের ছোঁয়া দিয়ে দিলে তার ভালটা আরও ভাল এবং স্পষ্ট দেখায়।

ঠাকুর আবার নিজেই প্রশ্ন করে তার উত্তর বলছেন, **"কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন? মহৎ লোক তয়ের করবেন বলে"**।

স্বামীজী জিমনাসিয়ামের কথা বার বার বলছেন, ঠাকুরও ঠিক একই কথা অন্য ভাবে বলছেন, গুরু-শিষ্য কিনা। কাম, ক্রোধ কেন দিয়েছেন, এই প্রশ্ন করা ছেড়ে দাও। এটাকে তুমি কাজে লাগিয়ে এগিয়ে পড়ো।

"ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কি না করতে পারে? ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত তাঁর কৃপায় করতে পারে"। "আবার অন্যদিকে দেখ, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি-লীলা চলছে"।

প্যারাগ্রাফটা এখানে শেষ হওয়ার কথা ছিল, মাস্টারমশাই ওখানে একটা বাক্য জুড়ে দিয়েছেন। ওটা পরের প্যারাগ্রাফ হলে ঠিক হত। একটা খুব সাধারণ কথা – তাঁর বিধান, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে। সেখান থেকে চারটে বাক্য বলতে না বলতে ঠাকুর এসে যাচ্ছেন শেষ কথায়। কাম, ক্রোধ যে আছে, এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এই কাম, ক্রোধকে যে জয় করে নেয়, সে হয় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। জিতেন্দ্রিয় কি না করতে পারে, বলছেন, তাঁর কৃপায় ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু এই সংসারে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, যেটাকে আমরা কর্মবাদ বলছি। তবে ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন কর্মের উপর নির্ভর করে না। জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেলেই যদি আপনার ঈশ্বরদর্শন হয়, তাহলে কর্মবাদের মূল তত্ত্বটাই ভুল হয়ে যাবে। যে কোন কর্ম দিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হতে পারে না, ঈশ্বর দর্শন হতে

পারে না, মুক্তি হতে পারে না। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জপ করলেও ঈশ্বরদর্শন হবে না। সারা জীবন ধ্যানে ডুবে থাকুন, ঈশ্বর দর্শন হবে না, মুক্তি হবে না। ঈশ্বর দর্শন কেন হয়, কার হয় – এর উত্তর কারুর কাছে নেই। কিন্তু এটা খুব পরিষ্কার যে, যিনি ইন্দ্রিয় জয় করেননি, যিনি কাম, ক্রোধে আসক্ত, যাঁর মন অবিবেকী, তাদের জ্ঞান হয় না, ঈশ্বরদর্শন হবে না। ক্ষেতে আপনি যদি ভাল করে চাষ করে থাকেন, তাই বলে যে আপনার ফসল ভাল হবে, তা নয়। কিন্তু এটা পরিষ্কার, ক্ষেতে যদি চাষ না করা হয়, ফসলই হবে না। লটারীতে টিকিট কাটলেই যে টাকা পেয়ে যাবেন, তা নয়। কিন্তু টিকিট যদি না কাটেন, কোন দিনই লটারীতে টাকা পাবেন না।

ইন্দ্রিয় যে জয় করেছে, এই কথা বলেই ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, তাঁর কৃপায় সে ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত করতে পারে। ঠাকুরেরই কথা, জ্ঞানীর কখন বেতালা পা পড়বে না। ঠাকুরও জ্ঞানী কিনা, তিনি আচার্য কিনা; ক্যাজুয়াল কথা বলার সময়েও একটা শব্দ ডানদিক বামদিক যাবে না। মায়ার জগতে কর্ম হল শেষ কথা। যেখানে কর্ম শেষ, যেখানে মায়া শেষ, এরপর কার্য-কারণের আর কোন সম্পর্ক নেই। মায়ার বাইরে মায়ার কোন আইন প্রযোজ্য হয় না, তাই সেখানে কোন কার্যকারণ-সম্পর্ক কাজ করে না।

কাম-ক্রোধ এই জগৎটাকে চালাচ্ছে। যিনি কাম, ক্রোধ জয় করে জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেলেন, তিনি আর এই জগতের থাকছেন না। আমাদের দৃষ্টিতে মনে হবে তিনি আর এই জগতের নন, কারণ তিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি কাম, ক্রোধ জয় করেছেন। কিন্তু তিনি এখনও অন্য জগতের হয়ে যাননি, কারণ এখনও তাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়নি। ঈশ্বর দর্শন তাঁর কৃপাতেই হবে, তাঁর কৃপা কখন হবে, কিভাবে হবে, কেউ জানে না। তার মানে, ঠাকুর বলছেন, কাম, ক্রোধেরও দরকার আছে। কেন দরকার? কারণ এটাই মানুষকে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সেখান থেকে পরে ঠাকুর বলছেন, **“আবার অন্যদিকে দেখ কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি-লীলা চলছে”**।

ঠাকুর কত সুন্দর ভাবে একটা একটা করে সব কিছুকে পর পর এনে গুছিয়ে জিনিসটাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ঠাকুর তাঁর মনের ভাবটাকেই ধরলেন, ধরার পর সেটাকে টেনে এনে দেখিয়ে দিচ্ছেন – ধর্মের দিক থেকে তোমার প্রশ্নের আদৌ কোন সারবত্তা নেই। যে কাম, ক্রোধ পাপকে সৃষ্টি করছে, যে পাপের তুমি নিন্দা করছ, যে পাপকে তোমার মনে হচ্ছে ভুল, সেই পাপের মূলে রয়েছে এই কাম আর ক্রোধ, গীতাও পাপকে এই দুটো শব্দের মধ্যে নিয়ে আসছেন। এই কাম আর ক্রোধ একদিকে সৃষ্টি চালায়, অন্য দিকে যাঁরা এই দুটোকে জয় করে নেন, তাঁদের মুক্তির দিকে নিয়ে যান। শঙ্করাচার্য যখন বলছেন, প্রবৃত্তলক্ষণধর্ম নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম, তখন তিনিও এই কথাই বলছেন, ধর্মের দুটো কাজ – সংসার আর এই সংসার থেকে মুক্তি – অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। অভ্যুদয় মানে সাংসারিক উত্থান আর নিঃশ্রেয়স মানে মুক্তি। ধর্ম এই দুটো কাজ করে – অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। কাম জিনিসটা অভ্যুদয়ের দিকে নিয়ে যায়, এই কামকে যখন জয় করে তখন মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। সংসারে যদি কাম নাই থাকে, তাহলে দুটোই হারিয়ে যাবে – না হবে অভ্যুদয়, না হবে নিঃশ্রেয়স। ধর্মটা দাঁড়িয়েই আছে এই কামের উপর। তাহলে আপনার পরের প্রশ্ন হবে, ভগবান সৃষ্টি কেন করলেন? সেটা আলাদা জিনিস। এখানে প্রশ্ন এসেছে, পাপ কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চারটে কথা হতে হতে ঠাকুর কোথায় নিয়ে চলে এলেন। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি ঠাকুরের কথা কতটা বুঝলেন, কি বুঝলেন না, ভগবান জানেন। ঠাকুর এবার একেবারে খুব সাধারণ স্তরে নেমে এসে বলছেন।

“দুষ্ট লোকেরও দরকার আছে। একটি তালুকে প্রজারা বড়ই দুর্দান্ত হয়েছিল। তখন গোলক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার নামে প্রজারা কাঁপতে লাগল – এত কঠোর শাসন। সবই দরকার। সীতা বললেন, রাম! অযোধ্যায় সব অট্টালিকা হত তো বেশ হত, অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা, পুরনো।

রাম বললেন, সীতা! সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কী করবে? (সকলের হাস্য) **ঈশ্বর সবরকম করেছেন – ভাল গাছ, বিষ গাছ, আবার আগাছাও করেছেন। জানোয়ারদের ভিতর ভাল-মন্দ সব আছে – বাঘ, সিংহ, সাপ সব আছে”।**

ঠাকুরের সময় গোলক চৌধুরী বলে কেউ হয়ত ছিল। জমিদারদের লাঠিয়াল থাকত, প্রজারা কোথাও বিরুদ্ধাচারণ করলে জমিদার লেঠেলদের সেখানে পাঠিয়ে দিত, এরা গিয়ে সবাইকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিত। ইংরেজরাও পরে এই ধরণের প্রচুর মারধোর করে সবাইকে বশে রাখত। এখনও করে, অনেক সময় ডিএম, এসপিরা কোন জায়গায় বদমাইশি হলে মস্তানদের পাঠিয়ে দেয়, এরা গিয়ে এমন মারতে শুরু করে যে, সবাই সোজা হয়ে যায়।

ঠাকুরের এটা হল realistic approach, এগুলো নিজের মত আছে। এত যদি বিচার করতে যাও, কোন উত্তর খুঁজে পাবে না, সংসার এই রকমই। থিয়োরেটিক্যালি যদি নামেন, এটা কেন, সেটা কেন, কোন দিন উত্তর পাওয়া যাবে না। পাপ কি, পাপ কেন, পূণ্য কি, পূণ্য কেন; এগুলো একটু নিজে থেকে বুঝে নিতে হয়। ঠাকুর পরে বলবেন, গরুর দুধ আগুনে একটু আউটে নিতে হয়। ভগবান বুদ্ধও ঠিক এভাবেই উত্তর দিতেন। যখনই ওনাকে প্রশ্ন করা হত, উনি বলতেন, তোমার জেনে কি হবে? এগুলোকে বলে technicalities of religion, বেশির ভাগ মানুষ ধর্মের নামে technicalities of religionএ নেমে যায় – সৃষ্টি কেন হল, সৃষ্টি কবে হল ইত্যাদি। একটু জানার দরকার অবশ্যই আছে, একটু না জানলে মনের খেদ মিটবে না, একটু না জানলে মনে হবে সবটাই অযৌক্তিক। একটু জানা হয়ে গেল, এবার ওটাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে চলে যেতে হয়।

মূল বক্তব্য জগৎ এই রকমই, ভাল-মন্দ সব কিছু এর মধ্যেই রয়েছে। কেন আছে, এর যে ব্যাখাটা তোমার পছন্দ সেটা তুমি নিয়ে নাও। এনারা সেইজন্য চার-পাঁচ রকমের উপমা দিচ্ছেন। তোমার মনের গঠণ যেমন, সেই অনুযায়ী তোমার যেটা খাপ খায়, সেটাকে নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও। যদি না হয়, তাহলে নিজের মত তুমি একটা উপমা বানিয়ে নাও। ঈশ্বরকে নিয়ে যখন কোন ব্যাখ্যা বা উপমা দেওয়া হয়, জানবেন, যে কোন ব্যাখ্যা, যে কোন উপমা যতটা ঠিক, ততটাই ভুল। কারণ যেটা উপমা দেওয়া হচ্ছে, আর যেটা বাস্তবিক, দুটোর মধ্যে কোন মিল নেই। সেইজন্য পাপ কেন, পূণ্য কি, এর যে ব্যাখ্যাটা আপনার ভাল লাগে, সেই ব্যাখ্যাটাই নিয়ে নিন।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যেটা, জানবেন এটা এলেমেলো কিছু নয়, এটা গেল এক নম্বর। দু নম্বর হল, আপনি কি চাইছেন? যদি সংসারে অভ্যুদয় পেতে চান, যে কর্মগুলির পিছনে কাম ক্রোধ লাগিয়ে দিলে কর্ম জোরালো হবে, আপনি সেভাবে কর্ম করুন, অভ্যুদয় হবে। যদি আপনি মুক্তি চান, তাহলে কাম, ক্রোধকে জয় করে নিন। সেইজন্য স্বামীজী বার বার বলছেন, আর রামকৃষ্ণ মিশনে এই ভাবটা খুব জোরাল – আপনি কি কাজ করছেন সেট গুরুত্বপূর্ণ না, কি ভাবে করছেন, সেটারই গুরুত্ব সব থেকে বেশী। কি ভাবে করছেন, এর সব সময় অর্থ হয়, ওই কাজ করার মধ্যে কাম, ক্রোধ লেগে আছে কিনা। এরপর যে টপিকটা আসছে, এই টপিকটা কথামৃতে ঘুরে ঘুরে আসবে।

প্রতিবেশী – মহাশয়, সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?

পাপকে নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সেটাই এখনও চলছে।

খুব প্রচলিত প্রশ্ন। আচার্য শঙ্করকে যদি জিজ্ঞেস করা হত, উনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন – কখনই না। সংসার বলতে এখানে দুটো জিনিস হয়। একটা হল বাড়ির লোকের সঙ্গে আছি। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, সন্ন্যাসী না হলে কি ঈশ্বর দর্শন হবে না? সেটা হতে পারে। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন গৃহী ভক্তকে জানি, যাঁরা সন্ন্যাসী হননি, কিন্তু পুরো আলাদা ভাবে জীবন চালাচ্ছেন। কিন্তু

তাই যদি হতে হয়, তাহলে কিন্তু সন্ন্যাসীদের মতই জীবনটা হতে হবে। মানে রাজা জনকের মত, আমি সংসারও করছি, আবার ধর্মও করছি, এভাবে হয় না। সংসারে থাকলে অবশ্যই হবে, যদি সন্ন্যাসীর মত থাকা হয়। সংসারে আছে, কাজকর্ম করছি, কিন্তু কোনটাতেই নেই, সব কিছুতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত। কিন্তু খুব কঠিন, সম্ভব হয়ে ওঠে না। সংসারে যদি আপনি কিছু নাও করেন, তাতেও আসক্ত অনেক বেশী হবে। সন্ন্যাসীরা সংসারীদের থেকে অনেক বেশী কাজ করেন, তাতেও তাঁদের আসক্তি থাকে না। এই ব্যাপারে ঠাকুর কি বলছেন?

“**শ্রীরামকৃষ্ণ – অবশ্য পাওয়া যায়। তবে যা বললুম, সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়**”।

সাধুসঙ্গের উপর আগে বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সাধুসঙ্গে অনেক লাভ। এর আগের আলোচনায় সাধুসঙ্গে কি কি লাভ হয়, ঠাকুর পর পর বলেছেন। সবচেয়ে বড় লাভ হল, ওই চেতনাটা জেগে থাকে। সাধু যে কোন বেশেই থাকুন, দাড়িওয়ালা, জটাধারী, মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়াধারী যাই হয়ে থাকুন, তাঁর মনে কি আছে আমাদের জানার উপায় নেই। কথা দিয়ে কত লোককেই তো বোকা বানানো যায়। কিন্তু বাইরের বেশ দেখে প্রথমেই বোঝা যায় যে, ইনি একজন সাধু। তারপর যদি দেখেন কথার মধ্যে সাধুত্বের ভাব নেই, বা আপনার মনের ভাবের সাথে মিলছে না, আপনি সরে গেলেন। ঠাকুর বলছেন, নকল আতাকে দেখলে আসল আতার কথা মনে পড়ে। ঠিক তেমনি, সাধু, সন্ন্যাসী যে বেশের জন্য তিনি সাধু বা সন্ন্যাসী, সেই বেশ দেখলে প্রথমে সাধু এবং দ্বিতীয় ধাপে ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে। তার সাথে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে এই সাংসারিকতা থেকে বেরোতে হবে। পরে পরে ঠাকুর বলবেন, কিভাবে মানুষ একটু একটু করে এগোতে থাকে। ঈশ্বরই সব ব্যবস্থা করে দেন, এমন একটা কিছু তিনি করে দিলেন, যাতে সংসার থেকে আপনি ছাড়া পেয়ে গেলেন। সংসারে যে দায়ীত্বগুলো ছিল, সেগুলো থেকে হয় দায়মুক্ত হয়ে গেলেন, নয়তো অন্য কেউ দায়ীত্ব নিয়ে নিল।

ঠাকুর বলছেন, “**তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনে ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়**”।

যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়। মন নানান ভাব নিয়ে থাকে, কিন্তু মন যখন একটা ভাব নিয়ে থাকে, একমাত্র ঈশ্বরকে নিয়ে থাকে, এটা হল মনের ময়লাগুলো ধুয়ে যাওয়া। যখনই মনের ময়লা শব্দ আসে, তখন আপনি ভাববেন, এখানে ভাল মানুষ হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এর আগে প্রতিবেশী প্রশ্ন করলেন, পাপবুদ্ধি কেন হয়, পাপে আমাদের দায়ীত্ব নেই ইত্যাদি, তখন স্বাভাবিক ভাবে আমাদের মনে হয় মনে ময়লা হওয়াটাই পাপ। কিন্তু তা না, শেষ অবস্থায় পূণ্যটাও ময়লা, সেটাও বন্ধন, ভালটাও বন্ধন।

গীতায় ভগবান যখন অর্জুনকে বলছেন, *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ,* তুমি সব কিছু ছেড়ে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য,* সমস্ত ধর্মকে ত্যাগ করে আমার কাছে চলে এসো। চলে এলে ভগবান কি করবেন বলছেন? তোমার সমস্ত পাপ আমি নিয়ে নেব। ছাড়তে বলছেন ধর্ম, বদলে তিনি আমার পাপ নিয়ে নেবেন? কি করে সম্ভব? ভগবান তো বলছেন না, সব পাপবুদ্ধি ছাড়, আমি তোমাকে নিয়ে নেব। বলছেন, সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ কর, আমি তোমার সমস্ত পাপ নিয়ে নেব। কারণ, আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে ধর্মটাও বন্ধন, ধর্মটাও পাপ। ঈশ্বর ছাড়া মনে যদি কোন চিন্তা থাকে, সেটাই বন্ধন, সেটাই পাপ। আমি ভাল হব, এই ভাবনাটাও পাপ। আমি পূণ্য করতে চাই, এটাও পাপ। প্রথমের দিকে ঠাকুর বার বার বলছেন, জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটাকে বার করে পরে দুটোকেই ফেলে দিতে হয়।

ধর্ম-অধর্মের পারে যাওয়ার কথাও ঠাকুর বলছেন। প্রথমে অধর্মকে বার করতে হয়, কারণ অধর্ম কাঁটাটা আমাদের আরও গভীরে গিয়ে বসে আছে, আর খুব বিপজ্জনক। ধর্ম কাঁটাটাও বিপজ্জনক, কিন্তু অতটা না। কিন্তু ছুঁড়ে ফেলাটা অত সহজ না। যখন মনের ময়লার কথা বলছেন, তখন বুঝতে

হবে, সবটাই ময়লা, আমি ভাল হব, এটাও ওই অর্থে ময়লা। আপনি কেন ভাল হতে চাইছেন? যাতে লোকেরা আপনাকে ভাল বলে, তার মানে আপনার সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা আছে, মানযশের ইচ্ছা আছে। কামিনী-কাঞ্চনও যা মানযশও তাই, দুটো মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কামিনী-কাঞ্চন যদি খারাপ হয়, তাহলে মানযশ কিসের ভাল? আর মানযশ যদি খারাপ হয়, তাহলে মানযশের জন্য আমি ভাল হব, সেটাও ময়লা। আপনি বলবেন, আমি ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ভাল হতে চাইছি। ঈশ্বরকে পাওয়ার সাথে ভাল-মন্দের কোন সম্পর্ক নেই, কথাটা হল ঈশ্বরকে ভালবাসা।

বাচ্চা ছেলে জানেও না ভাল কি, মন্দ কি, সে মা ছাড়া কিছু জানে না। আমি ভাল হব, তবে আমি মাকে ভালবাসব, এ-রকম কথা আমরা কখন কোন বাচ্চার মুখে শুনিনি। আমি ভাল হই, মন্দ হই, আমি দুষ্টু হই আর যাই হই, মাকে আমি ভালবাসি। তুমি আমাকে ভালবাস কি ভালবাস না, সে তোমার ব্যাপার। মা আমাকে ভালবাসবেন কি বাসবেন না, ঠাকুর আমাকে ভালবাসবেন কি বাসবেন না, সেটা তাঁর মাথা ব্যাথা, আমার নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি, ব্যস্। আমার নামযশ থাকুক, নাই থাকুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি তোমাকে ভালবাসি। সিনেমা বা কাহিনীতে আমরা দেখি, এক বিরাট বাড়ির ছেলে একটা সাধারণ মেয়েকে প্রেম নিবেদন করেছে, বা এর উল্টোটা, সাধারণ বাড়ির ছেলে এক বড়লোকের বাড়ির মেয়ের সাথে প্রেম করেছে। এখন মেয়ের বাড়ির লোকেরা ছেলেটিকে টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের মেয়ের থেকে হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে। ছেলেটি বলছে, দেখুন, আমি আপনাদের মেয়েকে ভালবাসি, আপনি টাকা কেন দেখাচ্ছেন? এই ধরণের ঘটনা নিয়ে সুন্দর সুন্দর প্রচুর সিনেমা, কাহিনী আছে।

আপনি ভাল, না আপনি মন্দ, এগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, সবচেয়ে গুরুত্ব হল ভক্তি। সমস্যা হল, মন্দ বলতে আমরা যেটা বুঝি আসলে সেটা হল exclusiveness; তার মানে আমি, আমি যেখানে, অর্থাৎ এই আমিত্ব যার আছে, সে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে না। যাঁরা inclusive, আরও দশজনকে আপন মনে করে চলে, যাঁদের আমিত্বটা দশজনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, তাঁদের পক্ষে ঈশ্বরকে ভালবাসা সহজ, তাঁদের পক্ষে ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ করা সহজ। যারা exclusive, তার সব কিছুকে নিজের মধ্যে আঁকড়ে ধরে ওর মধ্যে ঘ্যাঁট হয়ে বসে আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের দিকে যাওয়া সম্ভব না। যখন পুরো জিনিসগুলিকে মিলিয়ে দেখা হবে, তখন দেখা যাবে এবং বোঝাও যায় যে, আসলে আমরা যে ভাল হতে চাইছি যাতে লোকে আমাকে ভাল বলে।

আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, উনি খুব মজা করে বলতেন, মন্দিরে বসে জপ করছে, যেমনি একশ আট বার জপ হয়ে গেল, জপের মালাটা উপর থেকে কৌটার মধ্যে ফেলবে, একটা বুম্ করে আওয়াজ হল, যাতে বাকিরা বুঝতে পারে, আমি একশ আট বার জপ করলাম। মানুষ যে তিলক কাটে, সেটা ভক্তিতেও কাটে, তিলক কাটা বিধি আছে এই বোধেও কাটে, আবার অনেক সময় দেখানোর জন্যও কাটে।

এর আগে যে পাপ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, ঈশ্বরের পথ থেকে সরে আসাটাই পাপ। যদি ঈশ্বরকে সরিয়ে পূণ্য করা হয়, ঈশ্বরকে ছেড়ে ধর্ম করা হয়, সেটাও পাপ। আপনি বলবেন, ঈশ্বরকে মনে রেখে যদি ধর্ম করি? কি করে হবে, আমি পূণ্য করব আবার ঈশ্বরকেও রাখব, সে কি কখন হয়? যেমন, আমি পাপ করব আবার ঈশ্বরকেও রাখবা, হয় না; ঠিক তেমনি আমি পূণ্য করব আবার ঈশ্বরকেও রাখবা, এটাও হয় না। ঠাকুর বলছেন, তীর্থে গেল, সেখানে কাঙালী বিদায় করতে করতেই সব চলে গেল, ঈশ্বর দর্শন আর করা হল না। আপনি যে তীর্থে গেছেন, সেখানে আপনি তো বিগ্রহ দর্শন করতেই গেছেন, কাঙালীদের খাওয়াতে তো জাননি। কাঙালীদের খাওয়ানোটা তো ভাল কাজ, কিন্তু এই ভাল কাজটাই বিগ্রহ দর্শনে বিঘ্ন হয়ে গেল। এই জিনিসটাকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। খুব অল্প বয়স থেকেই আমি কথামৃত পড়ছি, তখন এই জিনিসগুলিতে এসে আমি কিছুতেই

বুঝতে পারতাম না, ঠাকুর কেন ধর্ম-অধর্ম আর পাপ-পূণ্যকে একই শ্রেনীতে ফেলে দিচ্ছেন। সত্যিই এটা বুঝতে সময় লাগে। ধৈর্য ধরে শাস্ত্রের কথা দিনের পর দিন শুনতে শুনতে একটা সময়ে গিয়ে জিনিসগুলি পরিষ্কার হতে শুরু হয়।

যোগের দৃষ্টিতে খুব সহজে বোঝা যায়। মনে ঈশ্বরবৃত্তি বাদে যে কোন বৃত্তি, এটাই পাপ; ভাল চিন্তাটাও পাপ, মন্দ চিন্তাটাও পাপ। ইমোশানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, ঈশ্বর বাদে যে কোন জিনিস হল ফালতু। যদি কেউ কাঙালী ভোজন করাতে চান, যিনি ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, তিনি দেখবেন, যাদেরকে তিনি সেবা করছেন, তারা সবাই ঈশ্বরেরই রূপ। ঈশ্বরেরই যদি রূপ হন, তাহলে সেখানে কোন পূণ্য হবে না। পূণ্য তখনই হয়, যখন মানুষ রূপে তার সেবা করছেন। যখনই মানুষ রূপে দেখছেন, যখন মনে করছেন, আপনি পূণ্যকর্ম করছেন, ভাল কাজ করছেন, উচ্চ অবস্থায় এটা পাপ। কারণ এটা আপনাকে ঈশ্বর থেকে সরিয়ে রেখেছে। কেউ যদি মনে করে, আমি জপ করছি, আমি ধ্যান করছি, আর মনে করছে এই করে আমি ঈশ্বরের কাছে যাব; না, সেটাও পাপ। *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য*, জপধ্যানটাও ত্যাগ করতে হবে, *মামেকং শরণং ব্রজ* – মা ছাড়া কিছু জানা যাবে না, কৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানা যাবে না, ঠাকুর ছাড়া আর কিছু জানা যাবে না। ঠাকুর বাদে, কৃষ্ণ বাধে বা যার যিনি ইষ্ট, ইষ্ট বাদে যা কিছু করা হচ্ছে সবটাই পাপ। যেটাকে তুমি ধর্ম মনে করছ, সেটাও পাপ; যেটাকে তুমি অধর্ম মনে করছ, সেটাও পাপ। সব ছেড়ে একমাত্র ইষ্টে সমর্পিত হও। ঠাকুর এটাই বলছেন – কাঁদলে মনের ময়লা ধুয়ে যায়। প্রথমে অহংকার, আমি, আমি, এই ভাবটা যায়। তারপর লোকেরা যে বলবে, আমি ভাল, লোকে আমাকে মানুক, জানুক; এই ভাবটাও চলে যায়। ঠাকুর আবার উদাহরণ নিয়ে আসছেন।

“মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার ছুঁচ – ঈশ্বর চুম্বক পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে ছুঁচের মাটি ধুয়ে যায়; ছুঁচের মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি”।

বিষয়বুদ্ধি, পাপবুদ্ধি, কাম, ক্রোধ, এই জিনিসগুলি খুব জোরালো পাপ, এই জিনিসগুলি একেবারেই এগোতে দেবে না। যখন জপধ্যান করছেন, ধর্মকর্ম করছেন, তখন নিজেকে দেখে আপনার মনে হবে কত নিষ্ঠা, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জাগছে, যদিও সেটা যথেষ্ট না। কিন্তু যেখানে আমি লুটেপুটে খাই এই ভাব থাকে, এই ভাব তো আপনাকে টেনে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে।

“মাটি ধুয়ে গেলেই ছুঁচকে চুম্বক পাথরে টেনে লবে – অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হতে তবে তাঁকে লাভ হয়”।

প্রথমে অধর্ম জিনিসগুলি, যেখানে আপনি exclusive, যেগুলো কাম, ক্রোধ প্রেরিত; রাগ-দ্বেষ প্রেরিত, এই জিনিসগুলো খসে যায়। তারপরে ভাল জিনিসগুলিও খসে পড়ে যায়।

“জ্বর হয়েছে, দেহেতে রস অনেক হয়েছে তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে। সংসারে হবে না কেন? ওই সাধুসঙ্গ, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; একটু বেড়া না দিলে ফুটপাথের চারাগাছ, ছাগল গরুতে খেয়ে ফেল”।

প্রতিবেশী আবার জিজ্ঞেস করছেন, **“যারা সংসারে আছে, তাহলে তাদেরও হবে”**?

ওই একই প্রশ্ন করছেন। আমরা যখন ইয়ং ব্রহ্মচারী ছিলাম, আমরা মাঝে মাঝেই বড় সাধুদের গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, ‘মহারাজ আমাদের কিছু হবে তো? আমি কি এগোচ্ছি’? সবারই নিজের ব্যাপারে জানার খুব ইচ্ছে হয়। যাঁরা খুব অভিজ্ঞ সাধু, তাঁরা বলতেন, ‘হবে না কেন, সবই হবে, ঠাকুরকে ধরে রাখ’। যাঁরা একটু অন্য ধরণের সাধু, তাঁরা বলতেন, ‘জানো ভাই, সাধু জীবনের কথা কিছু বলা যায় না, কখন কে পড়ে যাবে, কবে সব ভক্তি, শ্রদ্ধা উড়ে যাবে ঠিক নেই’। শুনে আমাদের

মনটা খারাপ হয়ে যেত। আমরাও বুঝে যেতাম আর এনাদের জিজ্ঞেস করা যাবে না। কিন্তু যাঁরা বলতেন, কেন হবে না, পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ কত এগিয়ে এসেছ। এই কথার সাথে সব সময় এই কথাটা অবশ্যই যোগ করবেন – ঠাকুরকে ধরে রাখ। ঠাকুরও এটাই প্রতিবেশীকে বলছেন, হবে না কেন। কিন্তু তার সাথে যোগ করছেন, নির্জন বাস, সাধুসঙ্গ, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা।

সংসারে হবে কিনা প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর সব সময় বলবেন, হবে না কেন, আর প্রত্যেক বার এই শর্তগুলি দেবেনই দেবেন, একবারও বাদ দিচ্ছেন না। যেমনি আপনি নির্জন বাস করতে যাবেন, বাড়ির লোক এসে বলবে, 'বিয়ে করতে গেলে কেন তাহলে? নির্জন বাস করার ইচ্ছে যখন তাহলে বিয়ে করলে কেন আগে বল'। একজন ভক্তকে জানতাম, খুব ভাল ভক্ত, বড় অফিসার ছিলেন। ওনার ঠাকুরের প্রতি খুব ভক্তি, বড় বাড়ির লোক, বিয়ে করেছেন। শেষে স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে বাচ্চাকে নিয়ে চলেই গেল। পরে তিনি বড় সাধু হয়েছেন। ঠাকুরও ঠিক একই বর্ণনা কথামৃতে অন্য জায়গায় দিয়েছেন – গিন্নি কান্নাকাটি করে, কি সারাদিন ঠাকুর-ঠুকুর নিয়ে আছে, সারাক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকে।

সংসারে আপনি নির্জন বাস করতে পারবেন না, আপনি চাইলেও করতে দেবে না। তবে খুব করে প্রার্থনা করলে নির্জন বাসের সুযোগ সুবিধা এসে যায়; আর তা নাহলে একটা স্তরে এসে মন ওদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এর জন্য কোন অপরাধবোধ থাকে না। আসল সমস্যা তো নিজের অপরাধবোধকে নিয়ে। আপনি কোথাও স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মনটাকে জুড়ে দিয়েছেন। মনটাকে যখন জুড়ে দিয়েছেন, সেটার জন্য অপরাধবোধ আসে, প্রার্থনা করলে এটা চলে যায়।

ঠাকুর প্রতিবেশীর প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, **"সকলেরই মুক্তি হবে"**।

সকলের মুক্তি হবেটা কি, সকলে তো মুক্ত। বেদান্তের দৃষ্টিতে কেউ বন্ধনে নেই। বন্ধন যদি সত্য হত, তবে মুক্তি পেতে সমস্যা হত। বেদান্তের দৃষ্টিতে সবাই মুক্ত, বন্ধনটা মায়া। এটা একটা আলাদা বিষয়বস্তু, আমরা অন্যান্য ক্লাশে এর উপর প্রচুর আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এনারা যুক্তি দিয়ে দেখান যে, বন্ধনটা সত্য নয়, সত্য হতেই পারে না। আপনি বলতে পারেন, কেন, 'এর উল্টোটাও তো হতে পারে, জগৎটা সত্য ঈশ্বর মিথ্যা? ধর্মগ্রন্থ বলছেন, ঈশ্বর সত্য জগৎ মিথ্যা; কিন্তু উল্টোটি যদি হয়, জগৎটাই সত্য ঈশ্বর মিথ্যা'? না, ওখানে বিস্তারিতে ভাবে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ-জিনিস কখন হতেই পারে না। এটা কোন বিশ্বাসের উপর চলে না, পুরোপুরি যুক্তির উপর চলে।

প্রথম কথা হল, সবারই মুক্তি হবে। কেন? কারণ বেদান্ত মতে সবাই মুক্ত। ভক্তিপথেও যদি যাওয়া হয়, হিন্দুদের যে ধর্মগ্রন্থ, সেখানেও সবারই মুক্তির কথা বলা হয়, তবে ভক্তি মতে মুক্তি অনেক রকমের হতে পারে, সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে এই মুক্তির কথা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ অনুসারেই বলা হচ্ছে। অন্যান্য ধর্মে সবার মুক্তি হয় না। অন্যান্য ধর্মে তুমি যদি পাপ করে থাক, অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ পালন করোনি, তোমার জন্য চিরদিনের তরে নরকবাস নিশ্চিত। আশ্চর্যের ব্যাপার, যেখান থেকে এদের এই আইডিয়াগুলি এসেছে, সেই জুহুদিদের ধর্মে এই আইডিয়াই নেই। ওদের হল, তুমি যতই গোলমাল কর মৃত্যুর পর এক বছর তোমাকে নরকে রাখবে। এক বছর পর তুমি শুদ্ধ হয়ে আবার ফেরত চলে আসবে।

কিন্তু খ্রীশ্চানদের শান্তি নেই, আদম আর ঈভ কি একটা পাপ করেছে, সেই পাপের জন্য তুমি যদি নিজেকে পুরোপুরি শুদ্ধ না কর, তোমার অনন্তকালের জন্য নরকবাস নিশ্চিত। হিন্দুদের এসব কিছু নেই, হিন্দু ধর্মে সবারই মুক্তি হবে, কেউ আগে কেউ পরে। কারণ ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করছেন, প্রলয় যখন হবে সব ঈশ্বরেই লয় হয়ে যাবে। ঈশ্বরে লয় হওয়া মানে, এখন আমি যে মনে করছি, ঈশ্বর আলাদা আমি আলাদা, এই ভাবটা চলে যাবে।

ঠাকুর বলছেন সকলেরই মুক্তি হবে, **“তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাঁকাপথে গেলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে”**।

এর আগে প্রথমে ঠাকুরকে যে পাপ নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এবার দেখুন, ঠাকুর আলোচনাটা ওই জায়গাতে নিয়ে চলে এলেন। আগে বলা হল, ঈশ্বরের প্রতি মন না যাওয়া, এটাই পাপ। ঠাকুর এত কিছু বলে বলে আবার ওই জায়গাতে নিয়ে এলেন।

গুরু কখন ইউনিভার্সাল হন না, আমার গুরু আপনার গুরু এক নন। সেইজন্য আমার প্রতি গুরুর যে উপদেশ আর আপনার প্রতি আপনার গুরুর যে উপদেশ এক হবে না। রামকৃষ্ণ মিশনে আমরা সবাই মনে করি, ঠাকুরই আমাদের সবার গুরু, তিনি তাই ‘গুরু মহারাজ’। ঠাকুর যেমন যেমন ভাবে, যা যা উপদেশ দিয়েছেন, আমাদের পূজনীয় অধ্যক্ষ, সহাধ্যক্ষ মহারাজরা যাঁরা দীক্ষাদি দেন, দীক্ষা দেওয়ার সময় সেই অনুসানে ওনারা শিষ্যদের কিছু নির্দেশাবলী দিয়ে দেন। সেই নির্দেশ পালন, এটাই আমাদের কাছে গুরুর আদেশ। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের বাইরে অন্য যে সম্প্রদায় আছে, তাদের আবার আলাদা আলাদা নির্দেশ আছে। একজন বলছে, মাছ খাওয়া যেতে পারে, আরেকজন বলছেন, মাছ খাওয়া যাবে না। ঠাকুরের বক্তব্য হল, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গুরু যে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন, সেগুলো যদি পালন করা না হয়, তাহলে সে রাস্থা ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেল। রাস্থা থেকে সরে গেলে ফিরে আসতে সময় লাগে, কষ্ট বেশি হয়। কেন? ঠাকুর বলছেন –

“মুক্তি অনেক দেরিতে হয়। হয়তো এ-জন্মেও হল না, আবার হয়তো অনেক জন্মের পর হল। জনকাদি সংসারেও কর্ম করেছিলেন। ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করতেন। নৃত্যকী যেমন মাথায় বাসন করে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে”।

গুরুর উপদেশ অনুসারে না চললে, সোজা রাস্থা ছেড়ে দিয়ে বাঁকাপথে চলে গেল। ফলে যে সময় মুক্তি হওয়ার কথা ছিল, সেই সময় না হয়ে অনেক দেরী হয়ে গেল। আপনি ট্রেনে করে হাওড়া থেকে দিল্লী যাচ্ছেন, হঠাৎ আপনার ইচ্ছে হল, কয়েকদিন কাশীবাস করে দিল্লী যাবেন। ভাল, কাশীতে বাস করা ভাল, কিন্তু মাঝখান থেকে দিল্লী যাওয়াটা আপনার দেরী হয়ে গেল। হয়ত মনে করলেন, মাঝখানে কোথাও নেমে কয়েকদিন মৌজ স্ফুর্তি করে নিই, তাতেও যেমন দিল্লী যাওয়া পিছিয়ে যাবে, তেমনি ধর্ম কাজের জন্য যদি কাশীতে বা বৃন্দাবনে নামেন, তাতেও দিল্লী যাওয়াটা পিছিয়ে যাবে। সেইজন্য গুরু যেমনটি বলে দিয়েছেন তার বাইরে কোন মতেই যাওয়া যাবে না। কারণ গুরুই জানেন, কোনটা যুগোপযুগি, কোন সময়ের জন্য কোনটা ঠিক, আর আপনার জন্য কোনটা ঠিক।

বেশীর ভাগ গুরুরা, যাঁদের শিষ্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ আছে, তাঁরা পরিষ্কার শিষ্যদের বলে দেন, তোমরা এটি করবে, এটি করবে না। তবে একটা স্তরের পর নিজের মনই গুরু হয়ে যায়। যার জন্য অনেক সময় resolutions লেখা হয় – আমি এই এই জিনিস করব না। কিন্তু ধর্মপথে চলার জন্য এভাবে বিচার করে কিছু জিনিস করে নিল, ঠিক আছে; কিন্তু এরপরে ওর পারে কিন্তু যেতে নেই। ওর পারে গেলে কি পাপ হবে, নরকে যাবে? কখনই না, কোন মতেই না। লক্ষ্মণরেখাকে যদি পার করেন, ফিরে আসতে সময় লাগবে।

রাজস্থানের দিকে জলের প্রচণ্ড কষ্ট। সেইজন্য ওখানকার মেয়েরা যখন জল আনতে যায়, একবারে অনেকটা জল আনার জন্য একসাথে সাত আটটা জলের ঘড়াতে জল ভরে মাথাতে একটা একটা করে ঘড়াকে সাজিয়ে দিব্যি হেঁটে চলে আসে। জল ভরা অতগুলো ঘড়া মাথায় নিয়ে চলতে চলতে মেয়েরা এক অপরের সাথে কথাও বলছে, হাসি-গল্প সবই করছে, কিন্তু জলের ঘড়া মাথার

উপর স্থির। ঠিক তেমনি, সংসারে যা কিছু কাজ আছে, সব কাজ অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু ব্যালেন্সটা যেন ঠিক থাকে। ব্যালেন্স ঠিক থাকা মানে, ওর মধ্যে যেন কাম, ক্রোধাদি না ঢোকে, রাগ-দ্বেষ যেন না ঢোকে। আপনি যে কোন কাজ করুন না, কোন অসুবিধা নেই। কাজ করে কি ওতে রস পাচ্ছেন? বুঝে নিন এবার আপনি সমূহ বিপদে পড়বেন। কাজ করে কি বিরক্ত হচ্ছেন? যদি বিরক্ত হন, আপনি কিন্তু নিশ্চিত মরবেন।

মহাভারতে ব্যাধের কাহিনী আছে। এক ব্রাহ্মণের যোগ সাধনা করে ক্ষমতা হয়েছে, তার অহঙ্কার হয়েছে। শিক্ষা লাভের জন্য ব্রাহ্মণকে এক ব্যাধের কাছে পাঠানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ গিয়ে দেখছে, ব্যাধ মাংস কাটছে। ব্রাহ্মণ ভাবছে, হে ভগবান, এর কাছ থেকে আমাকে শিক্ষা নিতে হবে? ব্যাধের সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথাবার্তা হচ্ছে, ব্রাহ্মণ দেখছেন ব্যাধ সব কিছুতে কেমন নির্বিকার – কি করব আমি, এই বংশে আমার জন্ম হয়েছে, আমাকে এই কাজই করতে হবে; আমি মাংস খাইও না, পশু শিকারে আমার মনও নেই, আমি আমার বংশের জাতকর্ম করছি।

আমি এক সময় এক বছর উত্তরকাশীতে ছিলাম। পাহাড়ী জায়গা, কষ্টের জায়গা। ওখানে ছোট্ট একটা বাজার আছে, পাহাড়ে যেমন হয়। বাজারের যত সব্জীওয়ালা সব মুসলমান। গরমের সময়, জুলাই আগস্ট মাস, বাজারে তখন প্রচুর পটল বিক্রি হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের কুঠিয়ার সাধুরা সেই বাজার থেকে পটল কেন, আরও অনেকে কেনে। একদিন সেই দোকনদার খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা এটাকে কিভাবে খায় বলুন তো'? 'কেন, ভাজা খায়, তরকারী রান্না করে খায়'। 'কিভাবে রান্না করে'? বলা হল, এভাবে রান্না করা হয়। নাকটা কেমন সিঁটকে জিজ্ঞেস করছে, 'খেতে ভাল'? 'আরে ভাই, তুমি বিক্রি করছ, তুমি জান না'? বলছে, 'না না, আমরা ব্যবসা করি, আমি কিনে এনে বিক্রি করি, আমরা নিজেরা কক্ষণ খাই না'। এমনিতেও পাহাড়ী লোকেরা পটল কখন ছোঁবেই না। ওরা জানেই না, পটল কি জিনিস। এই হল, নির্বিকার ভাবে কাজ করা। তাকে ঘর-সংসার চালাতে দুটো পয়সা উপার্জন করতে হবে। দশ টাকা কিলো কিনছে, বারো টাকায় বিক্রি করছে, ওই দুটো টাকা মুনাফা দিয়ে তার সংসার চলছে। এই যে পটলওয়ালার গল্প, ব্যাধের গল্প, বক্তব্য একই। আমাকে করতে হবে, আমি করছি; আমার উপর পরিবারের দায়ীত্ব আছে, আমাকে করতে হচ্ছে, ব্যস্। এর মধ্যে আমার কোন আসক্তি নেই, কোন বিরক্তিও নেই। প্রতিবেশী আবার প্রশ্ন করছেন।

প্রতিবেশী – গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন করে পাব?

ঠাকুর ঘুরিয়ে বলছেন, **"যে-সে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু"**।

নিউটনের Laws of motionএর প্রথম যে সিদ্ধান্ত, তাতে বলছেন, একটা জিনিস যখন চলতে থাকে, তাকে আটকানোর জন্য একটা শক্তি দরকার। একটা জিনিস যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে চালানোর জন্য একটা শক্তি দরকার। গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, যে কোন জিনিস যেটা পিরিওডিক মোশানে আছে, ঘুরতেই থাকবে, যতক্ষণ না আরেকটা বিপরীত শক্তি লাগানো হয়। আমাদের জীবনটাও তাই। আপনি যদি একটা কুয়োর কল্পনা করেন, বিরাট কুয়ো ওর মধ্যে বিভিন্ন অরবিট করা আছে, যার মধ্যে অনেকগুলো জিনিস ঘুরছে। যেমন চাঁদ তার একটা নির্দিষ্ট কক্ষ পথ ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে। যে কোন একটা জিনিস যদি ওর ওই কক্ষ পথে ঘুরতে থাকে, ওখান থেকে ওটা বেরোবে না, যতক্ষণ না আপনি একটা শক্তি ওর উপরে না দিয়ে দেন। শক্তি দেওয়ার পরেও ওটা ঘুরতে থাকবে, কিন্তু এবার একটা নূতন অরবিটে ঘুরবে।

মডার্ন ফিজিক্সে, কোয়ান্টাম ফিজিক্সে ঠিক এটাই বলে, ইলেক্ট্রন আদি যে কোন জিনিস একটা এনার্জি লেভেল নিয়ে ওর মধ্যেই ঘুরতে থাকবে। যদি ধাক্কা মেরে অন্য লেভেলে পাঠাতে হয়, তার জন্য আলাদা একটা বিশেষ শক্তি দরকার। সমস্ত সৃষ্টি নিজের নিজের সীমারেখার মধ্যে ঘুরছে। কারুর দম নেই যে, এক অপরকে টেনে ওকে সেখান থেকে সরিয়ে দেবে। কোন আচার্যের দম নেই যে, কারুর অরবিট পাল্টাবে। বাইরে থেকে যখন একটা শক্তি আসে, তখনই তার অরবিট পাল্টাবে। ঈশ্বরই হলেন সেই শক্তি, যিনি মায়াধীশ, বাকি সমস্ত শক্তি মায়াধীন, মায়ার ভিতরে। সবাই সবার নিজের নিজের অরবিটে ঘুরছে, কেউ কারুর অরবিটকে পাল্টে দিতে পারে না। ভগবান যখন গুরুরূপে আসেন, তিনি তখন বাছাই করা কয়েকজনকে বেছে উপরে টেনে নেন।

ওই টানের জন্য এবার একটা অন্য জিনিস হবে। ঠাকুর বলছেন, কলমি শাকের দল, একটাকে যেমন টানলেন, ওর সঙ্গে বাকি কলমির লতাগুলো ওই টানে চলে এলো, আবার তাদের সাথে বাকি যারা আছে, তারাও ওই টানে উপরে চলে এলো। এইভাবে একটা বড় কলমির দল উপরে চলে এলো, একটা হায়ার ইভলিউশানে তারা চলে এলো। বাকি সৃষ্টির কি হবে? ওই প্রভাবে যতটুকু নামার নামবে। ধরুন, আমি ট্রেনে, বাসে কোথাও যাচ্ছি। পথে কারুর সাথে হয়ত একটু কথা হল, তাতে দুটো ভাল কথা হয়ত বললাম। সেই দুটো ভাল কথা শুনে তার ভাল লেগে গেল, সেখান থেকে সে একটু evolve করল, নাও করতে পারে। একটা general pulling হয়। কিন্তু massive pulling যেটা, যেখানে qualitative change হয়, সত্যিকারের বিবর্তন যেটা হয়, সেটা একমাত্র ঈশ্বর অবতীর্ণ হলেই হয়।

এগুলোকে নিয়ে অনেকে অনেক study করেছেন। যার জন্য দেখা যায় যখনই কোন অবতার আসেন সমাজে তখন কি কি পরিবর্তন হয়। এর উপর প্রচুর ভাল ভাল study আছে। ভগবান বুদ্ধ এলেন, যীশু এলেন, মহম্মদ এলেন, সমাজে কি কি পরিবর্তন হল? দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ে, সব কিছুর পরিবর্তন হয়। সাহিত্যে পরিবর্তন হয়, বিজ্ঞানে পরিবর্তন হয়, দর্শনে পরিবর্তন হয়, চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন হয়, সব কিছুতে পরিবর্তন আসে, সব কিছুই evolve করে। শুধু মানুষের শক্তিতে এই পরিবর্তন সম্ভব না, ঈশ্বরীয় শক্তি লাগে। ঠাকুর শেষে এবার পুরো জিনিসটাকে গুছিয়ে এনে খুব সুন্দর করে বলছেন, যেটা মাস্টারমহাশয়ের লেখাতে আমরা পাচ্ছি –

“**জ্ঞান কাকে বলে, আর আমি কে? ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা – এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা**”।

যখনই আমরা কর্তা, অকর্তা, আমি, তুমি মনে করছি, তখন আমরা মনে করি আমি এক আর ঠাকুর আর-এক। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; রামকৃষ্ণলোক বলে কোথায় একটা লোক আছে, সেখানে তিনি একটা সুপার থেকে সুপার কম্প্যুটার নিয়ে বসে আছেন। ওর মধ্যে সব ডাটা লোড করা আছে, আর তিনি ঠক্ ঠক্ করে কম্প্যুটার চালিয়ে যাচ্ছেন। আর তিনি ভগবান কিনা, তাই তাঁর অজস্র বাহু, অজস্র আঙুল। ওখানে আঙুল দিয়ে কম্প্যুটারে টিপলেন, এখানে আমি সমর্পণানন্দ ঘাড় নাড়লাম, আরেকটা টিপলেন, ঘাড় সোজা করলাম। এর থেকে বোকা বোকা কথা কিছু হতে পারে না। যে কোন জিনিস যদি কিছু করতে ইচ্ছা করে, তার জন্য তার চেতনা চাই। যে কোন ক্রিয়া করতে গেলে হয় blind force দিয়ে করবে, আর তা নাহলে conscious force দিয়ে করবে, খুব সাধারণ জিনিস।

এটা না বোঝার কিছু নেই, আহামরি কোন ব্যাপার না। Blind force মানে, আগে যেটা বলা হল, নিউটনের যে গতির সিদ্ধান্তগুলি আছে তার মধ্যেই ঘুরপাক করতে থাকবে। যেখানে ‘ইচ্ছা’ জিনিসটা আসবে, ‘ইচ্ছা’ বলতে যেটা বোঝায়, সেখানে অবশ্যই চেতনা থাকতে হবে। চেতনা একমাত্র আত্মারই আছে, আত্মাই ঈশ্বর, ঠাকুর তাই তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিতে বলছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে এখানে গাছের একটি পাতা নড়তে পারবে না। হয় আপনাকে বলতে হবে, মানুষ থেকে শুরু করে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত সব কিছু একটা জড় পদার্থ, যে পদার্থ নিউটনের গতির সিদ্ধান্তের first law,

second law, third law দিয়ে চলছে। আর তা নাহলে আপনাকে বলতে হবে, আপনার একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে, যে ইচ্ছা দিয়ে আপনি কখন এটা করছেন, কখন সেটা করছেন। যদি আপনার এই বোধটাও থাকে যে, স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারে, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে, কোথাও একটা চেতন শক্তি আছে। সেই চেতন শক্তিটাই আত্মা, সেই চেতন শক্তিটাই ঈশ্বর, ঠাকুর; সেই চেতন শক্তিটাই আমার আপনার সবার ভিতরে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিতি।

ঠাকুর যখন বলছেন – 'আমি অকর্তা', তখন এই 'আমি' বলতে পুরো আমিকে বলছেন না, এই 'আমি' হল যেখানে অহংবোধ লেগে আছে। আত্মার কখন আমিত্ব বোধ হয় না, আত্মার কোন বোধই থাকে না, বোধ থাকে মনের। মন প্রকৃতির এলাকার, মন মায়ার এলাকার, মন আসলে জড়। মন যখন আত্মার সংস্পর্শে আসে, মন তখন আলোকিত হয়ে যায়। মনের এই আলোকিত হয়ে যাওয়ার জন্য মনে হয়, মনের যেন চেতনা আছে, আসলে মনের কোন চেতনা থাকে না। যে মুহুর্তে মনে হল মনে চেতনা আছে, তখনই সে মনে করতে শুরু করে, আমি হলাম আসল ক্ষমতাবান, মন মনে করে আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তোমার কিসের স্বাধীন ইচ্ছা! ঠাকুর পরে বলবেন, উনুনের উপর হাড়ি চাপানো আছে, ওর মধ্যে আলু, পটল লাফাচ্ছে। বাচ্চারা দেখে বলবে, আল, পটল লাফাচ্ছে। আলু পটল নিজে থেকে কি করে লাফাবে, নীচে আগুন আছে, সেই আগুনের জন্য লাফাচ্ছে। আসল কর্তা আগুন, আসল কর্তা আত্মা। তুমি যখন মনে করছ, আমি করছি, ওই আমিটা হল তোমার মন, যা কিনা আত্মার আলোকে আলোকিত, যার জন্য মন নিজেকে কর্তা মনে করছে। কিন্তু আসল কর্তা আত্মা, সেই আত্মাই ঈশ্বর, সেই আত্মাই আমার আপনার সবার অন্তর্যামী।

আমাদের যা কিছু হয়, জগতে যা কিছু হয় সব তাঁর ক্ষমতাতে, তাঁর চেতনাতে হয়। বোকা আমি মনে করে আমি করছি, আমি করছি মানে কে করছে, আসলে মন মনে করে সে করছে। এটা একেবারেই ভুল। ঠাকুর যখন বলছেন, আমি কর্তা নই, তখন আমি অর্থাৎ ঠাকুর কর্তা নন, ওই অর্থে না, আমার যে আমিত্ব, আমিত্ব বলতে যেটা, এটা মন, তোমার মনের শক্তিতে চলে না। যারা মনে করছে, আমার মনের শক্তিতে, আমার ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে চলে, শাস্ত্র মতে তাদেরকে বলা হয় অসুর। তাদেরও সব কিছু চলে আত্মার শক্তিতে, কিন্তু তারা মনে করছে মনের শক্তিতে সব চলছে। এদেরকেই বলছে অসুর, এরা ভুল পথে চলছে, এদের সব কিছুই হবে, ক্ষমতা হবে, শক্তি হবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা কখন হবে না।

"তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর, আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনিয়ার; যেমন চালাও, তেমনি চলি; যেমন করাও, তেমনি কর; যেমন বলাও, তেমনি বলি, নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু"।

এখানে বক্তব্য এটাই, যে জায়গাতে আমি বোধ আসে, শরীর, ইন্দ্রিয় আর মন, এই তিনটেকে মিলিয়ে যে আমিত্ব বোধ, সেটা কখনই কর্তা না, আসলে এটা জড়। ইঞ্জিন চলে না, ইঞ্জিনের পিছনে যে ইলেক্ট্রিসিটি, সেটাই ইঞ্জিনকে চালায়। ঠিক সেই রকম এই শরীর চলে না, মনও চলে না, শরীর, মন চলে, কারণ এদের পিছনে রয়েছেন সেই আত্মা। আত্মা সেই চৈতন্য সত্তা, সেই চৈতন্য সত্তাটাই হলেন ঠাকুর নিজে। সেইজন্য যা কিছু হয়, সব ঠাকুরই চালাচ্ছেন। বাইরে থেকে কোন কিছু ফোকর দালালি মেরে চালাচ্ছে না, ভিতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন, তিনি হলেন সব কিছুর নিয়ন্তা, তিনিই সব চালান, তিনি সেই ইঞ্জিনিয়ার, তিনিই সেই যন্ত্রী, তিনিই সেই ঘরণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কমলকুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কেশব সেন

এই পরিচ্ছেদে আমরা পাই, ঠাকুর কেশবচন্দ্রের কাছে এসেছেন, এর পরের পরিচ্ছেদে ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছে গেছেন। কেশব সেনকে নিয়ে লেখার আগে মাস্টারমশাই একটা লম্বা ব্যাকগ্রাউণ্ড দিচ্ছেন। ব্যাকগ্রাউণ্ডে তিনি কেশব সেনকে নিয়ে এবং ঠাকুরের সাথে কেশবের আগে আগে যে সাক্ষাৎ গুলি হয়েছিল, সেগুলোকে নিয়ে লিখছেন। মাস্টারমশাই বিভিন্ন জায়গা থেকে এই তথ্যগুলি পেয়েছেন বা সংগ্রহ করেছেন। কেশব সেন নিজেও ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছিলেন, সেখান থেকেও নিতে পারেন, আরও বিভিন্ন সোর্স থেকে তিনি জেনেছেন। লীলাপ্রসঙ্গেও বর্ণনা আছে কিভাবে ঠাকুর প্রথম কেশব সেনকে দেখতে গিয়েছিলেন। আর ঠাকুর প্রথম দেখাতেই বলছেন, 'এরই ল্যাজ খসেছে'। ঠাকুরের খুবই নামকরা কথা। তৃতীয় ও চতুর্থ এই দুটো পরিচ্ছেদ শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার মনে করছি।

মানুষ হল নিজের মনের অভিব্যক্তি, আপনার মন যেমন আপনি তেমন। আর মন সব সময় সঙ্গী খোঁজে। কদাচিৎ কখন, যাঁরা প্রথম থেকেই একেবারে আলাদা হয়ে গেছেন, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নামে আমরা শুনে থাকি, এনারা খুব মুষ্টিমেয়। দেখা যায় যে, যাঁরা এই ধরণের পুরোপুরি একাকী হয়ে গেছেন, তাঁদেরও দু-একজন শিষ্য থাকে, যাঁদের সঙ্গে তিনি একটা-দুটো কথা বলেন। কিন্তু যাঁরা ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন, শিক্ষা দিতে আসেন, তাঁদের তো কথা বলতেই হবে। আর কথা বলতে গেলেই মন সব সময় নিজের মত লোক খুঁজবে।

নিজের মনের মত লোক খুঁজতে গিয়ে দু-রকমের জিনিস হয়। একটা হল, যেখানে দেখেন এই জায়গাতে potential spirituality রয়েছে, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জাগবে, তাঁকে তিনি ধরেন। আবার অনেক সময়, যেখানে ঈশ্বরের সত্ত্বগুণের প্রকাশ, তখনকার দিনে কলকাতায় যাঁরা নামকরা লোক এবং যাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ আছে; ঈশ্বরের শক্তি তমোগুণেও আসে, রজোগুণেও আসে, সত্ত্বগুণেও আসে; কিন্তু ঠাকুর কলকাতায় নামকরা লোকেদের কাছে যাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ আছে, তাঁদের কাছে যেতেন। যাওয়ার জন্য ঠাকুর কোন ভাবে চেষ্টা করতেন, ব্যবস্থা করতেন। কারণ, কিছুটা হলেও ঠাকুরের মনটাকে কোথাও রাখতে হবে। দেখা যায়, কেশব সেন, বিদ্যাসাগর, এনাদের কথার ছলে উপদেশ দিচ্ছেন। বেশির ভাগ সময় মনে হবে, ঠাকুর যেন গল্প করছেন। কারুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, ঠাকুর এটা সেটা বলছেন, অন্যরাও কয়েকটা কথা বলছেন, এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে, ঠাকুর কথাবার্তা, প্রসঙ্গ সবটাই পুরোপুরি নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। তারপর সেখান থেকে ঠাকুরই কথা বলতে শুরু করে দিতেন।

আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য রচনা শুরু করে বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপরেই বলছেন, ভাল শিষ্য পেলে আচার্যের শিক্ষা দূরে দূরে তাড়াতাড়ি যায়। সাধারণ লোকেদের যদি এই শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে সেটা হবে শূকরের সামনে মুক্তা ছড়ানোর মত। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, তাতে বলছে, হাঁসের সামনে মুক্তা ছড়ালে ওটার একটা দাম হয়। কোন আচার্য যদি তাঁর উপদেশের প্রচার চান, তাহলে তাঁর ভাল শিষ্য দরকার। সেইজন্য গুরু পাওয়াটা কোন সমস্যা না, শিষ্য পাওয়াই সমস্যা। কারণ গুরু যত ভাল হন, যতই জ্ঞানী হন, উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে আচার্যের শিক্ষা তাঁর মৃত্যুর সাথেই হারিয়ে যাবে। ঠাকুর কেশব সেনকে বলছেন, তুমি লোক না দেখে দল কর বলে দল ভেঙে যায়। এখন কেশব সেনের সঙ্গে ঠাকুর দেখা করলেন, কেশব সেনও ঠাকুরকে দেখে কোথাও প্রভাবিত হলেন। আর তারপরেই কেশব সেন ঠাকুরের কথা ছড়িয়ে দিলেন। গিরিশ ঘোষও তাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাথে জমল না। বঙ্কিমবাবুর সাথে জমল না। যেমন যেমন এই প্রসঙ্গ আসবে, আমরা আলোচনা করব।

মাস্টারমশাই ১৮৭৫ সালের পশ্চাৎপট নিয়ে আসছেন, আর যখন তিনি লিখছেন, তখন চলছে ১৮৮২ সাল। সাত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তিনি এখান ওখান থেকে যে তথ্য পেয়েছিলেন, সেগুলোকে এখানে তিনি এক এক করে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা এখানে এগুলো সংক্ষেপে বলে নেব, কারণ ঠাকুরের সাক্ষাৎ যে কথাগুলি শুনে মাস্টারমশাই লিখেছেন, সেটাতেই আমরা বেশী জোর দিচ্ছি। যে কথাগুলোকে তিনি পুনরাবৃত্তি করবেন না, সেই পুরনো কথাগুলোকে আমরা একটু ছুঁয়ে বেরিয়ে যাব।

ঠাকুর শুনেছেন বেলঘরের বাগানে কেশব সেন আছেন। বেলঘরিয়া দক্ষিণেশ্বরের কাছেই। ঠাকুর দেখা করতে গেছেন। একটু পরেই একটা ঘটনা আসবে, ঠাকুর কাউকে দেখলেই যেন বুঝতে পারতেন, এর ভিতরের প্রকৃতির গঠণটা কেমন। এমনিতেও যে কোন মানুষের চোখ দেখলেই বুঝতে পারা যায় মানুষটা কেমন প্রকৃতির। ইংরাজীতে একটা কথাই আছে, Face is the index of mind। চেহারা দেখলে বোঝা যায় ঠিকই, কিন্তু চোখ দেখলে, যার একটু সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছে সে চোখ দেখেই সামনের লোকটির সব কিছু বুঝে যাবে। আপনার চোখে ক্রোধ আছে, আপনার চোখে ভালবাসা আছে, আপনার চোখে একটা বিতৃষ্ণার ভাব আছে – চোখ দিয়ে সবটাই বোঝা যায়। ঠাকুর আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছেন, চোখ দেখে বুঝে নিচ্ছেন ইন্টেলিজেন্স আছে কিনা। ভাল নামকরা স্কুলে যদি যান, ওখানকার ছেলেদের দেখবেন চোখে একটা ব্রিলিয়েন্স থাকে, তাতে বোঝা যায় যে ছেলেটি ইন্টেলিজেন্ট। মাস্টারমশাইকে আগে ঠাকুর বলেছিলেন, আমি কপাল দেখলে, চোখ দেখলে বুঝতে পারি। চোখ দেখলে বোঝা যায়, এর ভিতরে আধ্যাত্মিকতা আছে কিনা।

কেশব সেনকে প্রথম দেখেই একটা কথা বললেন – এরই ল্যাজ খসেছে। মানুষ দুই প্রকার হয় – কিছু মানুষ আছে যারা সংসারকে নিয়ে আছে, আরেক দিকে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে সর্বদা ডুবে আছেন। সংসারটাকে যদি আপনি মাটি রূপে দেখেন, আর ঈশ্বরকে যদি সমুদ্র রূপে দেখেন, তখন আবার বিভিন্ন ধরণের মানুষ হয়ে যাবে। কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই ডুবে থাকেন, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী বা যাঁরা হিমালয়ে, নর্মদার তীরে, গুহাতে আছেন। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনেই অনেক সাধু আছেন, যাঁরা কারুর সঙ্গেই মেলামেশা করেন না। যতটুকু কাজকর্ম দেওয়া হল করে দিলেন, তার বাইরে এনারা কারুর সাথে মেলামেশা তো দূরে, দেখা-সাক্ষাৎও করতে যান না। ওনাদের কথা বাইরের লোকেরা জানেও না।

অন্য দিকে আছেন সংসারীরা, যাঁরা সংসার ছাড়া কিছু বোঝেন না। এরপরে আসে, কিছু কিছু আধ্যাত্মিক পুরুষ বা সাধু মহাত্মারা আছেন, তাঁরা যেন জল থেকে বেরিয়ে ডাঙায় চলে আসেন। আবার অন্য দিকে অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা এমনিতে সংসার কার্য করছেন, মাঝে মাঝে এনারা, যেমন স্নান করে, তেমনি ঈশ্বরের সমুদ্রে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসেন। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষরা বেশীক্ষণ সংসারে থাকতে পারেন না। ঠিক তেমনি যাঁরা সংসারী, তাঁরা বেশীক্ষণ ধর্মকথা নিতে পারেন না। ল্যাজ খসেছে, অর্থাৎ ব্যাঙের ল্যাজ খসে গেলে ব্যাঙ জলেও থাকতে পারে আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে। কেশব সেন একদিকে সংসারে আছেন, সংসারের কার্য করছেন, ব্রাহ্ম সমাজ চালাচ্ছেন, পত্র-পত্রিকা চালাচ্ছেন, কিন্তু তার সাথে তাঁর ঈশ্বরেও মন আছে। পরে পরে ঠাকুর বলবেন, কেশব সেনের যে এত মান-সম্মান, ওই ধ্যানটুকু ছিল বলে। ওটা একটা আলাদা বিষয়, যখন আসবে তখন আমরা আবার আলোচনা করব।

ঠাকুরের কথা শুনে সবাই হেসেছিল। কিন্তু কেশব সেন বুঝতে পেরেছেন, এই কথার মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে। এরপর থেকে কেশব সেন ঠাকুরের কথা শুনতেন, দুজনে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। মাস্টারমশাই এগুলোকে এক জায়গায় গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন।

সেখানে কথাচ্ছলে ঠাকুর কেশব সেনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, **“নানা পথ দিয়া, নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরলাভ হতে পারে। মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন-ভজন করে ভক্তিলাভ করে সংসারে থাকা যায়; জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে দেখা দেন; তোমরা যা কর, নিরাকার সাধন, সে খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঠিক বোধ করবে – ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে – শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর একজন তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগরাগিণী বাজায়”**।

মানুষ এত সীমিত বুদ্ধি নিয়ে আসে যে, একটা বিদ্যাচর্চা করতে গিয়ে সেখানেই তার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। যিনি ফিজিক্স পড়ছেন, তিনি ফিজিক্সই পড়তে থাকেন, ফিজিক্সেই তার সব শক্তি চলে যায়। কদাচিৎ কখন কোন এমন ট্যালেন্টেড লোক থাকেন, যিনি দুটো ফিল্ডে বা তিনটে ফিল্ডেই সাবলীল ভাবে বিচরণ করতে পারেন। ভন নিওম্যান একজন নামকরা পদার্থবিদ ছিলেন। তাঁকে খুব ট্যালেন্টেড লোক বলা হত। এ্যটম বোমার প্রজেক্টে ছিলেন, একজন বড় গণিতজ্ঞ। একটা সময় তিনি ফিজিক্সকে পুরোপুরি ছেড়ে দিলেন। ফিজিক্স ছেড়ে উনি ইকনমিকসে নেমে গেলেন। ইকনমিকসে নেমে তিনি অনেক নূতন নূতন থিয়োরি দিলেন। পরে তাঁর থিয়োরিকে গবেষণা করে অর্থনীতিতে লোকেরা নোবেল প্রাইজ পেলেন। এনারা হলেন ব্যাতিক্রমী।

কেশব সেন একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ, আর ব্রাহ্ম সমাজের পরম্পরার যে নির্গুণ নিরাকার, তিনি তার সাধনা করছেন। ঠাকুর হলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের মূর্তরূপ। ঠাকুরের জীবনী লিখতে গিয়ে রোমা রোঁলা ঠাকুরের নামে খুব সুন্দর বলছেন, হিন্দু ধর্মের তিন হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ইতিহাস যেন একটা জায়গাতে কেন্দ্রীভূত হল। ইতিহাস এখন পাল্টাচ্ছে, রোমা রোঁলার সময় অন্য রকম ছিল। যদি আপনি আট হাজার মনে করেন তাহলে আট হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ইতিহাস হবে। ভারতের যে আট হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ইতিহাস, সেই ইতিহাস একজন মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মূর্তরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকেই কথার কথায় বলেন, অনেক বইতেও পাওয়া যাবে, যেখানে বলছেন; ঈশ্বর এক, সব ধর্ম সত্য। আসলে এই কথাগুলির কোন দাম নেই, কারণ এনারা কেউই মূর্তরূপ নন। এনারা একটা পথও দেখেননি, সব পথের কথা কি করে বলবেন! ঠাকুরের এটাই বৈশিষ্ট্য, তিনি সব পথ দিয়ে গেছেন, সব পথই তিনি দেখেছেন। যার মধ্যেই দেখছেন, এর মধ্যে একটু আধ্যাত্মিক ভাব আছে, তাকে জাগিয়ে দিচ্ছেন। যাকে দেখছেন অনেকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু একটা বাধা তাকে এগোতে দিচ্ছে না, তিনি সেই বাধাটাকে সরিয়ে দিচ্ছেন। আবার যেখানে দেখছেন, ইনি একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন, সেখানে দেখছেন তাঁর একটা গোঁড়ামি থেকে গেছে, আমি যেটা করেছি এটাই ঠিক, ওই গোঁড়ামিটাকে তিনি ধরে সেটাকে মূলশুদ্ধু কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন।

সেইজন্য কথামৃত যদি গভীরে পড়া হয়, ঠাকুরের জীবনী যদি খুব মন দিয়ে পড়া হয়, তাহলে দেখা যাবে, ঠাকুরের শিক্ষা আলাদা আলাদা স্তরে চলছে। কাউকে একটু তুলে দিচ্ছেন, কারুর বাধা সরিয়ে দিচ্ছেন। আর যখন দেখছেন, যেমন কেশব সেন, তিনি একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন, কিন্তু মনে করছেন নির্গুণ নিরাকারই সত্য, ঠাকুর তাঁকে ধর্মের শেষ কথা বলে দিচ্ছেন। তুমি একটা পথ দিয়ে এসেছ ঠিক আছে। অন্যান্য ধর্মে সমস্যা হল, অন্যান্য ধর্ম বলে আমার ধর্মটাই ঠিক, আমার ধর্মকে যদি তুমি না মানো, গলা কেটে দেব। হিন্দু ধর্ম বলে, তুমি যে পথে এসেছ এটা ঠিক, কিন্তু এটা মনে করো না যে, এটাই একমাত্র পথ। মাস্টারমশাই এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করছেন – সনাতন হিন্দু ধর্ম। ঠাকুরও অনেকবার সনাতন হিন্দু ধর্ম, এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন। সনাতন কেন? কোন একজন পুরুষ

এই ধর্ম দেননি। নদীর প্রবাহ যেমন একটা ধারায় বয়ে চলে যাচ্ছে, হিন্দু ধর্মও সেই ধারার মত বয়ে চলে যাচ্ছে।

রোশনচৌকিওয়ালারা বাঁশি বাজাচ্ছে, বাঁশিতে বিভিন্ন রাগরাগিণী বাজাচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে একটা জিনিস সাধারণ থেকে যায়, হিন্দু ধর্মেও একটা জিনিস সাধারণ থেকে যায় – ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য। বাকি সব কিছু যে কিছু না, সব মিথ্যা, তা নয়। অনিত্য, এই আছে এই নেই। বেদান্তের ভাব, মানুষ মাত্রই দিব্য, তুমি সেই আত্মা। যদি তুমি আত্মা হও, তাহলে বাকি সব কিছু তো স্বাভাবিক ভাবেই মিথ্যা হয়ে যায়, স্বাভাবিক ভাবেই অনিত্য হয়ে যায়, এরজন্য আর কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু তুমি সেই আত্মা, এই জায়গাতে পৌঁছানর জন্য অনেক পথ লাগে, একটাই পথ থাকে না। যাঁরা ওস্তাদ খেলোয়াড়, লুডোতে যেমনি বলবেন পুট্, পুট্ ফেলে দেবেন, যেমনি বলবেন ছক্কা, ছক্কা পড়বে। ঠাকুর হলেন আধ্যাত্মিক জগতের সেই ওস্তাদ খেলোয়াড়। যখন যে ভাব বলছেন, তখন তিনি সেই ভাবে গিয়ে অবস্থিত হয়ে যাচ্ছেন। কেশব সেনকে সেইজন্য তিনি ধরছেন, একটা বাধাতে যে তিনি আটকে আছেন, সেটাকে সরিয়ে দিচ্ছেন। বাধাটা এই না যে কেশব সেন আটকে যাচ্ছেন, একেবারেই আটকাচ্ছেন না। কেশব সেনের শেষ বাধা হল, ঈশ্বর অনন্ত, যিনি অনন্ত তাঁর পথও যে অনন্ত হবে, এটা কেশব সেন যেন ধরতে পারছেন না। যারা গোঁড়া শাক্ত, বা যারা গোঁড়া বৈষ্ণব, গোঁড়া শৈব, তারা সবাই ঠিক, যে পথেই থাকুক তারা পৌঁছাবে। কিন্তু কোথাও এনারা সবাই, হিন্দু ধর্মের যে সনাতন ভাব, হিন্দু ধর্ম কিসের জন্য আছে, এটাকে মিস্ করে যাচ্ছে।

আপনি একটা পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন, আপনার গ্রাজুয়েশান ডিগ্রি হয়ে গেল, মাস্টার ডিগ্রি পেয়ে গেলেন, কিন্তু ওই সাবজেক্টটা কিসের জন্য, সেটাকে আপনি মিস্ করে যেতে পারেন। সাবজেক্টটা কি যদি জানেন, পরীক্ষায় পাশ করবেনই করবেন। ক্লাশ ফোর ফাইভে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শেখান হয়, যে যোগ বিয়োগের সিদ্ধান্ত জানে, তাকে যে অঙ্কই দেওয়া হোক, সে ওটা সমাধান করে দেবে। কিন্তু যে অনেক খেটেখুটে কিছু অঙ্ক শিখেছে, পরীক্ষায় নম্বর পেয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু এখনও জানে না, যোগ জিনিসটা আসলে কি। কেশব সেন সনাতন হিন্দু ধর্মের একটা সত্যকে জেনে গেছেন, কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্মের যে এর বাইরেও একটা বিরাট রূপ আছে, যেটা হিন্দু ধর্মের আসল রূপ, সেটাকে তিনি কোথাও মিস্ করছেন। সেইজন্য ঠাকুর তাঁকে ওই কথাগুলো বলছেন।

ঠাকুর কখন কারুর ভাবে আঘাত করতেন না। গীতায় খুব সুন্দর বলছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*, যারা কর্ম করছে তাদের বুদ্ধিভেদ করো না। তাদেরকে বলতে যেও না, তুমি এগুলো ভুল করছ। কাউকে এটা বলা ঠিক না, তুমি যেটা করছ এটা ভুল। কারণ, ওই কথা তাকে অনেক ভাবে নষ্ট করে দেবে। প্রথমে নষ্ট করবে, নিজেকে সে ছোট মনে করতে শুরু করে। নিজেকে ছোট মনে করার ফলে তার ব্যক্তিত্বটা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আপনাকে সম্মান করে, আপনাকে মানে, আপনি তাকে বললেন, তুমি এটা ভুল করছ, এই কথাটা তাকে বিনাশের দিকে ঠেলে দিল। দ্বিতীয়, এখনও তার মন বিবর্তের সেই ধাপে আছে, যেখান থেকে সে আর উঠতে পারবে না। এই করে করে অনেকগুলো কারণ আছে।

সেইজন্য বলছেন, *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, তার মতই তুমি ব্যবহার কর। ঠাকুর জানেন, ঠাকুরের সময় সমাজের যে রীতিগুলি ছিল, বা ঠাকুরের আগে যা ছিল বা ভবিষ্যতে যা আসবে, এগুলোর কোন দাম নেই। ঈশ্বর যেখানে নিত্য, ঈশ্বর যেখানে সত্য, সেখানে কোন রীতিরই কোন দাম নেই। ঠাকুর ওটা ভাঙবেন না, সমাজ যেমন চলছে, তিনি তেমনই চলবেন। কিন্তু ধর্ম ঠিক ঠিক যা, তিনি সেটার আচরণ করবেন, যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, সেখান থেকে তাকে একটু তুলে দেবেন। প্রাণ যখন এনে দিলেন, বাকিটা নিজেই ঠিক হয়ে যাবে।

এখন কেশব সেন মানছেন নিরাকার, তাহলে সাকার ভাবের কি হবে? ঠাকুর বলছেন, **"তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই"**। যদিও ঠাকুর নিজে সাকার সাধনা করে বড় হয়েছেন, সবাইকে সাকার সাধনা করিয়েছেন, তাও বলছেন, কোন ক্ষতি নাই। এই হচ্ছে *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*, যে জানে না, তার বুদ্ধিভেদ করতে নেই।

"নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হল। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে"। যারা ভক্ত, তাদের টান জিনিসটা প্রচণ্ড গভীর ও তীব্র হয়। যাঁরা বেদান্তী, নিরাকারের সাধনা যাঁরা করেন, তাঁদের টান এত তীব্র হয় না। ইমোশান জিনিসটা খুব শক্তিশালী। ইমোশান বুদ্ধি থেকে আসে, যদিও আমরা head, heart এইসব শব্দগুলি বলি, আসলে সব কিছু মন থেকেই হয়। যখন আমরা চিন্তা-ভাবনা করি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক কিছু কেমিক্যালস ছাড়ে, ইমোশান যখন আসে, তখনও মস্তিষ্ক কিছু কেমিক্যলস ছাড়ে। কি ধরণের ইমোশান আসছে, সেই অনুসারে মস্তিষ্ক বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যালস ছাড়ে। ভয় পেলে এক ধরণের কেমিক্যলস আসে, উত্তেজিত হলে আরেক ধরণের কেমিক্যলস আসে, ভালবাসা এলে অন্য ধরণের কেমিক্যালস আসে। কেমিক্যালসের রিলিজ যদি খুব পাওয়ারফুল হয়, মনে তখন ওই জিনিসটা গেঁথে যায়। কেউ যদি আপনাকে অপমান করে, সেই সময় যে ধরণের কেমিক্যালস রিলিজ হবে, আর সেটা মনের উপর এত জোরাল ছাপ ফেলবে যে, যেন পাথরের উপর একটা গভীর দাগ পড়ল, কোন দিন ওই দাগ আর যাবে না। আজ থেকে পনের বছর আগে কেউ হয়ত আপনাকে একটা কটূ কথা বলেছিল, দেখবেন সেই কথাটা আপনি এখনও মনে রেখেছেন।

বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা এত স্ট্রং চলে না। চিন্তা-ভাবনা অনেক দিন চালিয়ে গেলে তখন ওটা মনের উপর একটা ছাপ ফেলে। এখন অদ্বৈত, নির্গুণ, নিরাকার তাত্ত্বিক দিয়ে যতই যুক্তিযুক্ত হোক, মানুষকে কক্ষণ এত সহজে সৎ পথে আনতে পারবে না, কিন্তু ভক্তিপথ খুব সহজে নিয়ে আসে। স্বামীজী অদ্বৈতের মধ্যে ভক্তিকে নিয়ে এলেন, বলছেন, সমস্ত শক্তি তোমার ভিতরে, সমস্ত জ্ঞান তোমার ভিতরে, সবাই তোমার ভাই। স্বামীজী এইভাবে অদ্বৈতের একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে এলেন। স্বামীজী দেখিয়ে দিলেন, অদ্বৈতের মধ্যেও ইমোশান আনা যায়। কেশব সেনকে ঠাকুর এটাই বলছেন, তোমরা সাকারকে মনে করছ ভুল, তা না, সাকারবাদীদের ওই টানটুকু নাও, ওই টানটা নিজের জীবনে লাগাও।

"মা বলে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে। কখন দাস্য, কখন সখ্য, কখন বাৎসল্য, কখন মধুর ভাব। কোন কামনা নাই তাঁকে ভালবাসি, এটি বেশ। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম কিছুই চাই না; কেবল তোমার পাদপদ্মে ভক্তি। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা; জ্ঞান ভক্তি দুইই আছে"।

এবার ঠাকুর খুব কায়দা করে কেশব সেনকে বলে দিচ্ছেন, তোমরা যে এত জ্ঞানের কথা বলছ, ঠিকই বলছ, কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞান আর ভক্তি দুটোই আছে। ঠাকুর বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র এই তিনটে নাম করছেন, আমাদের ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র বলতে এই তিনটি, আর ধর্মজীবন যাপন যখন আসে তখন তার জন্য আসে মনুস্মৃতি আদি স্মৃতিশাস্ত্রগুলি। এরপর ঠাকুর সংসারে দাসীর মত থাকার কথা বলছেন। এই কথাগুলো ঠাকুর সাত বছর আগে বলেছিলেন, মাস্টারমশাই পুরনো এই কথাগুলো কারুর কাছে বা কোথাও থেকে শুনেছেন।

"তোমরা বক্তৃতা দাও সকলের উপকারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরলাভ করে ঈশ্বরদর্শন করে বক্তৃতা দিলে উপকার হয়"। যে কোন জিনিসের যদি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকে, সেই জিনিসকে নিয়ে এবার সে যে কথাগুলো বলবে তার ইম্প্যাক্টটা বেশী পড়বে। কারণ খুব সহজ। একটু আগে থিয়োরেটিক্যাল নলেজ নিয়ে আলোচনা করা হল। ওটা মন দিয়ে করছেন, তার মানে আপনার মনের উপর ছাপ খুব কম পড়বে। কিন্তু আপনার প্র্যাক্টিক্যাল নলেজ হয়ে গেল, তার মানে ওখানে ইমোশানস ঢুকে গেছে।

একটা খুব সহজ উদাহরণ দিলেই জিনিসটা বোঝা যাবে। ছোট বাচ্চা যদি একটা বাজনা বাজাতে শিখে নেয়, সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে ওই বাজনা ট্যাম্‌ট্যামা ট্যাম্‌ করে বাজাতে থাকবে। ওর মনে হচ্ছে আমি বিরাট কিছু পেয়ে গেছি। আপনার পাড়াতে যদি কোন কবি থাকে, একটা কবিতা লিখে পাড়ার সবাইকে শোনাতে থাকবে। ওকে বোঝান যাবে না যে, এটা একটা থার্ড গ্রেড কবিতা। বললে আবার মারামারি লেগে যাবে। কারণ ওর মধ্যে তার ইমোশান জড়িয়ে আছে। কোন শিক্ষক পড়াচ্ছেন, পড়ানোর মধ্যে যদি তাঁর ইমোশান না থাকে, বুঝবেন তিনি ওই বিষয়টা জানেন না। বিষয়টা জানা থাকলে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে যাবেন। কথামৃত পড়তে পড়তে ঠাকুরকে দেখবেন, Thakur passionate about God, Jessus passionate about God, ঠাকুর ঈশ্বরের কথা হলেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন, কারণ এনারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করা মানেই, মনের উপর যে ছাপ পড়েছিল, ওটা ওখানে ইমোশানসে জড়িয়ে গেছে। ইমোশানস আসাতে মনের উপর ছাপটা খুব জোড়াল, ফলে এবার যে কথাগুলো বেরোবে, কথাগুলোরও জোড় বেড়ে যাবে।

এখানে ঠাকুর যেভাবে বলছেন, তাহলে তো ঈশ্বরীয় কথা কেউই বলতে পারবেন না। কারণ ঈশ্বরীয় কথা যেটুকু জানছি শাস্ত্র মারফৎ আমরা জানছি এবং স্বামীজীও বলছেন, একশ-দুশ বছরে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা মানুষ একজন কি দুজন হন। তাহলে সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরীয় কথা কে শোনাবেন? ঠাকুর এখানে দুটো জিনিস বলছেন, একটা হল – এটা আমার সাধনা। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা যখন ভক্তদের সামনে কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, বা অন্যান্য শাস্ত্র যে পাঠ করেন, তাঁরা সাধনা রূপে পাঠ করেন; ঠাকুরের কথা আপনাদের শোনাচ্ছি। আগেকার দিনে আমাদের ছিল ভাগবত কথা আদি পাঠ, সেখানেও পাঠকের মনের এই ভাব – ভাগবতে এই এই আছে, আমি ব্যাখ্যা করে দিলাম। কিন্তু যখন উপদেশ দেওয়া হয় – তুমি শোন আমি বলছি – এই ব্যাপারটা যখন আসে, এটাই তখন নিকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে যায়। দ্বিতীয় ঠাকুর বলছেন, কিছু দিন যদি নির্জনে বাস করে, কিছু দিন যদি ঠিক ঠিক নিষ্ঠার সাথে জপধ্যান করে, তখন তার মন একটু উন্নত হয়ে যায়। একটু যদি উন্নত হয়ে যায়, হয়ত ঈশ্বরদর্শন হয়নি, কিন্তু সংসার থেকে মনটা উঠে আসে। তখন কিন্তু তাঁর কথার দাম অনেক বেড়ে যাবে, তাঁর কথাতেও লোকেদের মন প্রভাবিত হয়।

ঠাকুর বলছেন, "**তাঁর আদেশ না পেয়ে লোকশিক্ষা দিলে উপকার হয় না**"। এটা শেষ কথা বলা হল; কিন্তু সম্ভব না। কারণ আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছেন, এই ধরণের মানুষ কদাচিৎ কখন আসেন। তবে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মঠ কর্তৃপক্ষ যা আদেশ দেন সেটাকে আমরা প্রকারন্তরে ঠাকুরেরই আদেশ বলে মনে করি। আমাকে মঠ থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে এখানে কথামৃতের ব্যাখ্যা করতে হবে, আমিও ঠাকুরের আদেশ মনে করি ঠাকুরের কথাগুলোকে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি, এটাই আমার সাধনা।

"**ঈশ্বরলাভ না করলে তাঁর আদেশ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরলাভ যে হয়েছে, তার লক্ষণ আছে। বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হয়ে যায়; যেমন শুকদেবাদি। চৈতন্যদেব কখন বালকবৎ, কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতেন। হাসে, কাঁদে, নাচে গায়। পুরীধামে যখন ছিলেন, তখন অনেক সময় জড় সমাধিতে থাকতেন**"। এগুলো সব পুরনো কথা, এই কথাগুলিই কথামৃতে পরে ঘুরে ঘুরে আসবে।

এরপর মাস্টারমশাই বর্ণনা দিচ্ছেন, কবে কবে ঠাকুরের সাথে কেশব সেনের সাক্ষাৎ হয়েছে। সেখানে ১৮৭৯ সালের একটা বর্ণনা দিচ্ছেন।

"**উপাসনার পর ঠাকুর বলিতেছেন, তোমরা বল 'ব্রহ্ম আত্মা ভগবান' 'ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ' 'ভাগবত ভক্ত ভগবান'**"। ভগবান যা, ভগবানের কথাও তাই, আর যে ভক্ত ওই জায়গায় পৌঁছে গেছেন, তিনিও এক। "**কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণ সেই চন্দ্রালোকে ভাগীরথীতীরে সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের**

সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল মন্ত্র ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার যখন বলিলেন, বল ‘গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব’। তখন কেশব আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, মহাশয়, এখন অতদূর নয়; ‘গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব’ আমরা যদি বলি লোকে বলিবে ‘গোঁড়া’। শ্রীরামকৃষ্ণও হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, বেশ তোমরা যতদূর পার তাহাই বল”।

‘গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব’ বৈষ্ণবদের কথা। এর ভাব এটাই – ভগবান, গুরু আর ভক্ত তিনজনই এক। ভক্তি আমরা করি ঠিকই, ঈশ্বরকেও যে চাইছি, এটাও ঠিক; কিন্তু সমাজকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। ঠাকুর সমাজকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সমাজের কে কি ঠাকুরকে নিয়ে ভাবছে তাতে ঠাকুরের কিছু এসে যায় না। কেশব সেন পারবেন না, আমরাও পারি না, সমাজকে আমাদের মেনে চলতে হয়। এটাকে আমরা অন্য ভাবে বলতে পারি। সব ধর্ম সমান মানছি। কিন্তু কালকে যদি কেউ বলে, ‘সব ধর্ম সমান বলছেন তো, ঠিক আছে ঠাকুরের তিথি পূজাটা বন্ধ করে সেই জায়গায় যীশু খ্রীষ্টের পূজা করুন দেখি, সবই তো সমান’? না, এভাবে করা যাবে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক-একটা ভাব থাকে, সেই ভাবের বিপরীতে গিয়ে ভাবকে নষ্ট করা যায় না। ঠাকুরের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি কেশব সেনকে বৈষ্ণব বানাবেন। ঠাকুরের উদ্দেশ্য হল, কেশব সেন যে কোথাও আটকে গেছেন, সেটাকে খুলে দেওয়া। এরপরে আমরা দেখতে পাই, কেশব সেনের ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে।

মাস্টারমশাই পর পর ঠাকুর ও কেশব সেনের সাক্ষাৎকারের তারিখ দিয়ে গেছেন। অনেকবার দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। **১৮৮১** সালের ডিসেম্বর ঠাকুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে গেছেন। সেখানে কেশব সেনেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ঠাকুরের আসার দিন কেশব সেনের অশৌচ ছিল। ঠাকুর আসবেন জেনে তিনি বলছেন, ‘**সে কি! পরমহংস মহাশয় আসিবেন আর আমি যাইব না। অবশ্য যাইব। অশৌচ তাই আমি আলাদা জায়গায় খাব**’। কেশব সেন বুঝতে পারছেন, এখানে একটা পাওয়ারফুল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। ঠাকুরের সাথে কেশব সেনের এমন একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে যে, তিনি ঠাকুরের জন্য সমাজের নিয়ম মর্যাদাকেও যেন লঙ্ঘন করে দিচ্ছেন।

এরপর **১৮৮২** সালের **২৩**শে ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার কেশব সেন জোসেফ কুককে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এর তিন মাস পর ২রা এপ্রিল, **১৮৮২** সালে বিকাল পাঁচটার সময় মাস্টারমশাইর সঙ্গে ঠাকুর কমলকুটিরে কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কেশব সেনের ভক্তবন্ধু কালীনাথ বসু পীড়িত, কেশব তাঁকে দেখতে যাচ্ছিলেন। ঠাকুর এসেছেন, তাই কেশব সেনের আর যাওয়া হল না। ঠাকুর কেশব সেনকে বলছেন, “**তোমার অনেক কাজ, আবার খপরের কাগজে লিখতে হয়; সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অসুখ শুনে ডাব-চিনি মেনেছিলুম; মাকে বললুম, “মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তাহলে কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব**”।

কয়েকটি বাক্যে ঠাকুর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। প্রথম কথা, আমরা যাকে ভালবাসি, আমরা চাই সেও যেন আমাকে ভালবাসে, সেও যেন return visit দেয়, সেও যেন প্রতিদানে কিছু দেয়। আসলে স্বভাবে আমরা বড্ড বেশি demanding। এখানে তা না, আপনি যাকে ভালবাসেন, তার সুবিধা-অসুবিধাগুলি বুঝতে হয়। মাঝখানে কেশব সেনের অসুখ হয়, ঠাকুর শুনে ঠনঠনে কালীবাড়িতে ডাব-চিনি মানছেন। বক্তব্য হল, কলকাতায় গেলে কার সাথে কথা বলব।

রোগ, শোক, মৃত্যু এই জিনিসগুলিকে আমরা প্রচণ্ড গুরুত্ব দিই। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা কি অনেকটা সেমেটিক ধর্মের মত হয়ে যাচ্ছি? তাদের কাছে একবারই জন্ম হবে, মরে যাওয়া মানে সব শেষ। মরে যাওয়া মানে সব শেষ – তার মানে আমরা materialistic হয়ে যাচ্ছি। ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়ার জন্য আমাদের সমাজ-চিত্রটা অনেক ভাল বোঝা যায়। কারুর বাবা মারা গেছে, আমার বাবা মারা গেছেন, লিখে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ আসতে থাকবে, May his soul

rest in peace। এটা খ্রীশ্চানদের সমস্যা। মরে যাওয়ার পর ওর সোলটাকে বার করে এবার কষ্ট দেবে, আহা তার আত্মা যেন শান্তি পায়। আমাদের এখানে এসব কিছু নেই। আমাদের হল, জীবাত্মা বেরিয়ে গেছে, কয়েকটা দিন এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে আরেকটা শরীর ধারণ করে নেবে। এবার ওর আত্মাকে আপনি কোথায় শান্তি দেবেন।

যারা লিখছে, May his soul rest in peace, ইচ্ছে করে ওদের লিখি, 'কি ভাই, তোমরা কি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় উপরে ঝুলিয়ে রেখে দেবে নাকি? কারণ সে তো নামতে পারবে না। তুমি প্রার্থনা করে যাচ্ছ, এখনও যেন তোমার বাবা সোল অবস্থায় থাকে'। মানুষ যখন মূল ধর্ম থেকে সরে যায়, উপরে উপরে একটা ধর্মের একটা ছাউনি দিয়ে রাখে। কি বলছে, কি করছে, এগুলো একটু বিচার করে না। বাড়িতে যদি নব্বই বছরের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মৃত্যু হয়, এতো আনন্দের কথা। কল্পনার চোখে গীতায় আমরা অর্জুন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটা কথোপকথন শোনার চেষ্টা করতে পারি।

ভগবান বলছেন, *অশোচ্যনন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*, 'যার জন্য শোক করা যায় না, তুমি তার জন্য শোক করছ'?

'বাঃ! পিতামহ, আচার্য, আমার গুরুজন, এনারা মারা যাবেন আর এনাদের জন্য আমি শোক করব না'?

'হ্যাঁ, শোক অবশ্যই করবে, যদি এনাদের পতন হয়ে যেত। এনারা ধর্মজীবন যাপন করেছেন, ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছেন, এখানে শোকের কি আছে'?

'তাহলে কি আনন্দ করব'?

'না, আনন্দ কেন করতে যাবে'?

'এনাদের সাথে আমি কত কথা বলতাম, এনাদের সাথে আমি কত ভাল সময় অতিবাহিত করতাম, সেটা তো আর পাওয়া যাবে না'।

'একদম ঠিক কথা'।

আমি যে মহারাজদের সঙ্গে ছিলাম বা আছি, ওনারা কেউ যখন গত হন, তখন দেখি যে আমারও চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল বেরিয়ে আসে। এতদিন এনার কাছে কত কিছু শিখলাম। বাইরের সেন্টার থেকে মঠে এলে দৌড়ে দেখা করতাম, কথা বলতাম। কদিন পর আমাদের প্রাচীন সাধুরা যেখানে থাকেন সেই আরোগ্য ভবনে যাই, যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, এই ঘরে বসে কত কথা বলতাম, কত কিছু শিখেছি, বুঝতে পারছি চোখটা কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। এটাকে শোক বলা যায় না, শোক আলাদা জিনিস।

ঠাকুর নিজের গর্ভধারিণীর জন্য শোক করেননি, অন্য দিকে কেশব সেনের জন্য ডাব-চিনি মানছেন। মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছেন। কিন্তু কেশব সেন, কোথাও যেন প্রাণে প্রাণ মিলছে। একটা কোন কিছুর যখন পরিবর্তন হয়, যেমন স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজ যাচ্ছে, সেখানেও একই সমস্যা হয়। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে এতদিন কাটিয়েছি, এখন সবাইকে মিস করব। এরা আজ চলে যাবে, কিন্তু কাল আবার নূতন একটা গ্রুপ আসবে। সারা জীবন যদি ওদেরকে নিয়েই থাকতে হত, তাহলে কি রকম হত? মন্দিরের মূর্তির মত। মন্দিরে অনেকগুলো মূর্তি আছে, মূর্তিগুলি চিরদিন এক সঙ্গে মূর্তি হয়েই থাকে। বেঁচে থাকা মানেই, দুজন পিছনের দিকে চলে যাবে, দুজন সামনে থেকে আসবে। কিন্তু ঠাকুরের জন্য দুজন সামনে থেকে আসবে না। ঠাকুর যে লেভেলে আছেন,

ওই লেভেলে কেশব সেন, নরেন, এনারাই কথা বলতে পারেন। সেইজন্য বলছেন, আমি তোমার জন্য ডাব-চিনি মেনেছিলুম।

মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন – **"শ্রীযুক্ত প্রতাপাদি ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কথা কহিতেছেন। কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন দেখিয়া তিনি কেশবকে বলিতেছেন, 'ইনি কেন ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যান না; জিজ্ঞাসা করত গা; এত ইনি বলেন, 'মাগছেলেদের উপর মন নাই'। মাস্টার সবে এক মাস ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেছেন"। বোঝা যাচ্ছে যে, মাস্টারমশাই ততটা দক্ষিণেশ্বরে আসছেন না, যতটা ঠাকুর চাইছেন। মাস্টারমশাই শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন, এ-কদিনেই কেমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈর হয়ে গেছে। এখানে বলছেন, "শেষে যাইতে কয়দিন বিলম্ব হইয়াছে, তাই ঠাকুর এইরূপ কথা বলিতেছেন**"।

"**ব্রাহ্মভক্তরা শ্রীযুক্ত সামাধ্যায়ীকে দেখাইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র বেশ পড়িয়াছেন**"। কথামৃতে পরেও সামাধ্যায়ীকে নিয়ে ঠাকুর কথা বলবেন। "**ঠাকুর বলিতেছেন, হাঁ, এঁর চক্ষু দিয়ে এঁর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে, যেমন সার্সীর দরজার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরকার জিনিস দেখা যায়**"।

সামাধ্যায়ী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন, বইটই কিছু পড়েছিলেন। সাধনা অবশ্যই করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা বলতে গিয়ে কিছু কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলে দিতেন। এই কথা বলার অধিকার আমাদের নেই; কথামৃত পড়ে আমরা এই কথা বলছি। কিন্তু তিনি একজন পণ্ডিত ছিলেন। তখনকার দিনে এত বই ছিল না, তার মধ্যেও তিনি পড়াশোনা করেছেন। শাস্ত্র নিয়ে থাকেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। ব্রাহ্মভক্তরা যখন বলছেন, ইনি পণ্ডিত, ঠাকুর তখন বলছেন, হাঁ, এঁর চক্ষু দিয়ে এঁর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে। একটু আগেই আমরা বলছিলাম, চোখ দেখলেই বোঝা যায় লোকটি কেমন, এর শিক্ষা আছে কিনা, সাফল্য আছে কিনা, গ্ল্যামার আছে কিনা। মানুষ মারা গেলে ডাক্তার চোখটা ফাঁক করে দেখেন এর এখনও চেতনা আছে কিনা। চোখ যেন আত্মার জানালা, এর ভিতরে কি হচ্ছে, সবটাই চোখ দিয়ে বোঝা যায়। যারা চালাক, তারা মুখের উপর একটা মিথ্যার আবরণ নিয়ে আসতে পারে। ভিতরে দুঃখ, বেদনা আছে, কিন্তু মুখে হাসি।

ইংলিশে একটা নামকরা বই আছে – ভেণ্ডেটা। ভেণ্ডেটা নিয়ে পরে সিনেমাও হয়েছে। বইতে আছে, চারিদিকে প্রচুর প্লেগ হয়েছে। একজন স্ত্রী তার স্বামীকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, শেষে মেরে ফেলেছে। আসলে কিন্তু লোকটা মরেনি। কবর দেওয়া হয়েছে। হুঁশ এসে যাওয়ার পর কফিন থেকে বেরিয়ে এসেছে। যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে একটা জায়গায় ডাকাতরা প্রচুর সম্পত্তি লুকিয়ে রেখেছিল। সেই সম্পত্তি পেয়ে লোকটি সেখানকার রাজার যা সম্পত্তি তার থেকেও বেশী সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছে। কবর থেকে বেরিয়ে আসার পর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে লোকটির চুলগুলো পুরো সাদা হয়ে গেছে, একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। একটা হোটেলে উঠেছে। ওখান থেকে এবার সে স্ত্রীর উপর বদলা নেবে। সেখানে একজন লোকটিকে দেখে বলছে, 'আপনি বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছেন, আসলে কিন্তু আপনি বুড়ো নন'। 'কি করে বলছ'? 'আপনার চোখ বলছে, আপনি বুড়ো নন'। চোখ দেখেই সব বোঝা যায়। ঠাকুরও বলছেন, এনার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ইনি পণ্ডিত।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যের গান হচ্ছে। বলছেন, **গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান – আর মার নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ**।

"**শ্রীযুক্ত কেশবকে ঠাকুর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন। যেন কত আপনার লোক; আর যেন ভয় করিতেছেন, কেশব পাছে অন্য কারু, অর্থাৎ সংসারের হয়েন। তাঁহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধরিলেন**"।

কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই।
মনে সন্দ হয়, পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই......।

নরেনকে নিয়েও ঠাকুর এই গান করেছিলেন। প্রচলিত গান। ঠাকুর দুবার এই গান করেছিলেন, একবার এখানে কেশব সেনকে নিয়ে, পরে আবার নরেনকে নিয়ে করেছিলেন।

তারপর ঠাকুর বলছেন, **আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর, এখন মন তোর**। অনেক সময় শব্দকে নিয়ে খেলা করা হয়। এখানে 'মন্ত্র' শব্দকে নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। বাংলাতে গ্রাম্য ভাষায় 'মন্ত্র'কে 'মন্তোর' বলে। 'মন্ত্র' শব্দটাকে যদি একটু টেনে বলা হয়, তখন শোনাবে 'মন তোর'। তার মানে যখনই ঈশ্বরীয় মন্ত্র দেওয়া হল জপ করার জন্য, এখানে যেন বলে দেওয়া হল, এই মুহূর্ত থেকে আমার এই মনটা তোমার মন। তার মানে, এই যে মন এতক্ষণ সংসারে বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনে ছড়িয়ে ছিল, ভোগ্যবস্তুতে ছড়িয়ে ছিল, এগুলো সব বন্ধ হয়ে গেল। ইষ্টমন্ত্র পেয়ে যাওয়ার পর এখন থেকে আমার মন তোমার, মানে আত্মার। আত্মার মানে ঈশ্বরের, ইষ্টের। তোমাকে ইষ্টমন্ত্র দিয়ে দেওয়া হল, এখন থেকে তোমার মন যেন আর সংসারে, আত্মীয়-স্বজনে, বন্ধু-বান্ধবের দিকে না যায়।

"**অর্থাৎ সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাক,–তিনিই সত্য, আর বাকি সব অনিত্য, তাঁকে না লাভ করলে কিছুই হল না। এই মহামন্ত্র**"। জপের মন্ত্রকে মহামন্ত্র বলা হয়, এই কারণেই বলা হয়, এখন মন তোর। শব্দের খেলা, মন্ত্র না, মন তোর, তোমার মন এবার থেকে তোমার। এতদিন তোমার মন এই যে চারিদিকে ঘুরছিল, খেলা করে বেড়াচ্ছিল, সব বন্ধ।

এরপর ঠাকুরকে জল খাওয়াবার উদ্যোগ হচ্ছে। জলসেবা হল, ঠাকুর এবার কমলকুটির থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাত্রা করলেন। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কেশব সেনের প্রথম সাক্ষাৎ এখানে বর্ণনা করা হল। এরপর আমাদের আলোচনা আসবে, বিদ্যাসাগরের কাছে ঠাকুর দেখা করতে যাচ্ছেন।

কলিকাতায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর বাটী

বিদ্যাসাগর বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে ঠাকুরের যে মিলন, আমরা তার আলোচনা শুরু করছি। দিনটা ছিল ৫ই অগস্ট, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর মাস্টারমশাইয়ের সাথে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসেছেন। প্রথমের দিকে মাস্টারমশাই একটা বর্ণনা দিচ্ছেন। আমরা ওই বর্ণনাতে যাচ্ছি না। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি, কিভাবে লোকেদের দান করতেন, তাঁর পাণ্ডিত্য, এগুলোকে আধার করে মাস্টারমশাই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ প্যারাগ্রাফ, যেখানে বর্ণনা করছেন, ঠাকুর গাড়ি থেকে অবতরণ করলেন। **"মাস্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়ে আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়ে মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, – এতে কিছু দোষ হবে না'? গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা"**।

আমরা একদিকে দেখছি, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে খাটে আধশোয়া হয়ে আছেন। ঘরে নরেনাদি কিছু ভক্ত আছে। হঠাৎ রব উঠল গঙ্গায় বান আসছে। সবাই দৌড়ে বান দেখতে গেছে। যতক্ষণ এনারা নিজেদের পোশাক ঠিক করে বেরোতে যাবে, ততক্ষণে বান চলে গেছে। ঠাকুর হেসে বলছেন, বান কি তোমাদের কাপড়ের অপেক্ষায় বসে থাকবে? সবাই তখন অবাক হয়ে দেখছেন, ঠাকুর কাপড় ছাড়াই বান দেখতে দৌড় দিয়েছিলেন। ঠাকুরের জীবনে এই ধরণের অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাই। বিশেষ করে ঠাকুর যখন ভাবাবস্থায় থাকতেন, তখন ওনার জামা-কাপড়ের কোন হুঁশ থাকত না, শরীরেরও কোন হুঁশ থাকত না।

এই জায়গাটা খুব interesting, এখানে ঠাকুরের শরীরের হুঁশ আছে। জামার বোতমটা খোলা, তিনি লাগাতে পারছেন না, বা লাগানো যাচ্ছে না। ঠাকুরের দুশ্চিন্তা হচ্ছে, জামার বোতামটা লাগানো নেই, লোকেরা এটাকে খারাপ কিছু মনে করবে কিনা। স্বাভাবিক ভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, যিনি জগৎ থেকে নিজেকে এতটা আলাদা করে নিয়েছেন, তিনি হঠাৎ এত সাধারণ জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন!

আমাদের সবারই একটা মনের জগৎ আছে, সেই মনের জগতে আমাদের একটা গুরুত্ব থাকে। বাচ্চা বয়স থেকে যে চিন্তা-ভাবনাগুলি ভিতরে যাচ্ছে, সেই চিন্তা-ভাবনাগুলি মনের জগতে ওই জায়গাতে গিয়ে ধীরে ধীরে গভীর হয়ে যায়। গভীর হয়ে গিয়ে, পরে ওই জিনিসটাই আমাদের চালায়। সিগমন ফ্রয়েড একজন নামকরা মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন, তিনি ঈড, ইগো এই জিনিসগুলির আইডিয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে যেটা বলা হচ্ছে, ফ্রয়েডের আইডিয়া থেকে আলাদা। যেমন ছোট বাচ্চা ছোট বয়স থেকে 'আমি' 'আমি' করতে শুরু করে, তার যে মনের জগৎ রয়েছে, সেই জগতে এই আমিটা রাজার মত হয়ে যায়।

আপনি কল্পনা করুন, সমুদ্রের ধারে একটা বিরাট বড় কেল্লা আছে। সমুদ্র থেকে জল উঠছে, কেল্লার ভিতরটা এত ঠাণ্ডা যে, ওই জল কেল্লার ভিতরে এসে বরফ হয়ে জমে যাচ্ছে। ওই বরফের মধ্যে একটা বরফের মূর্তি তৈরী হয়ে গেছে, ওই মূর্তিটা হল 'আমি'। ওই কেল্লাতে কেউ থাকে না, শুধু বরফের পুতুল। ওই মনের রাজ্যে আমি হলাম রাজা। তারপর যাকে আমি ভালবাসছি, পরে তারও মূর্তি ওখানে তৈরী হয়ে যায়। ভালবাসতে বাসতে মূর্তি তৈরী হয়, কিংবা একবার হয়ত দেখা হয়েছে, সেই

ভালবাসাতে হয়। মনের জগতে যে মূর্তিগুলি রয়েছে, যে আইডিয়াসগুলি রয়েছে, এই জিনিসগুলিই বহির্জগতে আমাদের চালায়।

বহির্জগৎ কিন্তু চলে নিজের মত। যেমন ধরুন, একজন লোক মনে করতে পারে, আমি যা করেছি ঠিক করেছি। কারণ সে তার মত ভাবনা-বিচার করে রেখেছে। কিন্তু বহির্জগৎ সেটাকে হয়ত গুরুত্ব দেয় না, বা পরিচিতি দেয় না। যেমন, কিছু দিন আগে পর্যন্ত প্রেম করে যারা বিবাহ করত, সেখানে সে মনের জগতে নিজে রাজা, সেখানে সে এক রানীকে বসিয়ে রেখেছে, মনে করছে একে আমি বিয়ে করব, আমিই ঠিক। সমাজ কিন্তু এদের বিবাহকে মানছে না। ভদ্রলোক হওয়া মানে, কেল্লার বাইরে যে জগৎ, সেই জগতের যে আইন, সেই আইন মত তোমাকে চলতে হবে। মনের জগতে সে নিজের মত চলে। আমাদের মত লোকেরা, আমাদের মনের জগতের যে ভাবগুলি আছে, কিছুটা সেটাকে নিয়ে চলি, আর কিছুটা বহির্জগতের যে ব্যবহার, সেই অনুসারে চলি। আধ্যাত্মিক পুরুষরা ধীরে ধীরে বহির্জগৎকে ভুলে যান, ওনারা ওই অন্তর্জগতেই বাস করেন।

ঠাকুর পুরোপুরি অন্তর্জগতেই বাস করছেন। এই যে আমরা বরফের পুতুলের উপমা দিলাম, সেই বরফের পুতুলে ঠাকুর যখন বলছেন, মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বৈ কিছু জানি না, কারণ ঠাকুরের অন্তর্জগতে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। আমরা যে কেল্লার কথা বললাম, সেই কেল্লাতে শুধু একটাই মূর্তি – মা কালী। ঠাকুরের কেল্লাতে ও-ছাড়া আর কিছু নেই। খুব হলে ঠাকুরও সেখানে আছেন, মা কালী আছেন, ঠাকুরও আছেন; ওখানে আর কারুর অস্তিত্ব নেই।

কদাচিৎ কখন তাঁকে ওই কেল্লা থেকে বাইরে আসতে হচ্ছে। এই যে বহির্জগতে আসছেন, তখন ওই জায়গাতে দু ধরণের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম ধরণ হল, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী, তিনি কোন কিছুই গ্রাহ্য করছেন না, লোকেরা কি দেখছে না দেখছে; কি বলছে না বলছে; কোন ভ্রুক্ষেপই করছেন না। এই ধরণের কিছু কিছু মহাত্মা থাকেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী পরিধান ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠাকুর যাঁকে নিজের অন্তরঙ্গ মনে করছেন, নরেনাদি অন্তরঙ্গদের মত লোকেদের কাছে, এনাদের সঙ্গে তিনি যখন থাকছেন, তাঁদের সামনে তিনি যে কোন ভাবে থাকছেন, যে কোন কথা বলছেন। কারণ, ওই যে কেল্লা, বরফের যে পুতুলের কথা বলা হচ্ছে, ওই জায়গাতে তাঁদের যেন প্রবেশাধিকার হয়ে গেছে, ওই জায়গাতে তাঁদের অস্তিত্ব তৈরী হয়ে গেছে। বহির্জগতে তিনি যখন আসছেন, তখন তিনি দুটো জিনিস করতে পারেন। একটা হল বহির্জগৎকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা, তুমি আমাকে নিয়ে কি ভাবছ না ভাবছ, তাতে আমার কিছু আসে যায় না; বহির্জগতের কোন কিছুকেই গ্রাহ্য না করা।

ঠাকুর কিন্তু গ্রাহ্য করতেন। আসলে উনি অন্তর্জগতের লোক, বহির্জগতে যখন আসছেন, তখন তিনি চেষ্টা করছেন বহির্জগতের লোকেদের যেমন ব্যবহার, তাদের মতই ব্যবহার করবেন, তাদের মতই থাকবেন; কিন্তু পেরে উঠতেন না। কিছুক্ষণ ওদের মত থাকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু অন্তর্জগৎটা তাঁর এত বেশী শক্তিশালী যে, ঠাকুরকে বহির্জগতের মত থাকতে না দিয়ে অন্তর্জগতের মত থাকতে ঠেলে দিচ্ছেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলছেন, 'তুমি তো দেখছি মহা ছ্যাঁচড়া'। সেই সময়কার অত বড় একজন গুণী লোক, নামকরা লেখক, তার উপর একজন ডেপুটি, তাঁকে ওই ভাবে বলা যায়, তুমি তো মহা ছ্যাঁচড়া? কোন ভদ্রলোকই ও-ভাবে বলবেন না। পরে পরে এগুলোকে নিয়ে দেখা যাবে অনেক সমালোচনা হচ্ছে, আর তখনও নিশ্চয় হতো – তিনি ব্যবহার জানেন না, কাকে কি কথা বলতে হয় জানেন না। কিন্তু লোকেরা ভুলে যাচ্ছে, তাঁর যে অন্তর্জগৎ, সেই অন্তর্জগৎ দিয়েই তিনি চলছেন। সব পাগলরাও তাই চলে। পাগল আর ঠাকুরের মধ্যে এটাই তফাৎ, পাগলরা কোন গ্রাহ্য করে না, যারা দুষ্ট, বদমাইশ তারাও কেয়ার করে না; কিন্তু এনারা কেয়ার করেন, এনারা প্রাণপন চেষ্টা

করেন যে, আমি এখন তোমার সমাজে আছি, তোমার মতই আমি আচরণ করব। ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে বলছেন, যেমন রীতি তেমনই হবে।

কিন্তু ঠাকুর আকণ্ঠ আত্মজ্ঞানে ভরপুর, ঈশ্বরলীলায় পরিপূর্ণ; বহির্জগতের ব্যবহার তিনি ম্যানেজ করতে পারছেন না। ঠাকুর দেখছেন, জামার বোতাম খোলা, ঠাকুর নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন। কারণ, আমি একজন ভদ্রলোকের কাছে যাচ্ছি, তিনি যদি কিছু মনে করেন।

ঠাকুরের জীবনী যদি খুব খতিয়ে দেখা হয়, তাহলে এই ধরণের contradictions ঠাকুরের জীবনে প্রচুর দেখা যাবে। শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, হৃদয়রাম মাকে গালিগালাজ করছে, ঠাকুর জানলা দিয়ে দেখছেন, কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। সেই রাতেই মাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে ফেরৎ চলে যেতে হল। কারণ এখন হৃদয়ই তাঁর মনের জগতের রাজা। পরে যখন হৃদয়রামকে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যেতে হল, তিনি দেশে খবর পাঠাচ্ছেন, আমার এত শরীর খারাপ তোমাদের খুড়ি আসছে না কেন। এগুলোকে অনেক সময় মনে হয় contradiction, কিন্তু contradiction একটুও মনে হবে না, যদি অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ এই দুটো জগতের ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

তিরিশ চল্লিশ বছর আগে একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যেত, স্কুলের ছেলেরা লুকিয়ে সিগারেট খেত, এখনও হয়ত খায়। ছেলেরা জানে ধরা পড়লেই শিক্ষকরা মারবে। এখন তো কোন প্রশ্নই নেই যে, স্কুলে বসে সিগারেট খেতে পারবে না; আর শিক্ষক কড়া শাস্তি দেবে, কল্পনাই করা যায় না। কিংবা বাবা-মা জানলে আমাকে মারবে। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলবে, 'আর কোন দিন আমি সিগারেট খাব না, সত্যি বলছি আর কোন দিন খাব না'। কারণ এটা হল বহির্জগৎ, শিক্ষকের কাছে যদি আমি এই কথা না বলি, আমি ঝামেলায় পড়ব। অন্তর্জগতে সে জানে, সিগারেট খাওয়া কেন ভুল হবে, কোন ভুল নেই। বকুনি খেয়ে আবার আড়ালে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ধরাবে।

অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ ঠিক এভাবে চলে, তার যে মনের জগৎ সেখানে সে রাজা। তার মনের সেই রাজ্যে তার নিজস্ব কিছু বিধি-বিধান আছে, যেটা সে নিজের মত করে তৈরী করে নিয়ে সেইমত নিজেকে চালায়। বহির্জগতের যে বিধি-বিধান, এটা তৈরী হয়ে বিভিন্ন ভাবে। সামাজিক শক্তিগুলি আছে, সেখানে থেকে কিছু বিধি-নিষেধ আসে। আবার সমাজে যে ধর্ম পালন করা হয়ে, সেই ধর্ম থেকেও কিছু বিধি-নিষেধ আসে, সেই দেশের সংবিধান থেকে কিছু আসে। সে বলে দিতে পারে, আমি তোমার যে এই বিধি-নিষেধ, এগুলো মানি না। আমি, আপনি সবাই বলে থাকি, এটা আমার ভুল হয়েছে, কিন্তু তারপরেই আবার সেটা করছি। কেন আবার করছি? কারণ ওটা আমার অন্তর্জগতের ভুল নয়। অন্তর্জগতের যদি ভুল হয়, আপনি ওটা আর কোন দিন করবেন না। অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতের মধ্যে সব সময় conflict চলতেই থাকে। বহির্জগৎ অনুমতি দিচ্ছে না, অন্তর্জগৎ বলছে কেন আমি এ-রকম করতে পারি না? এই টাগ অফ ওয়ারে কখন অন্তর্জগৎ জয়ী হয়, কখন বহির্জগৎ জয়ী হয়। দুটো জগতের মধ্যেকার এই সঙ্কটের সমাধান যদি না হয়, মানুষ ধীরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায়, ঘুম উড়ে যাবে, অনেক ধরণের সমস্যা আসবে।

জীবনের উদ্দেশ্য হল অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতের মধ্যে একটা ব্যালেন্স নিয়ে আসা। চারিদিকে আমরা কত রকম দুর্নীতির কথা শুনছি। এখন কেউ মনে করতে পারে, সবাই তো চুরি করছে, আমি কেন চুরি করব না, আমিও করব। কিন্তু সে খুব ভাল করেই জানে যে বহির্জগতে একবার জানাজানি হয়ে গেলে সমাজে আমার দুর্নাম হবে, বা ধরা পড়ে গেলে জেলে যেতে হবে। সেইজন্য প্রথম বার খুব সামলেসুমলে করে। চুরি করতে করতে এমন হয়ে গেল যে, সে এখন ডোন্ট কেয়ার হয়ে গেছে। অবৈধ প্রেম একই জিনিস, সে মনে করছে আমার জীবন, আমি যা খুশি করব, কাউকে আমি কেয়ার করি না। সব কটাতে অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতের মধ্যে লড়াই চলে। কিন্তু আমার আপনার লোকের জন্য ওই অন্তর্জগতের 'আমি', ছোটবেলা থেকে বাচ্চাকে তুমি এই, তুমি সেই বলে বলে 'আমি'টা ওখানে রাজা

হয়ে বসে গেছে। আমিত্বটা ওখানে এত বড় এক রাজা হয়ে যায় যে, আমাদের জীবনটা একটা অহঙ্কারের ঢিপি হয়ে ওঠে, এই অহঙ্কারকে নিয়েই আমাদের জীবন চলে।

ঠাকুরের ক্ষেত্রে তা নয়, যীশুর ক্ষেত্রে তা নয়, ভগবান বুদ্ধের ক্ষেত্রে তা নয়। আর তাই না, তাঁরা সবাই এত বড় মহাপুরুষ যে, এনারা সব সময় বহির্জগতের সাথে অন্তর্জগতের মিল করাতে চান। ঠিক আছে, যতক্ষণ আমি তোমার সাথে আছি, আমি তোমার মতই থাকব। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না। কলকাতায় ঠাকুর এসেছেন, গাড়ী থেকে নামছেন, তখন তিনি একটা ভাবের অবস্থায়, মাস্টারমশাই ঠাকুরকে ধরতে যাচ্ছেন, ঠাকুর ধরতে দিচ্ছেন না; না, ধরো না, লোকে মনে করবে মাতাল। ঠাকুর চাইছেন না, লোকেরা তাঁকে মাতাল মনে করুক। কেননা লোকেরা মাতাল মনে করে হাসাহাসি করবে। ব্যাপারটা এই নয় যে, হাসাহাসি করবে, হাসাহাসি করলে তাতে তাঁর কে এলো গেলো। তিনি চাইছেন সাধারণ ভাবে একজন ভদ্র মানুষ যেভাবে চলে, উনিও সেই ভাবে চলার চেষ্টা করছেন।

বিদেশে গিয়ে স্বামীজীকেও একই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তাঁর অন্তর্জগৎ বলছে, আমি মুক্ত সন্ন্যাসী; কিন্তু তাঁকে ওদের সমাজের বিধি অনুযায়ী জাম-প্যান্ট পড়ে রাস্থায় বেরোতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, যে বাক্সে তাঁর পশ্চিমী পোশাক রাখা থাকত, সেটাকে লাথি মেরে যাচ্ছেন, দূর হ দূর হ, স্বামীজী নিতে পারছেন না, কিন্তু উপায় নেই। যাঁরা শুধু অন্তর্জগৎ নিয়ে থাকেন, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী, এনাদের জীবন এক রকম। যাঁরা শুধু বহির্জগৎ নিয়ে থাকেন, এনারা হলেন ভদ্রলোক। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎএর সাথে একটা ব্যালেন্স করে চলে। ঠাকুরের মত মানুষ যাঁরা, এনারা ব্যতিক্রম, এনারা হলে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত গভীর অন্তর্জগতের মানুষ। নিজের আপনজনের সাথে যখন আছেন, তখন ওনার কোন সমস্যা নেই, যে কোন ধরণের কথা বলছেন, যে কোন কিছুকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন, কোমড়ে এই কাপড় আছে, পরের মুহুর্তে কাপড় থাকছে না, তখন তিনি কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করছেন না। কিন্তু যেমনি ওখান থেকে এক পা বহির্জগতে ফেলছেন, মনটা এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে যাচ্ছেন, তিনি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু জামার বোতামটা খোলা থেকে গেছে। তিনি লাগিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু নিচ্ছেন না, হয়ত নিচ্ছেন কিন্তু গলাটা টাইট হয়ে যাচ্ছে দেখে ছেড়ে দিচ্ছেন, দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

মাস্টারমশাই তখন ঠাকুরকে বাচ্চা ছেলেকে যেমন ভাবে বোঝান হয়ে সেইভাবে বুঝিয়ে বলছেন, "**আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না, আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই**"। বুঝিয়ে দিলেন, উনিও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিদ্যাসাগর

ঠাকুর বিদ্যাসাগর যে কামরায় ছিলেন, সেখানে প্রবেশ করলেন। বিদ্যাসাগর দক্ষিণদিক মুখ করে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা চারকোণা লম্বা টেবিল। বিদ্যাসাগর সেই সময় কয়েকজন বন্ধুর সাথে কথা বলছিলেন। মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন –

"**ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের উপর। পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন**"।

প্রথম পরিচ্ছেদে মাস্টারমশাই টেবিলের বর্ণনা করে বলছেন, টেবিলে কত লোকের কত রকমের আবদারপূর্ণ চিঠি পড়ে আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স তখন ৬২/৬৩। ঠাকুরের থেকে তিনি ১৭/১৮ বছরের বড়। এরপর মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বিদ্যাসাগরের একটা বর্ণনা দিচ্ছেন, আমরা ওর মধ্যে আর ঢুকছি না। তারপর বলছেন –

"ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাব। দেখিতে দেখিতে বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন"।

বাচ্চাদের দেখা যায়, দুই-আড়াই বছরের ছোট বাচ্চা একটা কোন কিছু নিয়ে ডুবে আছে, ওটা থেকে মন সরে গেলে মার জন্য কাঁদতে শুরু করে। যাঁরা কাছে থাকেন, তাঁরা বাচ্চাকে ভোলাবার জন্য অনেক কিছু করেন। অনেক সময় বাচ্চার মন তাতে ভুলে যায়, অনেক সময় ভুলতে চায় না। কিংবা বাচ্চা যখন শরীরের কোন কষ্ট বা ব্যাথার জন্য কান্নাকাটি করে, তখন মা তাকে ভোলাবার জন্য পাখি দেখায়, এটা সেটা করে ভোলাতে চেষ্টা করেন। ঠাকুরের ভাব সংবরণ করার জন্য মনটাকে সংসারে নামাতে হচ্ছে – জল খাব।

একজন সাধু বা একজন সন্ত আর একজন অবতার, দুজনের মধ্যে এটাই তফাৎ। সন্ত মহাত্মারা চেষ্টা করে উপরে যান, অবতাররা চেষ্টা করে মনটাকে নামিয়ে রাখেন। নীচে থাকার জন্য অবতারাদির অনেক কষ্ট করতে হয়। বড় গ্যাস বেলুনকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, নাহলে উড়ে বেরিয়ে যাবে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতের বিভাজন রেখাটা এত পাতলা যে, একটুতেই তিনি অন্তর্জগতে চলে যাচ্ছেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন। একটি ১৭/১৮ বছরের ছেলে সেই বেঞ্চে বসিয়া আছে। ঠাকুরের আর হুঁশ নেই, সেই অবস্থায় চলে গেছেন, সেখানে গিয়ে বহির্জগতে যে রকম থাকার কথা সেই রকম আর থাকতে পারছেন না। ছেলেটি বিষয়াসক্ত। ১৭/১৮ বছরের ছেলে, সংসারের বিষয়ের চিন্তা ছাড়া আর কি থাকবে। ঠাকুর ভাবে বলছেন, **"মা! এ-ছেলের বড় সংসারাসক্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার। এ অবিদ্যার ছেলে"**।

এই কথাটা যখনই আমি পড়ি আমার মনটা কেমন যেন একটা হয়ে যায়। এই ছেলেটিকে হয়ত সত্যিই পরিবার দেখতে হবে, তার মা-বাবা কি অবস্থায় আছে আমরা জানি না। ঠাকুর যে ওকে ছোট করতে চাইছেন, একেবারেই না। ঠাকুর এখন সেই ভাবের মধ্যে আছেন, যেখান থেকে তিনি জগৎকে অন্য ভাবে দেখছেন, চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছেন না। আমাদেরও এই রকম অবস্থা কখন কখন হয়ে যায়, যেখানে পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, আমরাও নিজেদের সামলে রাখতে পারি না। যেমন নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশ্যপুকে বধ করার জন্য নিজের ভিতরে এমন রাগ উৎপন্ন করলেন, সেই রাগে তিনি হিরণ্যকশ্যপুকে বধ করার পরেও থামাতে পারছেন না। দেবতারা স্তুতি করছেন, কিন্তু নিজের রাগকে কিছুতে প্রশমিত করতে পারছেন না। তারপর প্রহ্লাদকে সামনে রেখে স্তুতি করা হল, এরপর তিনি ধীরে ধীরে শান্ত হলেন। ঠিক তেমনি ঠাকুর যখন ঈশ্বরের ভাবে চলে যাচ্ছেন, তখন ঈশ্বর, তাঁর বিদ্যাশক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব, এছাড়া তিনি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। এখন সেই সময় কোন বিষয়ী মানুষ এসে গেলে, বিষয়ী ভাবের কিছু এসে গেলে তিনি যে ঈশ্বরের ভাবে বিচরণ করছেন, সেখানে একটা অন্য রকম কিছু হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর যে তাকে ছোট করতে চাইছেন তা না, কিন্তু কথাগুলো এমন বেরিয়ে যেতে পারে, যেটা সামনের মানুষকে কষ্ট দিতে পারে, সে মনে করতে পারে যে তাকে ছোট করা হচ্ছে।

মাস্টারমশাই ভাবছেন, **"যে-ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরী বিদ্যা উপার্জন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন"**? সত্যিই, বেশির ভাগ লোক জীবনে শুধু টাকাই তো চাইছে। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া কে অন্য কিছু চাইবে?

এখন এই যে ঠাকুর বলছেন, জল খাব; বিদ্যাসাগর কিছু জানেন না, ঠাকুরকে প্রথম দেখছেন, স্বাভাবিক ভাবে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, কিছু খাবার আনলে ইনি খাবেন কিনা? যাই হোক বিদ্যাসাগর বাড়ির ভিতর থেকে মিষ্টি এনে দিলেন। ইতিমধ্যে বাড়ির আরও লোকজন এসে গেছেন। সঙ্গে হাজরা আছেন, ভবনাথ আছেন। মাস্টারমশাইকে যখন মিষ্টি দিতে যাচ্ছেন, তখন বিদ্যাসাগর বললেন, ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্ছে না। বিদ্যাসাগরের স্কুলেই সেই সময় মাস্টারমশাই শিক্ষকতা করতেন, তাই বলছেন, ও ঘরের ছেলে।

"ঠাকুর একটি ভক্তছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, এ-ছেলেটি বেশ সৎ, আর অন্তঃসার যেমন ফল্গুনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়"।

ঠাকুর এই কথা হয়ত ভবনাথের নামে বলছেন বা মাস্টারমশাইও হতে পারেন। কিন্তু যেভাবে ছোকরা শব্দটা বলছেন, তাতে মনে হয় ভবনাথের কথাই বলছেন। এগুলোর এমন কিছু গুরুত্ব নেই।

"মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া"।

বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে কেশব সেনের লেখালেখির জন্য ঠাকুরের নাম ছড়িয়ে গেছে। খবর ছড়িয়ে যাবার জন্য ঠাকুর আসছেন শুনে অনেক লোকজন এসেছে। যখন কারুর সঙ্গে দেখা হয়, বিশেষ করে প্রথম যখন দেখা হয়, বলে কুশলক্ষেম, কুশলক্ষেম মানে যত পরিচিতই হন, প্রথম দেখা হলেই মিষ্টি করে, নম্র ভাবে কথা বলতে হয়, ইংলিশে খুব সুন্দর বলা হয়, How do you do, তার উত্তরে বলবেন, How do you do, দুজন দুজনকে How do you do বলবেন। ভদ্রলোকের সংলাপ সব সময় মেপে মেপে বাক্যবিনিময়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুর ওই অর্থে ভদ্রলোক নন, তিনি অন্তর্জগতের মানুষ; কিছুক্ষণ টুকটাক একটা দুটো কথা বলতে বলতেই নিজের জগতে ঢুকে যাবেন। বিদ্যাসাগরের সাথে ঠাকুরের সংলাপে ঠাকুর এ-ভাবে শুরু করছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ – আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হৃদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগরের নামের সাথে সাগর আছে কিনা, তাই ঠাকুর সাগর দেখার কথা বলছেন। এটাকে খুব একটা যে আক্ষরিক ভাবে নিতে হবে তা না, কারণ, এর আগে ঠাকুর কেশব সেনকে দেখেছেন, জেনেছেন, আরও অনেককে দেখেছেন। ঠাকুর মজা করার জন্যই এই কথা বলছেন। ঠাকুর খুব হিউমারাস ছিলেন, আর যাঁরাই আধ্যাত্মিক পুরুষ হন তাঁরা প্রখর intelligent হন, ঠাকুরও প্রচণ্ড intelligent ছিলেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগর নামে সাগর শব্দটাকে নিয়ে একটা কথার খেলা করে বলছেন, এতদিন খাল বিল হৃদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)–**তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান**। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ–না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য) **তুমি ক্ষীরসমুদ্র!** (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগরও একজন রসিক মানুষ ছিলেন। তিনি ঠাকুরের 'সাগর' শব্দকে শাব্দিক অর্থে নিচ্ছেন, সাগরের জল নোনা হয়, তিনি সেটা বলার জন্য বলছেন, 'তাহলে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান'। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে 'সাগর' শব্দকে নিয়ে যাচ্ছেন, বিদ্যার সাগর ও অবিদ্যার সাগরে –'তুমি ক্ষীরসমুদ্র'। ঠাকুর প্রাণপনে এখন ভদ্র থাকতে চাইছেন। পরে পরে আমরা দেখব, ঠাকুর বিদ্যাসাগরের নামে একটাও ভাল কথা বলছেন না। যেমন বলছেন, তার চুনোপুটি গুলি বেরিয়ে এলো, এই ধরণের কথা বলছেন। কিন্তু এখন পুরোদমে ভদ্র থাকার চেষ্টা করছেন। আর ঠিকই, যতক্ষণ কথাবার্তা না হয় ততক্ষণ সামনের মানুষটি কি প্রকৃতির জানব কি করে! মুখ যতক্ষণ বন্ধ থাকে ততক্ষণ মনে হবে বিরাট কিছু।

কালিদাসের কাহিনীতে বলছেন, রত্নাবলীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজতে বেরিয়ে দেখছে কালিদাস সেই ডালটাই কাটছে যে ডালে নিজে বসে আছে। পণ্ডিতরা ঠিক করে নিল, এই মুর্খের সঙ্গেই রত্নাবলীর বিয়ে দিতে হবে। কালিদাসকে বলে দেওয়া হল, তুমি কিন্তু মুখটি খুলবে না। মুখ না খুললে লোকেরা মনে করবে, বিদ্বান। যে কোন মানুষকে বুঝতে গেলে তাকে দিয়ে দুটো কথা বলাতে হবে, তা নাহলে বোঝা যাবে না লোকটি কেমন।

ঠাকুর ক্ষীরসমুদ্র বলার পর বিদ্যাসাগর বলছেন – **"তা বলতে পারেন বটে"**। আমার এখনও অবাক লাগে, বিদ্যাসাগর কি করে নিজেকে ক্ষীরসমুদ্র বলতে পারলেন। **"বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন"**। এবার ঠাকুর ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগরকে টেনে নিচ্ছেন।

"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ"।

সৃষ্টিতত্ত্ব খুব কঠিন তত্ত্ব, আমাদের অন্যান্য লেকচারে সৃষ্টিতত্ত্বকে নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। আমরা যখনই সৃষ্টির কথা মনে করি, তখন মনে করি যেমন বাড়ি তৈরী করতে গেলে ইট, বালি, সিমেন্ট লাগে, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন সৃষ্টি হয় তখন ম্যাটার বা উপাদান দরকার। হিন্দুদের কাছে ম্যাটার নেই, আমাদের কাছে সৃষ্টি হয় গুণ থেকে। যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি শুদ্ধ চেতনা, সেই চেতনা থেকেই যেন শক্তিটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সেই শক্তি তিনটে গুণের সমাহার, তাই হিন্দুরা এই শক্তিকে বলেন ত্রিগুণাত্মিকা – সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ। রজোগুণ জিনিসটাকে চালায়, তমোগুণ বেঁধে ফেলে, আর সত্ত্বগুণ দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য করে। এগুলো বিভিন্ন সাবজেক্টের উপর আমাদের যে ক্লাশগুলি হয়, সেখানে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। সত্ত্বগুণ শান্ত হয়, রজোগুণ এগিয়ে চলে; এটা করতে হবে, ওটা পেতে হবে আর তমোগুণ আলস্য আর নিদ্রায় পড়ে থাকে। রজোগুণে লোভ আদি হয়। সত্ত্বগুণে বিদ্যার প্রতি আগ্রহ জন্মায়।

এই তিনটে গুণ সব সময় এক সঙ্গে থাকে, আর সব সময় এক অপরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তিনটে গুণ তিনটে গুণের সাথে বিচিত্র ভাবে মিশে থাকে; ঠাকুর যেমন সত্ত্বের রজোগুণের কথা বলছেন। গীতায় ভগবান সত্ত্বগুণের সংজ্ঞা দিচ্ছেন – *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*। সুখ আর জ্ঞান এই দুটো হল সত্ত্বগুণের লক্ষণ। জ্ঞানের প্রতি যখন স্পৃহা হয়, তখন বুঝতে হয় এখানে সত্ত্বগুণের আধিক্য। সেই জ্ঞানটা যখন সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে, জ্ঞানের সাহায্যে একটু প্রচার, প্রসার করতে হবে, একটু লোকের মঙ্গল করতে হবে, তখন এটা হয়ে যায় সত্ত্বের রজঃ।

"সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে – কিন্ত এ রজোগুণ – সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই"।

ভালবাসা জিনিসটা সব মানুষের মধ্যে আছে; ভালবাসা, দয়া, অপরের ভাল করার ইচ্ছা, এগুলো সত্ত্বগুণ থেকে আসে। যখন আমরা সমাজ সেবা করছি, বিভিন্ন যে সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে,

ওনারা প্রচুর কাজ করেন। দেশে বিদেশ যে প্রচুর ক্লাব, প্রতিষ্ঠান আছে, যাঁরা সেবাকার্য করেন, দেশের জন্য কাজ করছেন, অনেকেই করেন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এনাদের কাজে sense of charity থাকে। Sense of charity যেখানে থাকে, ওটা পুরোপুরি রজোগুণ, আমি তোমার ভাল করার চেষ্টা করছি। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইকে বলছেন, তোমার সত্ত্বের রজোগুণ। তার মানে, তুমি একটা উচ্চ ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভিতর করুণা জাগছে, আর তাই যে তোমার কাছে সাহায্য চাইছে, তুমি তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছ। সেখানে, আমি তোমাকে কৃপা করলাম, এই ভাব তোমার মধ্যে নেই। সত্ত্বের রজো দিয়ে ঠাকুর যেন এই কথাই বলতে চাইছেন। পরে অবশ্য আমরা জানি যে, বিদ্যাসাগরকে কেউ এসে বলছে, 'অমুক লোক আপনার নিন্দা করছেন'। তখন তিনি দুঃখ করে বলতেন, 'কই আমি তো তার কোন ভাল করিনি'। কোথাও হয়ত একটা ক্ষোভ বা অভিমান থেকে গিয়েছিল। এখানে ঠাকুরের উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করা না, নিন্দা করা না, তিনি নিজের কথা বলবেন, বিদ্যাসাগরের কথাগুলো শুনবেন, একটা আইডিয়ার যেন exchange হচ্ছে।

"শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন – ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য"।

এখানেও সেই একই জিনিস, শুকদেব ভাগবত শোনাচ্ছেন, সেই জ্ঞান আর ঢাকা নেই, সামনে চলে আসছে, লোকজনের এতে মঙ্গল হবে। জ্ঞানী অনেকেই আছেন, আমরা লোকেদের বলি, আপনার তো পড়াশোনা আছে, গ্রাজুয়েশান অনেকেরই আছে, গ্রাজুয়েশান না হলেও কিছু তো বিদ্যা আছে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের পড়ান না, কোন টাকা-পয়সা নেবেন না, নিঃস্বার্থ সেবা করুন। তখন দেখবেন ক্লাশ সিক্স-সেভেনের যে জিনিসগুলো তখন জানতেন না, পড়াতে গিয়ে জিনিসগুলো আপনার পরিষ্কার হচ্ছে, তখন আপনি আরও ভাল মানুষ হবেন। শুধু যে গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে, তা না, আপনার বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ান, একটা ভালবেসে আপনি পড়াচ্ছেন। বিদ্যা দানের থেকে বড় দান হয় না।

স্বামীজী বার বার বলছেন, শিক্ষার দায়ীত্ব ত্যাগীদের নিতে হবে, ত্যাগীরাই শিক্ষা দেবে। আমাদের দেশের যে এত দুরবস্থা, তার একটাই কারণ, শিক্ষা ত্যাগীরা দিচ্ছেন না। শিক্ষার বদলে এখন টাকা লুট হচ্ছে, সেইজন্য যারা শিক্ষা ক্রয় করছে, অর্থাৎ ছাত্ররা, তারাও কাউকে কেয়ার করে না। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, তাঁরা একটা কিছু করুন, বিনামূল্যে আমি শিক্ষা দেব। যার টাকার দরকার, সে টাকা নিয়েই করুক, অসুবিধা কিছু নেই, একটা দুটো ছাত্র রাখুন, যাদের বিনামূল্যে শিক্ষা দেবেন। স্বামীজী যে আদর্শের কথা বলে গেছেন, শিক্ষার দায়ীত্ব ত্যাগীদের। পড়াশোনা করেছেন, কিসের জন্য করেছেন? পড়াশোনা করেছেন, এবার এটাকে ছড়াতে শুরু করুন, এটা হল সত্ত্বের রজো। শুকদেবাদি মহাপুরুষরা যে জ্ঞান পেয়েছিলেন, তাঁরাও বিভিন্ন ভাবে তাঁদের লব্ধ জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

"তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছ, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান-লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পূণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই"।

কর্মযোগ দিয়েও ঈশ্বরলাভ হয়। কিন্তু আমরা যতটুকু জানি বিদ্যাসাগরের তা হয়নি, তা নাহলে পরবর্তিকালে তিনি হতাশার শিকার হতেন না, বলতে না, 'আমি তো তার উপকার করিনি, কেন তারা আমার নিন্দা করছে'? সিদ্ধ শব্দের অর্থ, যে কোন বিদ্যা বা যে কোন গুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সাধক, সাধনা ও সিদ্ধ – যেমন যিনি গানের সাধনা করেছেন, প্রথমে সাধক, সেখান থেকে সিদ্ধ।

বিদ্যাসাগর – মহাশয়, কেমন করে?

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠাকুরের 'সিদ্ধ' কথাটাকে ধরতে পারছেন না। তখন ঠাকুর জিনিসটাকে বুঝিয়ে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)– **আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!** (হাস্য)

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্, খুব নামকরা কথা, যিনি বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, যাঁর বিদ্যা আছে, তিনি বিনয়ী হন, সিদ্ধ হন। পড়াশোনা করে যদি নরম না হয়ে থাকে, যদি arrogance থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার বিদ্যা হয়নি। বিদ্যার লক্ষণ কি? দয়া, করুণা, ভালবাসা, নিরহঙ্কারী। ঠাকুর ওটাই বলছেন, আলু, পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম, তোমার এত দয়া। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অত সহজে ছাড়ছেন না, বয়সে বড়, বিদ্যা আছে।

"**বিদ্যাসাগর** (সহাস্যে) – **কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়!** (সকলের হাস্য)"

ঠাকুর এর উপসংহার করছেন।

"**শ্রীরামকৃষ্ণ – তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি – শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য**"।

"**বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন**"।

এখানে ঠাকুর যেটা বলতে চাইছেন, আমাদের ভারতবর্ষের পরম্পরাতে বিদ্যার অর্থ হল, *সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে,* সেটাই বিদ্যা যেটা আমাদের মুক্তি প্রদান করে। মুক্তির পথ হল সন্ন্যাসীর পথ, মুক্তির পথ হল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পথ। সন্ন্যাসীরা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরা কামিনী-কাঞ্চনের ভাব থেকে বেরিয়ে আসবে, নামযশের যে ভাব, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে, আর সবারই প্রতি তাঁর দয়া, সবারই প্রতি তাঁর করুণা, সবারই প্রতি একটা মৃদু ভাব থাকবে। বলছেন, কিন্তু যার পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্য নিয়ে কামিনী-কাঞ্চনে পড়ে আছে এরা সবাই শকুনের মত।

শকুন উপরে থাকে ঠিকই, কিন্তু তার দৃষ্টিটা সব সময় পড়ে আছে কোথায় পচা মড়া পড়ে আছে। বর্তমান কালে যারা এমবিএ, পিএইচডি করে বসে আছে কবে আমেরিকার ভিসা পাওয়া যাবে, কি করে প্রথম ফ্লাইটেই আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড যাবে, ঠাকুর এখন থাকলে কি বলতেন? ঠাকুরের সময় তো উড়োজাহাজ ছিল না, এরা এখন বিদ্যা অর্জন করে সত্যি সত্যিই শকুন হয়ে গেছে, প্লেনে উপরে যায় আর ভাগাড়ের দিকে তাকায়, কোথায় গিয়ে বেশী বেশী টাকা কামানো যাবে। ঠাকুর যে শকুনের সঙ্গে শুকনো পণ্ডিতদের উপমা দিচ্ছেন, আজকে আর উপমা নেই, এটাই সত্যি হয়ে গেছে।

ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন, তোমার এ-রকম নয়, কারণ তোমার ভিতর দয়া আছে। যাদের টাকা-পয়সা হয়ে যায়, তারা ওতে এমন মজে যায় যে, ওখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু তারপরে যে সমস্যা হয়, হতাশা আসে, দুঃখ-কষ্ট আসে, তখন টাকা দান-টান করে ঠিকই, কিন্তু তখনও সে নিজের স্বার্থটাই দেখে। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এটা ছিল না, তাঁর সহজ সরল জীবন, যিনিই সাহায্য নিতে আসছেন, তাঁকে সাহায্য করছেন। সংসারে সবারই নিন্দা হয়, নিন্দা সবারই করা হয়, কথায় বলে, রাজার মাকে পিছনে সবাই ডাইনি বলে। ঠাকুর তাই বলছেন, তুমি আসল পণ্ডিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে ঠাকুর আর বিদ্যাসাগর আরও গভীর আলোচনায় ঢুকে যাচ্ছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ – জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বিচার

এই পরিচ্ছেদে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছেন। খুব নামকরা কথা – ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা মুখে বলা যায় না। এই কথাটা আমরা যখনই পড়ি তখনই মনে হবে এটা কি ধরণের কথা ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্মের কথা মুখে বলা যায় না বলে ঠাকুর ঠিক কি বলতে চাইছেন, কেউই আমরা বুঝতে পারি না, কেউ বুঝুক না বুঝুক, প্রথম প্রথম কথামৃত পড়ার সময় আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারতাম না। আমরা সবাই সহজে 'ব্রহ্ম' মুখে উচ্চারণ করে তো বলে দিচ্ছি। এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গেলে এর একটা লম্বা ব্যাখ্যা হয়ে যাবে। তার আগে দুটো ব্যাখ্যা বুঝে নিলে পুরো অধ্যায়টা বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে বেদ জিনিসটা কি। বেদ নিয়ে আমরা আগে আগে অনেক আলোচনা করেছি, এবং বেদের উপর আমরা কয়েক মাস ব্যাপী আলাদা ক্লাশ নিয়েছি। যে কোন জ্ঞান মন দিয়ে হয়। রাজযোগে এর উপর গভীরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, সেখানে দেখানো হয়েছে, মন দিয়ে কিভাবে জ্ঞান হয়। যে কোন জ্ঞান, তা সে স্বপ্নের জ্ঞান হোক, কল্পনার জ্ঞান হোক, কোন বস্তুর জ্ঞান হোক, ঈশ্বর জ্ঞান হোক, জ্ঞান মানেই এর মধ্যে মন কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে।

মন মানে হয় মনের চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্য না হলে ওটা মন নয়। মানুষ মরে গেলে আর মানুষ বলা হয় না, বল হয় শব। তার মানে যতক্ষণ হুঁশ আছে ততক্ষণই মানুষ, ওটা চলে গেল মানে আর মানুষ থাকল না, সব শেষ। পুকুরে যতক্ষণ ঢেউ আছে ততক্ষণই ঢেউ। ঢেউ যদি শান্ত হয়ে যায় তাহলে পুকুর থাকবে কিন্তু ঢেউ আর নেই, সেখানে কোন ক্রিয়া নেই। আমরা যেটাকে মন বলছি, এটা হল একটা ঢেউ, জ্ঞানের ঢেউ। যদি ঢেউ বন্ধ থাকে তাহলে ওটাকে আর মন বলা যাবে না, ওটা আর মন নয়। মনের অনেক কিছু হতে থাকে, যতক্ষণ চলে ততক্ষণই ওর পরিভাষা মন, থেমে গেলে ওটা মনের পরিভাষা থাকে না। যেমন ইলেক্ট্রন, ইলেক্ট্রন যদি থেমে যায় তাহলে ওটাকে আর ইলেক্ট্রন বলা যাবে না, যতক্ষণ চলে ততক্ষণই ওকে ইলেক্ট্রন বলা যাবে। ইলেক্ট্রন থামবে না, থামতে পারে না।

আমরা সবাই জানি, মন যেমন যেমন শান্ত হয়, বিবেক বুদ্ধিও তেমন তেমন বাড়তে থাকে, বিবেক বুদ্ধি বেড়ে গেলে জিনিসটা যেমন তেমন স্পষ্ট ভাবে দেখতে পারি। অনেক সময় খুব জটিল সমস্যা হলে বা দুঃখ-কষ্ট পেলে আমরা বলি, আমাকে একটু একা থাকতে দাও। বাড়িতে কোন অশান্তি, ঝামেলা হলে বলে আমি কিছু দিন একা থাকব। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া মনোমালিন্য হলে বলে দুজনে কিছু দিন একা থাক, দেখবে সব মনোমালিন্য চলে যাবে। আসলে মনটা তখন শান্ত হয়ে যায়। ঠিক তেমনি কোন সৃজনশীল কাজ যখন করা হয় তখনও নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে এনে মনটাকে শান্ত করতে হয়, মন শান্ত হলে চিন্তা-ভাবনাগুলি আরও একাগ্র হয়। মন শান্ত হলে মনের আজবাজে জিনিসগুলি খসে পড়ে যায়, ঠিক ঠিক জিনিসটাকে ধরা যায়। মন একাগ্র হওয়া মানে, মনে যে ঢেউগুলি উঠছে, ঢেউ ওঠাটা কমে যাওয়া। পাঁচ-ছয় বয়সের বাচ্চারা সব সময় দৌড়াতে থাকে, সব সময় কথা বলতে চাইছে, কারণ মনটা অতি চঞ্চল হয়ে আছে। বয়স হয়ে গেলে, বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় বাইরের ক্রিয়া থাকে না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা কমে গেছে, তখন সবাইকে প্রচুর উপদেশ দিতে চাইবে, যাকে পাবে তাকেই বকর বকর করে উপদেশ দিতে থাকবে। কোন ক্রিয়া করতে পারে না বলে মনে চিন্তা-ভাবনাগুলি বেশি হয়।

আমরা যদি আমাদের ঋষিদের দিকে তাকাই, তখন দেখি, ঋষিরা বিভিন্ন পথে মনকে একাগ্র করেছিলেন। মনকে একাগ্র করা মানে, মনে যে ঢেউগুলো উঠছে, এই ঢেউ ওঠার সংখ্যাটা কমিয়ে দেওয়া। ঢেউ যত কম হবে, জগৎটা যেমন ঠিক তেমনটা পরিষ্কার দেখা যাবে। জগৎকে পরিষ্কার দেখা

মানে, জগতে যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু আছে, সবটাই পরিষ্কার ভাবে, একেবারে স্পষ্ট বোঝা হবে। কখন সখন এমন অবস্থা হতে পারে যে, মনের মধ্যে একটি মাত্র ঢেউ আছে। ওই একটা ঢেউ দিয়ে এই জগতের পিছনে যে সত্তা, সেটাকে যদি দেখার চেষ্টা করা হয়, তখন ওই সত্তাকে ঈশ্বর বলে জানতে পারি। কোন ভাবে এই একটা ঢেউও যদি শান্ত হয়ে যায়, তখন কি জ্ঞান হবে, সেটা মন আর জানতে পারবে না। কারণ মন ততক্ষণই মন, যতক্ষণ মন চঞ্চল। মন যদি চঞ্চল না থাকে, অর্থাৎ মন যদি ক্রিয়াশীল না থাকে, মন কোন ক্রিয়া করছে না, ওটা আর মন থাকবে না। আমরা যে ইলেক্ট্রিসিটি দিনরাত ব্যবহার করছি, এতেও তাই, বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে বলেই ইলেক্ট্রিসিটি পাচ্ছি, বিদ্যুৎ প্রবাহ থেমে গেলে আর ইলেক্ট্রিসিটি পাওয়া যাবে না। রেডিও, টর্চে যে ব্যাটারি লাগানো, সেই ব্যাটারিতেও কারেন্ট চলছে বলেই রেডিও বাজছে, টর্চ আলো দিচ্ছে।

যে কোন জিনিসকে যদি আপনি জানতে চান, যে কোন ভাবেই জানুন, ঠিক ভাবে জানুন, ভুল ভাবে জানুন, কল্পনা রূপে জানুন, স্মৃতি রূপে জানুন, এই জানার জন্য আপনার মনকে দরকার। কিন্তু মন এখানে মরে পড়ে আছে। আর যে কোন জিনিস আপনি বলতে চাইছেন, আপনি সত্যি কথা বলুন, মিথ্যা কথা বলুন; এই দুটোর যে কোন একটা তো বলবেন, তৃতীয় আর কিছু তো বলবেন না। কল্পনা করেও যেটা বলবেন সেটা একটা মিথ্যা, আমরা খুব সহজ ভাবে বলছি সত্য না হয় মিথ্যা। কিন্তু সাহিত্য আদিতে নামলে সেখানে categorization হয়ে যায়। সাহিত্যিকরা গল্প বলেন, বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখেন, সেটা সত্যও না, আবার মিথাও না, এটা একটা গল্প, একটা কল্পনা। কবিরা যখন কল্পনা করেন তখন ওটা সত্যও না, মিথ্যাও না, এটা একটা কবিতা। আমাদের মূল বক্তব্য হল, জিনিসটা হয় আপনি সত্য বলবেন, না হয় সত্যকে আবৃত করে বলবেন, আর তা নাহলে সত্যকে আপনি অন্য ভাবে বলবেন, তার মানে সেখানে সত্যটা থাকতে হবে। সত্য যদি না থাকে, তাহলে সত্য তো বলাই যাবে না, মিথ্যাও বলা যাবে না। আপনি কাউকে বাঁচাতে চাইছেন, সে লুকিয়ে আছে, আপনাকে বিশ্বাস করে জিজ্ঞেস করল, এখানে অমুক আছে? আপনি জানেন হ্যাঁ আছে, কিন্তু আপনি সত্যকে ঢেকে বলে দিলেন, ওখানে কেউ নেই। আবার অনেক সময় রহস্য করে, মিথ্যে করে, বানিয়ে কথা বলা হয়, কিন্তু সত্যকে থাকতে হবে। সত্য থাকা মানেই হল, ওই জ্ঞানটা হয়েছে। জ্ঞান হয়েছে মানে, মন কাজ করেছে।

আবার অনেক সময় মিথ্যা জ্ঞান হয়ে যায়, সেই মিথ্যা জ্ঞানকে আশ্রয় করে আপনি অনেক কিছু বানিয়ে বলে দিতে পারেন। যেমন বেদান্তের বিখ্যাত কথা – রজ্জুতে সর্পভ্রম; দড়ি পড়ে আছে, মনে করছে সাপ। সেটাকে নিয়ে কল্পনা করে আপনি এখন অনেক কিছু বানিয়ে দিলেন। কিন্তু জ্ঞান একটা থাকতে হবে, সে আপনার সত্য জ্ঞান হোক, মিথ্যা জ্ঞান হোক। জ্ঞান কক্ষণ মিথ্যা হয় না, মন কক্ষণ সত্যি আর মিথ্যার বিচার করে না, মনের কাছে আছে শুধু ইনফরমেশান। রেলের কুলির কাছে বাক্স-প্যাটরা সব বোঝা, তার মধ্যে আপনি বই নিয়ে যাচ্ছেন, সোনা নিয়ে যাচ্ছেন, পাথর নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে তার কিছু আসে যায় না, তার কাছে ওটা বোঝা ছাড়া কিছু না। ঠিক তেমনি মনের কাছে ওটা একটা তথ্য। তথ্যকে সাজান হয়েছে, তথ্য যেমনটি আসছে, আর তুলনা করার ব্যবস্থা যেমনটি আছে, সেটাকে আধার করে মনে বলে দেয় – এটা এই। এখন রাত্রের অন্ধকারে ওটা দড়ি না সাপ, মন পরিষ্কার জানে না, সে ধরেই নেয় এটা সাপ। উল্টোটাও হয়, সাপকে দড়ি মনে করছে। কিন্তু দুটোতেই মিথ্যা জ্ঞান।

ঋষিরা যখন ধ্যানের গভীরে যাচ্ছেন, সেখানে তখন মন পুরো থেমে যাচ্ছে। মন থেমে যাচ্ছে মানে মন পুরো শান্ত হয়ে গেল, তাহলে তো মন জিনিসটাকে জানতে পারছে না। আর যখন কিছু বলা হয়, সেটাই বলা হয় যেটাকে মন ধরে আছে, সেটাকে আশ্রয় করেই বলছে। মন যে জিনিসটাকে ধরতেই পারেনি, সেই জিনিসের ব্যাপার বলবে কি করে, মনের পক্ষে বলা সম্ভব না। এখন যিনি আত্মা, যিনি ব্রহ্ম, যিনি ঈশ্বর, তাঁকে যদি জানতে হয়, মনকে পুরোপুরি শান্ত হয়ে যেতে হবে, একশ ভাগ শান্ত

হতে হবে। তখন আমরা বলব, মন যদি শান্ত হয়ে যায়, তাহলে আমরা আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বরকে বুঝব কি করে। এর দুটো ব্যাখ্যা আছে।

প্রথম ব্যাখ্যা হল, মনের নিজস্ব চেতনা নেই, আত্মাই হলেন চৈতন্য, যা কিছু জ্ঞান হয় তা আত্মা দিয়েই মনের মাধ্যমে হয়। মন যদি বন্ধ হয়ে যায়, তখন আত্মা নিজেই নিজেকে জানে, কারণ একমাত্র আত্মারই চৈতন্য আছে। এনারা দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাখ্যা দেন, আমরা যখন গভীর নিদ্রায় চলে যাই, মনটা আস্তে আস্তে স্বপ্নের জগৎ থেকে গভীর নিদ্রায় যাচ্ছে, ওই জায়গাতে মনে থাকে, এরপর গভীর নিদ্রায় চলে যাওয়ার পর আর কিছু মনে থাকে না। স্বপ্নের জগৎ থেকে গভীর নিদ্রাতে চলে গেলে কোন হুঁশ থাকে না। কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর একটু একটু করে মনে পড়তে শুরু হয়। তখন জিজ্ঞেস করলে সবাই এক রকম উত্তর দেবে – 'এতক্ষণ ঘুমিয়েছি! বুঝতেই পারিনি, খুব জোর ঘুমোলাম'। অথবা যাঁরা বেহুঁশ হয়ে যান বা হাসপাতালে যাঁকে বেহুঁশ করা হয়, বেহুঁশ করার আগে পর্যন্ত তার একটা স্মৃতি থাকে, বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার পর আর কোন স্মৃতি থাকে না। বেহুঁশ থেকে যখন একটু একটু করে হুঁশ আসতে শুরু হল, তখন ধীরে ধীরে চেতনাটা আবার ফিরে আসে। তখন যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সে বলবে, 'কি হয়েছিল আমার কিছু মনে নেই'।

কিছু মনে না থাকা, এটাও একটা জ্ঞান। একটা জিনিস জানাটাও যেমন একটা জ্ঞান, আর এই জিনিসটাকে আমি জানি না, এটাও একটা জ্ঞান। ঈশ্বর আছেন, এটাকে প্রমাণ করা যেমন জ্ঞান, তেমনি ঈশ্বর নেই প্রমাণ করাটাও একটা জ্ঞান। কারণ মন যতক্ষণ জিনিসটাকে ধরতে না পারছে, ততক্ষণ ওই জিনিসটাকে বলতে পারবে না। তার মানে মন কোন না কোন ভাবে জিনিসটাকে ধরছে। কিভাবে ধরছে, ঠাকুর এটাকে নিয়ে পরে আলোচনা করবেন, আমরা এর ব্যাখ্যাতে পরে আসব। তাহলে শেষ সত্য, যেটা ঋষিরা বলে গেছেন, যেটাকে বেদান্তে জীবনের উদ্দেশ্য বলছেন। ঠাকুরও বলছেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। ঈশ্বর দর্শন, আসলে তখন কি হয়?

মানুষ যখন বেহুঁশ হচ্ছে, সেটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হচ্ছে, মন চাইছে জেগে থাকতে। যখন ঘুমোচ্ছে, মন তখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতে চাইছে, সে তখন অসহায়। কিন্তু জ্ঞান পথ, যোগ পথ, ভক্তি পথ বা যে কোন পথ অবলম্বন করে মানুষ যখন সাধনা করে, সেখানে মনের তখন একটা conscious চেষ্টা থাকে। সে এখন সচেতন ভাবে বলছে, আমি এখন আমার মনকে লয় করব। কিন্তু তিনি যখন সমাধি অবস্থায় ঢুকছেন, ওই শেষ মুহুর্তে একটা কিছু হয়ত মনে থাকবে, ওই অবস্থা থেকে আবার যখন মন চঞ্চল হতে শুরু করল, চঞ্চল হওয়া মানে, মন এই জগৎকে নিতে শুরু করল; ওখান থেকে ধীরে ধীরে যে স্মৃতিগুলো আসবে, সেগুলো থাকবে। ওই স্মৃতিগুলিকে আধার করে, উনি কিছু কিছু কথা বলতে পারবেন। এই আলোচনাটাই এখন কথামৃতে ঠাকুর করবেন।

আত্মজ্ঞান যে হয়, ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয়, তার uniform process এটা। সে আপনি ভক্তিপথে যান, কর্মপথে যান, যোগপথে যান, জ্ঞানপথে যান, যে কোন পথেই যান; সব পথে একই জিনিস ঘটে। যোগপথে মনে যে জ্ঞানগুলি হচ্ছে সেটাকে আটকাতে থাকে, মন যেন চঞ্চল না হয়ে যায়। জ্ঞানীরা যখন নেতি নেতি করছেন, তখনও তাঁরা একই জিনিস করেন, মনে যে চিন্তা-ভাবনাগুলি আসছে, যোগ সাধনার মত না করে, নেতি নেতি করে চিন্তাভাবনাগুলিকে আটকে দিচ্ছেন। থিয়োরেটিক্যালি এগুলো আমরা জানি, যোগশাস্ত্র আদিতে এর উপর বিশদ আলোচনা আছে, সেখান থেকে আমরা জানি আর ঠাকুর স্বামীজীর অথরিটি আছে, তাঁদের কাছ থেকে জানি।

ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছে একজন ভক্ত হয়ে এসেছেন। এর আগে আলোচনা হয়েছে যে, অবতার যখনই আসেন, তিনি একটা আধারকে অবলম্বন করে আসেন। ঠাকুর ভক্তের আধার নিয়ে এসেছেন। জন্ম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যেন নিজেকে সবার সামনে ভক্ত রূপেই রাখছেন। ওনার যত ব্যবহার, যা কিছু করছেন, সবেতেই তিনি এক ভক্ত। বিদ্যাসাগর মশাই ঠাকুরের থেকে বয়সে বড়,

নামডাক আছে, ঠাকুর যখন গেছেন ভক্ত রূপেই গেছেন। খোস গপ্প করা তো ঠাকুরের উদ্দেশ্য না। তিনি এসেছেন, দেখবেন, কথা বলবেন, বুঝবেন কারা ঈশ্বরীয় ভাব কতটা নিতে পারেন। সেইজন্য ঠাকুর এখন কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলবেন। অবতারের একটাই উদ্দেশ্য, ধর্মসংস্থাপন, ধর্মসংস্থাপন মানেই চারজন লোককে ঈশ্বরীয় কথা বলতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতেও মাস্টারমশাই বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করে বলছেন, বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত, এইসব প্রশংসা করার সাথে সাথে বলছেন, গলায় উপবীত ধারণ করতেন। একদিন বিদ্যাসাগরের মুখ থেকে মাস্টারমশাই শুনেছিলেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কিরূপ। **বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'তাঁকে তো জানার উপায় নাই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়'**। থিয়োরেটিক্যালি এগুলো বলে দেওয়া সোজা, আর শুনতেও ভাল লাগে, কিন্তু এগুলো হয় না, হতে দেখাও যায় না। আজ পর্যন্ত যত সিস্টেম এসেছে, সবাই এসে বলে, আমরা পৃথিবীকে স্বর্গ বানিয়ে দেব। কিভাবে বানাবে? সোস্যালিজিম সিস্টেম দিয়ে সবাইকে সমান করে দাও। ডেমোক্রেসি সিস্টেমেও তাই বলে, সবাইকে সমান অধিকার দিয়ে দাও, রাজতন্ত্রে রাজাও বলে সব প্রজাকে আমি সমান দেখি।

হয়ত দেখা যাবে, আদর্শ রূপে একজন-দুজন এসেছিলেন, কিন্তু যেমনি সিস্টেমে নেমে গেল, কদিন পরে দেখা যাবে, যারা ক্ষমতায় আছে, সব সুযোগ সুবিধা তাদের নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছে। আমরা জানতাম রাশিয়াতে সোস্যালিজমের শাসন ছিল, বইটই পড়ে আমিও ভাবতাম সত্যিই রাশিয়াতে সোস্যালিজম আছে। কিন্তু পরে পরে জানা গেল যে, ওখানে বড় বড় যে দোকানগুলো আছে, এখনকার মলের মত, সেখানে কম্যুনিস্টদের যারা উচ্চ পদাধিকারি, একমাত্র তারাই ওসব দোকানে ঢুকতে পারে, সাধারণ পাবলিকদের ওখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

আমরা সকলেই যদি ওই রকম হয়ে যেতাম, তাহলে পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যাবে – এগুলো শুনতে ভাল লাগে, বলতেও ভাল লাগে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়। আমরা সবাই মঙ্গল চাইছি, আমিও মঙ্গল চাইছি, কারণ আমার জগৎ আমাকে নিয়ে, আর আপনার জগৎ আপনার স্বামী, স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে, এরাই আপনার জগৎ। তা আমরা সবাই জগতেরই মঙ্গল করছি, আগে নিজেরটা করে নিচ্ছি, নিজেকে ছাড়া জগৎ আছে নাকি।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বর আছেন কি নেই মানতেন কিনা, স্বর্গ, নরক মানতেন কিনা জানা নেই। কিন্তু তাঁর কাছেও জগৎ মানে এই পৃথিবী। পৃথিবীটুকুই যদি শুধু জগৎ হয়, তাহলে আরও ছোট করে আমার বাড়িটুকুকে জগৎ করে নিলে দোষের কি আছে! আর বলছেন, সবাই যদি এরূপ হয়ে যায়; সত্যিই সবাই তাই। আমি আমার জগৎ ঠিক করছি, আপনি আপনার জগৎ ঠিক করছেন। সবারই নিজের নিজের জগৎ ঠিক আছে, পরের জগৎ বলে জগৎ আছে নাকি! আমরা তো আর ভূতের জগৎ ঠিক করতে পারব না, দেবতাদের জগৎ ঠিক করতে পারব না, অসুরের জগৎ ঠিক করতে পারব না, আমার জগৎ পৃথিবী পর্যন্ত। সেটাকে আরও ছোট করে আমার বাংলার যাতে ভাল হয়, আরও ছোট করে আমাদের কলকাতার যেন ভাল হয়, তার থেকেও ছোট আমার বাড়ির যেন ভাল হয়। এ-রকম হয় না, জগৎ কোন দিন স্বর্গ ছিল না, স্বর্গ হবেও না আর কোন দিন নরকও হবে না।

যন্ত্রণা, কষ্ট পেলে বলি, এই সংসারটা একেবারে একটা নরক; আবার সংসারে একটু আনন্দ, একটু সুখ পেলে বলি, আঃ শান্তি পেলাম। জগৎ সব সময়ই ভাল আর মন্দ মিশিয়ে, ওর মধ্যে একটা ব্যালেন্স আছে। তাই বলে একেবারে ফিফটি ফিফটিও নেই; অনেকে বলেন দুঃখ সত্তর ভাগ, কারুর কাছে সুখ দুঃখের অনুপাত কুড়ি আশি। যাই থাকুক, ওই শতকরা হিসাবটা স্থির থাকে, ওটা কখনও পালটায় না। শুধু কল্পনাতে বলা হয়, সত্যযুগে নাকি সব ভাল ছিল, কিন্তু কোথাও আমরা বর্ণনা পাই

না সত্যযুগটা কেমন ছিল। কোন শাস্ত্রে পাই না যেখানে ওনারা বলছেন, সত্যযুগে আমরা এভাবে ছিলাম। শুধু বলে দিচ্ছেন, সত্যযুগে এক বেদ, সত্যযুগে এক বর্ণ; কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে কোথাও সত্যযুগের বর্ণনা পাওয়া যাবে না।

যে কোন পুরাণ খুলে দেখুন, লোকে না খেয়ে মরছে, স্বামীরা স্ত্রীদের উপর অত্যাচার করছে, স্ত্রীরা স্বামীদের অত্যাচার করছে, ছেলে দুশ্চরিত্র, অবাধ্য, সব একই রকম বর্ণনা পাবেন। শুধু পুরাণ কেন, বেদ খুলে দেখুন, বেদে বলছে, আমি জুয়া খেলি, জুয়া খেলে আমার এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে, বাড়ির লোকেরা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, নিজের স্ত্রী পর্যন্ত আমাকে গালিগালাজ করছে; চিন্তা করুন বেদের সময়, তখনই জুয়া খেলা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করছে – জুয়া আমাকে সর্বনাশ করে দিল। জুয়া খেলার গুটিগুলিকে বলছেন, এগুলো তো গুটি না, আমার মৃত্যুপাশ। বেদের এই বর্ণনা দেখে তো মনে হয় না, বেদের সময় সত্যযুগ ছিল। তাহলে সত্যযুগটা ছিল কবে?

আর সেখানেও দেবতা অসুরদের যে বর্ণনা পাই, অসুররা থেকে থেকে দেবতাদের মেরে তুলোধুনো করছে, সেটা দেখে তো মনে হয় না যে, কখনও সত্যযুগ বলে কিছু ছিল। এগুলো আমাদের কল্পানাতেই হয়। ছোটবেলা মা, ঠাকুরমার কোলে বসে এইসব গল্প শুনেছি, তখন থেকে বলে যাচ্ছি, সত্যযুগ আনতে হবে। একজন খুব সুন্দর বলেছিলেন। হিন্দি এলাকায় রামচরিতমানসের খুব কদর। রামচরিতমানসের এক জায়গায় তুলসিদাসজী বলছেন, রামরাজ্যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিনটে তাপ কখন ছিল না, কোন কষ্ট ছিল না। আমার চোখের সামনে একজন উঠে জিজ্ঞেস করছে, 'পণ্ডিতমশাই, তাহলে সীতার যে বনবাস হয়েছিল, বনবাসে যে যাচ্ছে ওটাও তো একটা তাপ, সেটা কি তাপ ছিল? আপনি যে বলছেন, রামরাজ্যে কোন তাপ নেই, কোন দুঃখ-কষ্ট নেই, তাহলে বনবাসে সীতার যে দুঃখ হত, কষ্ট হতে, এটা তাহলে কি'? কি বলবেন আপনি? এগুলো হল, স্তুতি করার জন্য কিছু কথা বলে দেওয়া, এর বেশী কিছু না।

আর আমরাও এমন, কোন কিছুকে একটু বিচার করে দেখতে চাই না। বাজারে আলু বেগুন কেনার সময় আমরা কত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিই, পোকা আছে কিনা, পচে গেছে কিনা। ধর্ম, যেটা আমাদের ইহকাল, পরকাল দুটোকেই ঠিক রাখবে, সেই ধর্মের ব্যাপারে, হাবা, গোবা, গোজা, যে যা বলছে সেটাই খেয়ে নিচ্ছি। ধর্মে যে যত বেশি ইন্টারটেনমেন্ট দেবে সেখানে লোকেরা তত বেশি ভিড় করবে। দেখে মনে হবে আমরা কত ধর্মপ্রাণ। যেখানেই সৎসঙ্গ হচ্ছে, যেখানেই ভাগবত কথা হচ্ছে, হাজারে হাজারে লোকে সেখানে যাচ্ছে। আর এখন তো সারা বছর ধরে তিন দিনের শিবির, সাত দিনের শিবির লেগেই থাকে। কিন্তু আপনি একটা চাকরি করছেন, বিরাট বড়লোক। আজকে ব্যাঙ্কে আপনার কোটির উপর টাকা আছে। আজ যদি আপনি আপনার গ্রামেই পড়ে থাকতেন, তাহলেও আপনার টাকা হত, এত টাকা নিশ্চয়ই হত না। আপনি খেটে খুটে পড়াশোনা করেছেন, আপনার আজ তাই এত টাকা, এত মান-সম্মান। তার মানে আপনার সময়ের যেটা ইনভেস্ট করলেন, বদলে আপনি কিছু পেয়েছেন। আমার টাইমকে যে আমি ইনভেস্ট করছি, আমি কি পাচ্ছি? এখন আপনি শাস্ত্রের আলোচনা শুনছেন, ধর্মীয় লেকচার শুনছেন, ভাগবত সপ্তাহের শিবিরে যাচ্ছেন, ভক্ত সম্মেলনে যাচ্ছেন। এখন কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, এত বছর এগুলো করছ, এতে কি তুমি পেলে? বলবেন, মনের শান্তি পেলাম। টেলিভিশনের টিভি সিরিয়ালগুলি দেখলেও তো আপনার মনে শান্তি আসবে।

সাধু সন্ন্যাসী মানেই ত্যাগ, ভক্তি, জ্ঞান। সাধুর যদি ত্যাগ না থাকে, ভক্তি যদি না থাকে, আধ্যাত্মিক যে জ্ঞান সে জ্ঞান যদি তাঁর না হয়, আর সেটার জন্য জীবনে যদি পরিবর্তন না আসে, তাহলে তিনি কিসের সাধু, কিসের মহাত্মা। প্রত্যেক মানুষই তো চায় তার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি হোক। প্রত্যেকেই চায় সুন্দরী মেয়েরা তার আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে। কিন্তু যে সাধু মহাত্মাকে একশটা মেয়ে সব সময় ঘিরে রাখে, যে সাধু মহাত্মার হাজার কোটি টাকা, সেই সাধু মহাত্মার কাছে লোক যাবে

কেন? সাধু সঙ্গের উদ্দেশ্য একটাই, ঈশ্বরের দিকে সাধুসঙ্গ এগিয়ে দেবে। ঈশ্বরের দিকে এগোন মানেই সংসার ত্যাগ, ভক্তির বৃদ্ধি। এখন আপনি দিনের পর দিন কথামৃত পড়ছেন, দিনের পর দিন সাধুসঙ্গ করছেন, দিনের পর দিন বিভিন্ন সৎসঙ্গে যাচ্ছেন, সেখান থেকে দু-চারটে কথা শিখেছেন ঠিকই, কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগ এগুলো কি আপনার বেড়েছে? যদি না বেড়ে থাকে, তাহলে আপনার কিছু গোলমাল আছে। বলবেন, কেন, কিছু কথা তো শিখলাম।

কথা শেখাটা কি রকম? দুই ভাই আছে, বড় ভাই ঘরবাড়ি সামলায় আর ছোট ভাইটা গেছে যোগ শিখতে। কুড়ি বছর যোগশিক্ষা করে ফিরে আসার পর দাদা জিজ্ঞেস করছে, 'ভাই! এত বছর তুমি কি শিখলে? ভাই বলছে, আমি জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারি। কুড়ি বছরে তুমি এই শিখলে, এই কাজটা আমি দু-পয়সা দিয়ে করে নিই, মাঝিকে দু-পয়সা দিলে আমাকে নদী পার করে দেয়। বিশাল একটা সময় ইনভেস্ট করে আপনি কি শিখলেন? বলছেন মন কিছুক্ষণ শান্ত রাখতে হবে, সেটা সিরিয়াল দেখলে হয়ে যাবে, আর আপনি যে দু-চারটে কথা শিখলেন, সেটা বই পড়লে দু-চার মিনিটে শিখে যাবেন। যে কোন সৎসঙ্গে আপনি দু-চারটে যে কথা শিখছেন, সেটা চারটে বাক্য পড়লেই বেরিয়ে আসবে। তাহলে কি পেলেন? কিছুই না।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা কখন এগুলো নিয়ে বিচার করি না। একটু গভীরে গিয়ে বিচার করছি না যে, আমরা একটা অমূল্য সময় ইনভেস্ট করছি, সময়ের থেকে মূল্যবান কিছু নেই। বদলে আমি কি পাচ্ছি, একটু বিচার করে দেখব না? সেইজন্য পপুলার কাহিনীগুলো, সে পুরাণের কাহিনী হোক, রামায়ণের কাহিনী হোক, যেমনি একটু বিচার করতে যাবেন, দেখবেন জিনিসটা তো অন্য রকম, তখন বুদ্ধিটা খুলতে শুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পপুলার কথাগুলো বলছেন, ভেবে দেখতে হবে। শুধু নিজের জন্য করার থেকে পাঁচজনের জন্য করা অনেক ভাল, কারণ আপনি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। শুধু নিজের জন্য যখন করছে, তার মানে, মানুষ তখন exclusive হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর মশাই খুব উঁচু ধরণের মানুষ, সত্ত্বগুণের মানুষ কিন্তু ধর্ম আলাদা জিনিস।

"**বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন**"। বিদ্যা-অবিদ্যার কথা আলোচনা হচ্ছিল, যার কথা একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম, সেখান থেকে ঠাকুর এবার বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ– ব্রহ্ম – বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।

যাঁরা কথামৃত পড়েন তাঁরা থিয়োরেটিক্যালি অন্ততঃ জানেন। কিন্তু যাঁরা কথামৃত পড়েননি, তাঁরা কিন্তু আপনি যতই আলোচনা করুন, তাঁদের কাছে ঈশ্বর মানেই বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যা কিছু শুভ তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বলছেন, ব্রহ্ম বিদ্যা আর অবিদ্য – এই দুটোর পারে। কেন দুটোর পারে? একটু আগেই আমরা ব্যাখ্যা করলাম, মন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। বিদ্যা হল, যেটা মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, আর অবিদ্যা হল যেটা মানুষকে সংসারের দিকে নিয়ে যায়। বিদ্যা আর অবিদ্যা দুটোই মনের ব্যাপার। মন মানেই মায়া, মায়া মানেই মন; সেইজন্য ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পারে। শুভ-অশুভ মন দিয়ে হয়, পাপ-পূণ্য মন দিয়ে হয়। সেইজন্য ব্রহ্ম শুভ-অশুভ, পাপ-পূণ্য আদি সব কিছুর পারে।

"**এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না**"।

আমাদের সমস্যা হল, যে কোন বিষয় নিয়ে আমরা যখন বিচার করছি, যেমন জীবনে আমাদের দুঃখ-কষ্ট আছে – প্রথমে এটাকে বিচার করতে গেলে বলব, আজকে আমার জীবনে যে দুঃখ এসেছে, এই দুঃখ অমুক লোকের জন্য এসেছে। সেখান থেকে আরেকটু গভীরে গেলে দেখা যাবে আমার সব দুঃখের দায় ঘুরে ঘুরে ঈশ্বরের উপর চলে আসছে। ঈশ্বর কোন কিছুতেই নেই, তিনি আমাদের শুভও দেন না, অশুভও দেন না। এই ঘরে আলো জ্বলছে, এই আলোতে আপনি কথামৃতের আলোচনা শুনতে পারেন, নাও শুনতে পারেন, আবার ঘুমিয়েও পড়তে পারেন, তাতে আলোর কিছু আসে যায় না। কিন্তু আলো আছে বলে আমর সব কিছু করতে পারছি। যদিও ঠাকুর এখানে এই কথা বলছেন, পরেও অনেকবার কথামৃতে বলবেন, কিন্তু আমাদের উপনিষদ এই কথা বার বার বলছেন। উপনিষদ সূর্যের কথা নিয়ে আসছেন, বায়ুর কথা নিয়ে আসছেন, অগ্নির কথা নিয়ে আসছেন। অগ্নি আমাদের যা খুশি দগ্ধ করে দিতে পারে, তাতে অগ্নির কোন দোষ হয় না। সূর্যের আলো ভাল মন্দ সব জায়গার উপর পড়ছে, তাতে সূর্যের কিছু হয় না। ঈশ্বর আছেন বলে সমস্ত কিছু চলছে, তাতে ঈশ্বরের উপর কোন দোষ আসে না। ঠাকুর প্রদীপের উদাহরণ নিয়ে বলছেন –

“**যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত**”।

এই কথাগুলি আমরা যতই পড়ি, যতই শুনি; কিন্তু ঈশ্বর শব্দটা যেই আসবে তখনই আমাদের মাথায় ঘুরতে থাকবে, উপরে একজন দাড়িওয়ালা সুপার কম্প্যুটার নিয়ে বসে আছেন, তিনি আমাদের চালাচ্ছেন; উপরে বসে বসে তিনি কম্প্যুটারের কীবোর্ডে টিপছেন আর আমি হাত নাড়ছি, কথা বলছি, আপনারা আমার কথা শুনছেন, পুতুলের মত সব করছি। এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা যায় না, খুব কঠিন, সম্ভবই না। কারণ আমরা মনের জগতে বাস করছি। মনের জগতে বাস করা মানেই কার্য-কারণের সম্পর্ক থাকবে; কার্য-কারণের সম্পর্ক না থাকলে মন এলেমেলো হতে শুরু হয়ে যাবে। তখন এটাই হবে যে, এই সব কিছুকে চালানোর জন্য পিছনে একটা চৈতন্য আছে। চৈতন্য আছে মানে, যেভাবে আমি সব কিছু চালাই, সেইভাবে আমাকে কেউ একজন চালাচ্ছে, এই করে আমাদের মনে এই ধারণাগুলি আসছে। আসলে এই জিনিসগুলো তা নয়। একটু গভীর জপ-ধ্যান করা থাকলে, একটু তপস্যা করা থাকলে, ঈশ্বরের ব্যাপারে, মনের ব্যাপারে, জগতের ব্যাপারে, এদের সম্পর্কের ব্যাপারে একটু বোঝা যায়।

“**সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে**”। কঠোপনিষদে সূর্য, অগ্নি, বায়ু এই তিনটেরই উপমা নিয়ে এসেছেন। এরপর বলছেন –

“**যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি – এ-সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও-সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিছু হয় না**”।

ঠাকুর বোঝানর জন্য বিভিন্ন রকম উপমা নিয়ে আসছেন। যেমনি মনের জগৎ এসে গেল, ব্যস্ এবার সব এক এক করে চলে আসবে – শুভ থাকবে, অশুভ থাকবে, সুখ থাকবে, দুঃখ থাকবে, একটা থাকলে তার অন্যটাও থাকবে। এর আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলছিলেন, সবাই যদি ভাল হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যাবে। কোন দিন হবে না। ‘হয়ে যাবে’, যেমনি এই শব্দটা বলা হল, তার মানে মন এসে গেল; মনে এসে যাওয়া মানে এবার শুভ, অশুভ, সুখ, দুঃখ, পাপ, পূণ্য, ধর্ম, অধর্ম সব জুটে যাবে, এখানে কারুর কিছু করার নেই। কিন্তু ঈশ্বর এর সব কিছুর পারে।

এরপর ঠাকুর খুব নামকরা কথা বলছেন। যেদিন কেউ ঠাকুরের পরের কথাগুলোর ঠিক ঠিক কি অর্থ হয় বুঝে নেবেন, তাহলে বুঝতে হবে এবার সে বেদান্ত বুঝতে পারবেন। হিন্দু ধর্মের উপর আমাদের প্রায় চল্লিশটা লেকচার আছে। সেখানে দ্বৈত, অদ্বৈতের উপরেও লেকচার আছে। অদ্বৈতের উপর যেমন আছে তেমনি রামানুজের উপর, মাধ্বাচার্যের উপরেও লেকচার আছে। আমি দেখেছি

আমাদের লেকচারের উপর যত কমেন্টস আসে, সব থেকে বেশী গালাগাল পাই অদ্বৈতের উপর। দ্বৈতবাদীরা অদ্বৈতকে গালাগাল বেশি করে। জেহাদীরা যেমন বিধর্মীদের না মারা পর্যন্ত শান্তি পায় না, তেমনি দ্বৈতবাদীরাও অদ্বৈতের নাম শুনলেই নিজেদের মেশিনগানটা অন্ করে দেয়। কি সব কি সব যুক্তি নিয়ে আসে, কি বলতে চায় কিছুই বোঝা যায় না। কারণ বেদান্ত শুনতে ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু ধারণা করা খুব কঠিন। আর দ্বৈতবাদীদের কথা বোঝা খুব কঠিন, তাঁরা নিজের মত যুক্তিতর্ক দাঁড় করিয়ে ওটাকেই আঁকড়ে নিয়ে থাকেন। এই নিয়ে একটা মজার গল্প আছে।

ব্রাট্রাণ্ড রাসেল খুব নামকরা ফিলজফার ছিলেন। একবার কোথাও তিনি ফিলজফির উপর একটা লেকচার দিচ্ছিলেন। এক বৃদ্ধা মহিলা সামনের সারিতে বসে লেকচার শুরু হওয়ার পর থেকেই ঘুমিয়ে পড়লেন, আর পুরো সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন। রাসেল পুরো জগৎ, লজিক নিয়ে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন। লেকচার শেষ হওয়ার পর সেই বৃদ্ধা মহিলা রাসেলকে বলছেন, 'শোন, তুমি ভালই বলেছ, তুমি জেনে নাও পুরো পৃথিবীটা একটা কচ্ছপের উপর দাঁড়িয়ে আছে'। খ্রীশ্চানদের এটা একটা পৌরাণিক মত। ব্রাট্রাণ্ড রাসেল মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ওই কচ্ছপটা কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে'? বৃদ্ধা মহিলা হেসে বলছেন, 'বাপু বুঝতে পেরেছি তুমি বুদ্ধিমান। শোন, ওই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ওই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের উপর দাঁড়িয়ে, এইভাবে কচ্ছপের উপর কচ্ছপ, কচ্ছপের উপর কচ্ছপ, শুধু কচ্ছপই আছে – It is al the way down tortoise'। যারা তর্ক করার জন্য আছে, তারা এভাবেই তর্ক করবে। আপনি যত যুক্তিতর্ক নিয়ে আসবেন, শেষে ওরা একটা কচ্ছপ আনবে, সেই কচ্ছপের নীচে কচ্ছপ। তার নীচে? কচ্ছপ। তারও নীচে? কচ্ছপ। শেষের পরে কি? কচ্ছপ। কচ্ছপ চলতেই থাকবে। আমাদের ধর্মটা যেন কচ্ছপবাদ হয়ে গেছে। তখন ঠাকুর বলছেন –

"**ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শন – সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে – তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই**"।

যাঁরা কোন দিন একটুও গীতা, উপনিষদ, কথামৃত নাড়াচাড়া করেননি, তাঁদের জন্য এই প্যারাগ্রাফটা ধারণা করা খুব কঠিন। সব শাস্ত্রকে ঠাকুর নিয়ে আসছেন। বেদকে নিয়ে আসছেন, বলছেন বেদ এঁটো হয়ে গেছে। বেদই এঁটো হয়ে গেছে সেখানে পুরাণ কি করে এঁটো হয়ে না থাকে, তন্ত্রতো দাঁড়াবেই না। ব্রহ্ম কি? তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন, *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*, মন যাকে ধরার জন্য এগিয়ে যায়, ধরতে না পেরে মন বাণীর সাথে ফিরে আসে। কারণ মন আগে ধরবে, তবেই বাণী তাকে নিয়ে আসবে।

মুণ্ডকোপনিষদে প্রথমের দিকেই আছে, *দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে* – দুটোই বিদ্যা আছে যেটাকে জানা যায়। কি সেই দুটো বিদ্যা – পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যাকে বলছেন ব্রহ্মবিদ্যা। তাহলে অপরা বিদ্যা কোনগুলো? বেদ থেকে শুরু করে যত বিদ্যা আছে, সব অপরা বিদ্যা। ঠাকুর যে উচ্ছিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, তার মানে, বেদ থেকে শুরু হয়ে নীচের দিকে যতগুলো বিদ্যা আছে, সব কটা উচ্ছিষ্ট, কারণ বেদ থেকে শুরু করে যত বিদ্যা আছে সব বিদ্যাকে মন দিয়ে ধারণা করা যায়, মন দিয়ে যদি ধারণা করা যায়, তারপর সেটাকে মুখ দিয়ে বলার ক্ষমতা আপনার থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু কেউ না কেউ ওই বিদ্যার কথা বলে দেবে, কারণ মন দিয়ে ওটাকে ধরে নিয়েছে। কিন্তু যেটাকে মন দিয়েই ধরা যাবে না, সেটাকে কোন দিন মুখ দিয়েও বলা যাবে না।

এখানে ঠাকুর এই জিনিসটা এক ভাবে উপমা দিয়েছেন, পরে ঠাকুর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের উপমা আনবেন। এক সে ঘটিতে কি তিন সের জিনিস ধরে, এই ধরণের কথাও বলবেন, সব একই জিনিস। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠাকুর বলছেন একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতের পণ্ডিত, শাস্ত্র পড়েছেন, অবশ্যই তিনি জানেন; কিন্তু ওই জায়গাতে পৌঁছান খুব মুশকিল। বেদান্তকে ধারণা করা খুব কঠিন, আর ব্যবহারিক জীবনে নামানো তো প্রায় অসম্ভব।

“**বিদ্যাসাগর** (বন্ধুদের প্রতি) – **বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটু নূতন কথা শিখলাম**”।

ঠাকুর এবার গল্পচ্ছলে এই জিনিসটাকে বোঝাতে চাইছেন। এক পিতার দুই পুত্র, দুজনেই আচার্যের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে গেছে। কয়েক বছর পর গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসার পর বাবা বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছেন, বল ব্রহ্ম কি? বড় ছেলে বেদ থেকে নানা শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে শুরু করল। এই জায়গাটাই আমরা মিস করে যাই, যখন ব্রহ্মকে নিয়ে আলোচনা চলে, বেদ যেমন পুরুষকে নিয়ে বলছেন, উপনিষদ যেমন আত্মাকে নিয়ে বলছেন, সেখানে একটা ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, একটা ইসারা করা হচ্ছে। সেই ইঙ্গিত বা ইসারাকে যখন আলোচনায় উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তখন বলছি, এই ভাবে ব্রহ্মকে আমরা পরিভাষিত করে ব্রহ্মের এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করলাম। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন, আপনি কি প্রতিষ্ঠিত করছেন? প্রতিষ্ঠিত করছেন উদ্ধৃতিগুলিকে। কারণ আপনি ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করার আগে মন দিয়ে আপনাকে ব্রহ্মকে ধরতে হবে। কিন্তু মন তো ধরতে পারে না, কারুরই মন ব্রহ্মকে ধরতে পারবে না। যিনি সাক্ষাৎ অবতার, তাঁর মনও ব্রহ্মকে ধরতে পারবে না। এই ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যে অসম্ভব, এটাকেই ঠাকুর কথামৃতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলবেন।

“**যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে হেঁটমুখে চুপ করে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না**”।

বাবা ছোট ছেলেকে বলছেন, বাপু তুমি একটু বুঝেছ, পুরো যে বুঝে গেছ তা না। তুমি যে চুপ করে আছ, তাতেও যে তুমি পুরো বুঝে নিয়েছ, তা না, একটু বুঝেছ।

“**মানুষ মনে কর, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখের বাসায় যেতে লাগল, যাবার সময় ভাবছে – এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত**”।

কেনোপনিষদে বলছেন, *নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ*।। যে মনে করে আমি জেনেছি, সে জানে না; যে মনে করে আমি জানি না, সেই জানে। আমিও তো জানি না, এখানে ওই অর্থে বলছেন না। যিনি বোধে বোধ করেছেন, কিন্তু তারপরে তার মনে হচ্ছে, আমি তো এটা আমার মন দিয়ে ধরিনি, তখন বলছেন, *নো ন বেদেতি বেদ চ*। যে মনে করে এটাকে জানা যায় না, সেই ঠিক ঠিক জেনেছে। উপনিষদে শব্দটা হল, যে জানে যে এটাকে জানা যায় না।

যাঁরা ধর্ম নিয়ে কথা বলেন, বিশেষ করে যখন নিজের নিজের ধর্মের কথা বলবেন, লোকেরা এত confidently বলবেন যে, যে যার নিজের ধর্মের ভগবানকে বলবেন, ইনিই একমাত্র ভগবান, কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান। জানে না বলেই বলছে, জানলে চুপ হয়ে যেত। উপনিষদ থেকে ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত। ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বরের এই একটাই পরিভাষা, তিনি অনন্ত। ঈশ্বরের একটাই নাম – অনন্ত, অন্য কোন নাম নেই। ঈশ্বরকে নিয়ে যখনই কোন আলোচনা চলে তখন এটা মানতে হবে যে, ঈশ্বর অনন্ত। অনন্ত বলতে আমরা সব সময় মনে করি আকাশ, সমুদ্র। কিন্তু এগুলোও সীমিত। সাগরের

একটা সীমা আছে, যার জন্য আমরা কুলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখি, কিংবা জাহাজে দাঁড়িয়ে দেখছি। অনন্ত মানে অনন্ত। ফিজিক্সে অনন্ত মানে একটা জিনিস, গণিতে অনন্ত মানে একটা জিনিস, আমাদের এই জগতে অনন্ত মানে একটা জিনিস। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল, একটা বিরাট বড় কিছুকে অনন্ত বলে মনে করি বলেই আমাদের অনেক সমস্যা হয়ে যায়।

ঠিক ঠিক অনন্ত মানে, অনন্তকে অনন্ত দিয়ে যোগ করলে অনন্ত হবে, অনন্ত থেকে অনন্তকে বিয়োগ করলে অনন্তই হয় – *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে*, অনন্ত থেকে অনন্ত যখন বেরিয়ে আসবে তখন অনন্তই থাকবে, infinity minus infininit = infininity ধারণা করা যায় না। Infinity কে সিনেমাও তৈরী হয়েছে, খুব নামকরা বই Infininity, Infinity Hotel তার infinite income, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে তাকে নোটিস দিয়ে দিল, তোমার ট্যাক্স ইনফাইনাইট, সেই ট্যাক্স পেমেন্ট করার পরেও তার লাভ থাকল ইনফাইনাইট। কিছুই তো বোঝা গেল না; এটাই সত্য, অনন্ত জিনিসটাই অতি বিচিত্র, আপনি যাই করে দিন অনন্ত সব সময় অনন্তই থাকবে। আপনি যোগ করে দিলেও অনন্ত, বিয়োগ করে দিন তাও অনন্ত থাকবে, গুণ করে দিন তাও অনন্ত থাকবে, যাই করে দিন অনন্ত অনন্তই থাকবে।

ফিজিক্সে খুব নামকরা কথা আছে, পদার্থবিজ্ঞানীরা যখন ইক্যুয়েশানস করেন, তখন যদি কোন কারণে ইক্যুয়েশানে ইনফাইনাইট এসে গেল, তখন তাঁরা পুরোটাই বাতিল করে দিন; বিষয়টা ভুল এটাকে বাদ দিয়ে এগিয়ে যাও, এটা চলবে না। ইনফিনিটি ঢুকেছে বলে ইক্যুয়েশানটা ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু জীবনে যে অনন্ত, এটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ঈশ্বর অনন্ত, সেই অনন্তকে আমরা মাপার চেষ্টা করছি সীমিত জিনিস দিয়ে, এটা কখনই ঠিক না। বোঝাবার জন্য এর উপমা কিভাবে দেওয়া যায়? ঠাকুর বলছেন, পিঁপড়ে একটা চিনির পাহাড়ে গেছে, সেখান থেকে এক দানা চিনি মুখে নিল, খেয়ে পেট ভরে গেল। আরেকটা দানা নিয়ে পিঁপড়ে এবার বাড়ি যাচ্ছে, যেতে যেতে ভাবছে, পরের বার এসে পুরো পাহাড়টাকেই নিয়ে যাব।

"যে যতই বড় হউক হন না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও-পিঁপড়ে – চিনির আট-দশটা দানা না হয় মুখে করুক"।

যাঁরা খুব উচ্চমানের, তাঁরা যখন সেই সচ্চিদানন্দ পাহাড় থেকে ফেরত আসেন, তাঁরা যেন সবাই ডেও-পিঁপড়ে, বেশি বেশি জ্ঞান নিয়ে আসেন, সেইজন্য তাঁরা কথাও অনেক বেশি বেশি বলতে পারেন। স্বামীজী আমাদের অনেক বেশী কথা বলতে পারছেন। কিন্তু ওই অনন্তকে তিনিও নিয়ে আসতে পারেন না। এতগুলো যে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, ওই কারণেই হয়েছে। বেদ সেই অনন্তকে অনেক কিছু ভাবে দেখছেন, মুসলমানরা ওটাকে এক রকম দেখছে, খ্রীশ্চানরা আরেক রকম দেখছে। যদি বলেন তোমরা ভুল, কেন ভুল হবে? তাঁর যে জ্ঞান সেটাও ঋষির জ্ঞান। তবে হিন্দু ধর্মে হাজার হাজার ঋষিরা এটা দেখেছেন, আর অনন্ত হওয়ার জন্য তাঁরাও অনন্ত ভাবে দেখেছেন। আমাদের বেদে যে এতজন ঋষিরা যে জ্ঞানরাশি রেকর্ড রূপে রেখে গেছেন, সেখানে আমরা অনেক বেশি ভ্যারাইটি পাচ্ছি।

আজকেই দেখলাম হিন্দু বিদ্বেষীরা, যাদের কোন কাজ নেই, বসে বসে শুধু হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে, আবার পুরনো নিন্দাগুলি তুলে বলতে শুরু করেছে, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না; খ্রীশ্চান, মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষে এলো তখন এরাই ধর্মকে পরিভাষিত করতে শুরু করল। ভাই তোমরা যে ধর্মের নামে বলছ, সেগুলো একজন ঋষির দেওয়া, আমাদের এখানে এই রকম হাজার হাজার ঋষি আছে, কি করে নাম হবে? তোমাদের যদি খুব একটা সাধারণ প্রশ্ন করা হয়, বিজ্ঞান কে শুরু করেছে? নিউটন? আইনস্টাইন? পিথাগোরাস? কে করেছেন? সমস্ত জ্ঞানরাশি মিলে বিজ্ঞান হয়। তাহলে বিজ্ঞানের কোন ফাউণ্ডার নেই, তাহলে বিজ্ঞান কোন ধর্মই না? কোনটা বিজ্ঞান? ফিজিক্স বিজ্ঞান? বায়োলজি বিজ্ঞান? কেমেস্ট্রি বিজ্ঞান? এভাবে কি কথা হয়? যেমন বিজ্ঞানকে কেউ বোঝে না, ঠিক তেমনি, হিন্দু ধর্ম হল

ধর্ম। সেখানে এই ঋষির কাছে একটা জ্ঞান, ওই ঋষির কাছে আরেকটা জ্ঞান। ওই দিয়ে তুমি বলবে, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না! এগুলো বোকা বোকা কথা ছাড়া কি কথা হতে পারে। তাহলে আপনাকে বলতে হবে, বিজ্ঞান কোন জ্ঞানই না। বিজ্ঞানের না আছে কোন ফাউণ্ডার, না আছে কোন ফাউণ্ডেশানের তারিখ, না আছে একটা single বই। তাহলে এটা কিসের বিজ্ঞান হল? হিন্দু ধর্মের যদি আপনি নিন্দা করেন, তাহলে বিজ্ঞানেরও ওই ভাবে আপনি নিন্দা করুন। সেটাও করবার আপনার মুরোদ নেই, তখন বলবেন, বিজ্ঞান তো আলাদা জিনিস। যদি এগুলো নাই থাকে তাহলে বেদ, পুরাণ এগুলো কি, কোথা থেকে এলো? তখন ঠাকুর বলছেন –

“**তবে বেদে, পুরাণে যা বলেছে – সে কিরকম জান? একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে – ‘ও কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল’! ব্রহ্মের কথাও সেইরকম। বেদে আছে – তিনি আনন্দস্বরূপ – সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগরের তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে – তাঁরা এ-সাগরে নামেন নাই। এ-সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই**”।

এগুলো এমন টেকনিক্যাল যে, পড়ার পর ভাবি পাঁচশ বছর পর এই জিনিসগুলিকে নিয়েই তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকবে, ঝগড়া লাগবে। এগুলো টেকনিক্যাল জিনিস, আমরা এর কি জানব? আপনি যদি বলেন তিনি সচ্চিদানন্দ সাগরে নামেন নাই, আপনার কথা অতটাই সত্য যতটা সত্য হবে উনি নেমেছেন বললে। শুকদেব বলে কেউ ছিল কিনা তাই আমরা জানি না, কারণ ব্যাসদেব কোন দিন বিয়েই করলেন না, তাঁর আবার পুত্র সন্তান। আবার অনেক জায়গায় বর্ণনা করা হয় যে, কোন এক অপ্সরা ছিল, সে টিয়া পাখি রূপে ঘুরঘুর করছিল ওই দেখে ব্যাসদেবের মনে কামভাব উদয় হল। ব্যাসদেব সেই কামভাবকে যজ্ঞের অগ্নিতে স্থাপন করলেন, সেখান থেকে নাকি শুকদেবের জন্ম। এই গল্প কে মানবে? আপনি এটা বলতে পারেন যে, শুকদেব একজন দিব্যপুরুষ, এটাক বোঝানোর জন্য এভাবে দিব্যজন্ম নিয়ে আসা হয়েছে। ঠিক, কেউ না করছে না; কিন্তু ওটাও সত্য কিনা কে জানে।

শ্রীরাধার ব্যাপার তো আরও মজার। হিন্দুদের মূলগ্রন্থ ভাগবতে রাধার নাম কোথাও নেই, কিন্তু পুরো বৈষ্ণব ধর্ম শ্রীরাধার উপর দাঁড়িয়ে আছে। মহাভারত এত প্রামাণিক গ্রন্থ, সেখানেও রাধার কোন নামে নেই, অথচ বৈষ্ণব ধর্ম রাধার উপরেই চলছে। এখন কেউ জিজ্ঞেস করল রাধার বরের কি নাম? রাধা আছে কি নেই তার কোন ঠিক নেই, সেই রাধার আবার বরের কি নাম জানতে চাইছে। আবার জিজ্ঞেস করছে, শ্রীরামচন্দ্রকে যে কেভট নদী পার করিয়েছিল, তার কি নাম ছিল? বাল্মীকি রামায়ণের কেভটের ঘটনার কোন বর্ণনাই নেই। তুলসীদাস রামচরিতমানসে এই কাহিনীকে এনে একটা ইমোশানাল বাতাবরণ তৈরী করে লোকেদের আকর্ষণীয় করে দিলেন। লোকেরা এখনও ইমোশানাল রস পান করে যাচ্ছে, আর জানতে চাইছে কেভটের কি নাম।

ঠাকুর এখানে ওই জিনিসটাকেই নিয়ে আসছেন, যার আলোচনা আমরা প্রথমের দিকে করেছিলাম, মানুষ গভীর নিদ্রায় চলে গেল, নিদ্রা থেকে উঠে আসার পর সে বলে, আঃ খুব জোর ঘুমিয়ে ছিলাম, আমার কিছু মনে নেই; একটা স্মৃতি থাকছে। কিন্তু সমাধি গভীর নিদ্রা না, সচেতন ভাবে একটা জ্ঞানের অবস্থায় ঢুকছেন, যা কিছু হচ্ছে সব ওনার মেমরিতে ঢুকে যাচ্ছে। সবচেয়ে সাধারণ যে স্মৃতি যেটা সেখানে থাকে তা হল – তিনি আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ মানে, সেখানে তাঁর আনন্দ উপভোগ হয় না, বলছেন স্বরূপ, স্বরূপ মানে তিনিই আনন্দ, আনন্দ জিনিসটাই তিনি। এই জিনিসগুলিকে ধারণা করা একটু কঠিন।

আমরা যখন রঙ বলি তখন বলি লাল রঙ, নীল রঙ ইত্যাদি, কিন্তু ‘রঙ’ জিনিসটাকে আমরা জানতে পারি না, রঙ হবে সেই বস্তু, যেখান থেকে সব রঙ বেরিয়ে আসছে। ওই একটা বস্তু, যেখান থেকে সমস্ত রঙ বেরিয়ে আসছে, সেটাই হবে রঙ; কিন্তু ও-রকম কোন কিছু হয় না। আমরা বস্তুকে নিয়ে

সুখ পাই, বস্তুকে নিয়ে আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু আনন্দস্বরূপ জিনিসটা কি, আমরা বুঝতে পারব না। একটা জিনিসকে আমরা জানতে পারছি আমাদের চেতনা আছে বলে, সেইজন্য চৈতন্যস্বরূপকে আমরা কোন দিন বুঝতে পারব না। তাহলে কে চৈতন্যস্বরূপকে বোঝেন? একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী বোঝেন। আমরা আনন্দস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ নিয়ে যত কথাই বলে যাই না কেন, এই জিনিসগুলিকে কেউ কাউকে বলে বোঝাতে পারবেন না। ওনারাও জানেন বোঝান যাবে না, সেইজন্য তাঁরা কোন কাহিনী, কোন উপমা দিয়ে বলে বেরিয়ে যান। ঠাকুর বলছেন –

“**সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয় – সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না**”।

সমাধিস্থ মানে, আগে যেটা বলা হল, মন যেখানে একেবারে ডেড, মন থেমে গেছে, পুরোপুরি সাইলেন্ট, এটাকে বলে সমাধি। ঠাকুর এখানে শক্তির কথা বলছেন, কিন্তু আসলে মন ওটাকে ধরতে পারে না বলে মন কিছু বলতে পারে না। ঠাকুর বোঝানর জন্য একটার পর একটা উপমা দিয়ে যাচ্ছেন। খুব নামকরা উপমা নিয়ে আসছেন –

“**লুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছল। (সকলের হাস্য) কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক**”? ঠাকুর নিজের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, কে যেন তাঁকে পাথর বানিয়ে দিল। আবার প্রশ্ন করছেন।

“**সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা কন না**”?

আসলে বেশির ভাগ সমাধিবান ব্যক্তিরা কথা বলেন না। কারণ মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিচার করে করে যখন ওই অবস্থায় চলে গেলেন, তখন সেখান থেকে তিনি আর আসতে চাইবেন না। যেমন গ্রামদেশের কোন গরীব লোক হঠাৎ বিশাল বড়লোক হয়ে গেল, যে গ্রামে কষ্ট করে সে থাকতে, সেখানে সে আর থাকতে চাইবে না। ভারত থেকে যারাই বিদেশে যায়, বেশীর ভাগই বলে যে আর আমি দেশে ফিরে যাব না, ওখানে এত দুঃখ পেয়েছি, এত কষ্ট পেয়েছি। আমরা যে জায়গাতে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি, ওই জায়গাতে আবার আমরা ফিরে যেতে চাই না। কদাচিৎ কখন কেউ যান, ঘুরতে যান, থাকার জন্য কেউ যায় না। ভগবান বুদ্ধও জ্ঞানলাভের পর একবার কপিলাবস্তু গিয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার আর যাননি।

“**শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরাদির প্রতি) – শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার ‘আমি’ রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। এটা একেবারে বাস্তবিক, একেবারেই চুপ হয়ে যান**”। তিনি জেনে গেছেন, কিন্তু কি বলবেন, আর কাকেই বা বলবেন। কেন চুপ হয়ে যান, আমরা যেমন যেমন এগোব তেমন তেমন আরও আলোচনা করা হবে। “**যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার**”। যখনই কেউ ধর্মকে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে নানা রকম কথা বলেন, বুঝতে হবে তিনি এখনও এগুলোর ব্যাপারে জানেন না। “**ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আর একবার ছ্যাঁক কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথ কয়**”।

এখন কে লোকশিক্ষা দেবেন, কে লোকশিক্ষা দেবেন না, আমরা জানি না। ঠাকুর বলছেন, তিনি যাঁকে আদেশ দেন, তিনিই লোকশিক্ষা দিতে পারেন। মা ঠাকুরকে বললেন, ‘তুমি ভাবমুখে থাক’, ঠাকুর বলছেন, তিনি কথা কন। তিনি যে কথা কন, প্রত্যেক ধর্মে আমরা এর বর্ণনা পাই। কাঁচা লুচি আর পাকা লুচির উপমা দেওয়ার পর আবার দুটো উপমা এনে বলছেন –

“যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখন কখন গুনগুন করে।

“পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভকভক শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য) তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়”।

যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁরা আত্মাকে জেনে যান, সাধারণ ভাবে দেখা যায়, তাঁরা চুপ মেরে যান – এই জিনিসটাকেই ঠাকুর দুটো সহজ উপমা দিয়ে বললেন। আমরা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে জানি, তিনি কারুর সাথে কথা বলতেন না। আবার অনেকে আছেন, ভাল আধার দেখলে কথা বলেন। ভাগবতে জড়ভরতের কাহিনী আছে, সেখানেও জড়ভরত কারুর সাথে কথা বলতেন না। কিন্তু রাজা রহূগণের পাত্রতা ছিল, তিনি রাজার পাত্রতা দেখে তাঁকে উপদেশ দিলেন। একেবারেই যে উপদেশ দেন না, তা না, আবার বেশি যে কথা বলেন, তাও না।

মূল বক্তব্য, বিদ্যাসাগর সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কাছে সত্ত্বগুণই শেষ কথা। ঠাকুর হয়ত সেটা জানতেন, হয়ত নাও জেনে থাকতে পারেন, কারণ পরে তিনি বলবেন, সোনা চাঁপা আছে। সত্ত্বগুণ না থাকলে গুণী মানুষ হওয়া যায় না। কিন্তু ওখান থেকে পেরিয়ে ত্রিগুণাতীত হয়ে যাবেন, সত্ত্বগুণেরও পারে চলে যাবেন, বিদ্যা ও অবিদ্যার পারের অবস্থা চিন্তা করতে পারবেন, এই দিকটা বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল। ঠাকুর কথা বলছেন, গল্প করছেন, সেখান থেকে গল্পের ছলে বেদান্তের যে শেষ কথা – ব্রহ্ম যে কি বস্তু এটা মুখে বলা যায় না, এর উপর ঠাকুর আলোকপাত করে বিদ্যাসাগরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ – এই তিনের সমন্বয়

মাস্টারমশাই এই পরিচ্ছেদের শিরোনামে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত এই তিনটের সাথে ‘বাদ’ শব্দটা যুক্ত করেছেন। ‘বাদ’ শব্দটা এখানে যেন একটু বেমানান লাগছে। ‘বাদ’ শব্দ বলতে বোঝায় মত। অদ্বৈত কোন মতবাদ নয়, অদ্বৈত সত্য; সত্য কখন মতবাদ হয় না। তবে তখনকার দিনে এটাই প্রচলন ছিল, সেইজন্য ‘বাদ’ শব্দটা লিখেছেন, কিন্তু এটা ঠিক না, হওয়া উচিত ছিল শুধু অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত – এই তিনের সমন্বয়।

আগের পরিচ্ছেদে ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বলছিলেন। আলোচনা করার সময় আমরা দেখলাম, কিভাবে সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাবার জন্য ঠাকুর অনেক উপমা এনে বোঝাতে চাইছেন। এখন এই জিনিসগুলিকে যিনি অনুভব করে, তিনি তাঁর মত অনুভব করেন। সাধনা ও সিদ্ধি সব সময় এক হয়। আমাদের একটা সাধারণ ধারণা যে, সাধনা আলাদা সিদ্ধি আলাদা। যেমন স্কুলে কলেজে আমরা পড়াশোনা করেছি, পড়াশোনার ফল পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া। পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার ফর ভাল একটা চাকরি, চাকরির ফল মাসের শেষে মোটা মাইনে, মাইনের ফল একটা সুখী সংসার।

ঠিক তেমনি আমরা মনে করি জপধ্যান মানে ঈশ্বরদর্শন। ঈশ্বরদর্শন হলে কি হবে? এক-একজনের এক-এক রকম মত। কেউ বলে ঈশ্বরদর্শন হলে শান্তি হবে। ঈশ্বরদর্শন করে কবে কার শান্তি হল? মহম্মদের ঈশ্বরদর্শন হল, সারা জীবন লড়াই করে গেলেন; যীশুর ঈশ্বর দর্শন হল, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হল, ভগবান বুদ্ধের ঈশ্বরদর্শন হল, তিনি বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করতে থাকলেন, ঠাকুরের ঈশ্বরদর্শন হল, শেষে তিনি নিজের খাবারটুকুও খেতে পারলেন না; ঈশ্বরদর্শনে কার শান্তি হয়! এর থেকে বাজে হল, আমরা মনে করি, জপধ্যান করলে আমরা ঈশ্বরের দর্শন পাব। জ্ঞান কখন কোন

কর্মের অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ কার্য-কারণের সম্পর্ক নেই। তার মানে, আপনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, আপনি জপধ্যান করছেন, আপনি তপস্যা করছেন, আপনি যাই করুন, এগুলো দিয়ে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ঈশ্বরদর্শন হওয়া মানে, মনের চাঞ্চল্য শূন্য হয়ে যাওয়া। তাহলে যোগ সাধন করলে ঈশ্বরদর্শন হবে? না, তাতেও হবে না। যোগ হল সেই পথ, যে পথ অবলম্বন করলে আপনি যা, সেটা আপনাকে দেখিয়ে দেবে, এর বেশি কিছু না।

ঈশ্বরদর্শন মানে আপনি যা, সেটাকে জেনে যাওয়া। তাহলে যীশু কি জানলেন? তিনি ঈশ্বরের সন্তান। তাঁর সাধনা কি ছিল? ঈশ্বরের সন্তান। সাধনা করে কি দেখলেন? দেখলেন তিনি ঈশ্বরের সন্তান। কি শিক্ষা দিলেন? ঈশ্বরের সন্তান। মহম্মদ দেখছেন, তিনি আল্লার সেবক। তিনি কি দেখলেন? আমি আল্লার সেবক। কি শিক্ষা দিলেন? আল্লার সেবক। ভগবান বুদ্ধও তাই, তিনি নেতি নেতি করে সাধনা করে গেলেন, সব ছেড়ে দিলেন। তাঁর সিদ্ধি কি? নির্বাণ। তিনি কি শিক্ষা দিলেন? নির্বাণ, পূর্ণত্যাগ। ঠাকুর সাধনা করলেন, তিনি মা কালীর সন্তান। তাঁর জ্ঞান কি হল? আমি মা কালীর সন্তান। সাধনা যা, সিদ্ধিও তাই হয়, আলাদা করে নূতন কিছু হয় না। এটা বোঝান প্রায় অসম্ভব। আপনি যেটা দিয়ে সাধনা শুরু করেছেন, যদি সাধনা শুরু করে থাকেন, সাধনা তাই হবে, সিদ্ধিও তাই থাকবে, আর সিদ্ধি ওটারই হবে, আর ওটারই আপনি শিক্ষা দেবেন, নূতন করে কোন উপলব্ধি হয় না। থিয়োরেটিক্যালি আপনি যেটা জানেন, প্র্যাক্টিক্যালি সেটাই হবে, এ-ছাড়া আর কিছু হবে না।

আচার্য শঙ্কর নেতি নেতি দিয়ে সাধনা করলেন, জ্ঞানও নেতি নেতি – অদ্বৈতম্। বিশিষ্টাদ্বৈতের রামানুজ, তিনি ভগবান বিষ্ণুর ভক্তি দিয়ে সাধনা করলেন, সাধনা করে তিনি তাই পেলেন। যে কোন সাধক যে-রকম সাধনা শুরু করবেন, সিদ্ধি তাই হবে, শিক্ষাও তিনি তাই দেবেন। মাণ্ডুক্যকারিকাতে খুব সুন্দর বলছেন, গুরু শিষ্যকে যে ভাব বা পথ দেখিয়ে দেন, সেটাই তার সাধনা হয়, সেটাই তার সিদ্ধি হয়, সেটাই তাকে রক্ষা করে, সবটাই তাই। এখন অনন্তের যে সাধনা হবে, সেই সাধনার পথ যে কোন একটা পথ হতে পারে না, সম্ভবই না। ফলে সাধনা অনন্ত ভাবে হবে, সাধনা অনন্ত ভাবে হবে বলে সিদ্ধিও অনন্ত হবে। তাহলে কোন পথটা ঠিক? সব পথই ঠিক। তাহলে কি খ্রীশ্চান ঠিক? পুরো ঠিক। ইসলামও ঠিক, সব পথই ঠিক।

এই জায়গাতে এসে বিদেশীরা এটাকে নিতে পারে না। কারণ এদের পরম্পরা নেই কিনা। একটা রাগ বাজাতে পারে, একটা ধুনই বাজিয়ে যাবেন, তার বাইরে আর কিছু পারবেন না। এবারে আমরা যদি ধর্মগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করতে শুরু করি, দেখা যাবে অনেক সম্প্রদায় বেরিয়ে আসছে। যেমন খ্রীশ্চান ধর্মে শত শত সম্প্রদায় আছে। ইসলামে আমরা সাধারণ ভাবে সিয়া ও সুন্নি এই দুটো সম্প্রদায়ের নাম করি, কিন্তু তা না, এই দুটোর বাইরে শত শত সম্প্রদায় আছে। আমাদের এখানে ওই ভাবে সম্প্রদায় হয় না, ওদের যে sect, আমরা যে সম্প্রদায় শব্দটা নিয়ে থাকি, যেটাকে মাস্টারমশাই তাঁর ক্যাপশানে 'বাদ' বলছেন, দুটো এক না। ওনাদের হল, সত্য হলেন যীশু; কিন্তু কদিন পর ভেঙে দুটো হয়ে গেল; পরে পরে ওই দুটো ভেঙে চারটে হয়ে গেল। একজন গণিতজ্ঞ হিসাব করেছিলেন যে, প্রত্যেক তিরিশ বছর পর প্রত্যেক রিলিজিয়াস গ্রুপ ভেঙে যায়।

হিন্দুদের এভাবে হয় না, হিন্দুদের দর্শনগুলি যদি ভাল করে পড়া হয়, তাহলে দেখা যাবে কদাচিৎ এই ধরণের ভাঙন এসেছে। কারণ একটা নূতন সম্প্রদায়কে হিন্দুরা কখনই মানবে না, যদি না ওই সম্প্রদায়ের আগে থেকে কোন পরম্পরার সাথে সম্পর্ক না থাকে। আলাদা কোন সম্প্রদায় হয়ে গেলেও ওরা ওদের উৎসটাকে ছেড়ে দেয় না। আচার্য শঙ্কর, তিনিও তাঁর সম্প্রদায়কে গুরু পরম্পরায় নিয়ে যান – গোবিন্দপাদ, গৌড়পাদ হতে হতে সাক্ষাৎ ব্যাসদেব পর্যন্ত নিয়ে যান। রামানুজ, মাধ্বাচার্যরাও ঠিক সেই ভাবে নিয়ে চলে যান। আর শেষে সবাই বেদের যিনি ঋষি, সেই ঋষির কাছে

নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। আমরা মোটামুটি এই তিনটে বলি – দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। এনাদের বাইরে আরও আছে, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদ ইত্যাদি অনেক দর্শন আছে।

ঠাকুর সব কটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন। হিন্দু ধর্মে অনেক ঋষিদের আবির্ভাব হয়েছে, সেইজন্য ঋষিদের কথাও অনেক। ঋষিদের কথাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলে মনে হয় হিন্দু ধর্মও অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই, একই কথা সবাই বলছেন, আমরা বুঝতে পারি না, আমরা বুঝতে পারি না বলে আমাদের অশান্তি লাগে। ব্যাসদেব এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঋষিদের সব কথাকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। শঙ্করাচার্য এসে আবার পুরো জিনিসটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। এবার ঠাকুর এসে আবার হিন্দু ধর্মের সব কিছুকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। হিন্দুদের কত মত – শাক্ত মত, বৈষ্ণব মত, শৈব মত, দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত; ঠাকুর সব কিছুকে একটা জায়গাতে নিয়ে এলেন। এরপর ঠাকুর বলছেন –

“শ্রীরামকৃষ্ণ – ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না”।

এখানে আমাদের একটু বোঝার আছে। বিষয়বুদ্ধি যদি একটুও না থাকে আপনি এগোতেই পারবেন না, আবার অন্য দিকে বুদ্ধি যদি একটু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে ধর্মের শেষ কথা জানা যাবে না। পোলভল্টে একটা পোল নিয়ে দৌড় লাগাতে হবে, প্রথমে পিছনের দিক থেকে দৌড় শুরু করবে, সব জায়গাগুলি ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যাচ্ছে, শেষে যে জায়গাতে লাফ মারবে, সেখানে এসে পোলটাকে ধরে জাম্প দেবে, জাম্প দেওয়ার পর পোলটাকেও সে ছেড়ে দিচ্ছে, পোলটা না থাকলে সে জাম্প মারতে পারবে না, কিন্তু জাম্প দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পোলটাকেও ছেড়ে দিচ্ছে, পোলটাকে না ছাড়লে সে জাম্প মারতেও পারবে না। পোলকে ধরে না রাখলে সে জাম্প মারতে পারবে না, ধরে থাকলেও সে ওই উচ্চতাকে অতিক্রম করতে পারবে না। বুদ্ধি না থাকলে ধর্ম হবে না, বুদ্ধিকে ধরে থাকলে ধর্মের শেষ কথা জানতে পারবে না। ঠাকুর যে বিষয়বুদ্ধির কথা বলছেন, এই বিষয়বুদ্ধি প্রথম অবস্থার কথা। সাধারণ লোকেরা শুনলে বুঝতে পারবে না, তাই প্রথম অবস্থা নিয়েই বলছেন।

“ঋষিরা কত খাটত। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শোনা, ছোঁয়া – এ-সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখত, তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করত”।

এখানে ঠাকুর তিন-চারটে বিষয় উল্লেখ করছেন। বলছেন, কত খাটত। একজন সাধক আর একজন গৃহস্থ, দুজনের জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। সাধক ঈশ্বরের ব্যাপারে খাটে, জগৎকে ছেড়ে দিয়ে অজগর বৃত্তি নিয়ে থাকেন, যেমন আসবে তেমনটাই নেবেন। গৃহস্থ সংসারের ব্যাপারে খাটে আর ঈশ্বরের ব্যাপারে অজগর বৃত্তি – তিনি যখন কৃপা করবেন তখন হবে। কোন একটা বিশেষ দিন, যেমন শিবরাত্রি, বা ঠাকুরের জন্মতিথি, না করলেই নয়, আচ্ছা একটু মঠে গেলাম, একটু খিচুরি খেলাম, যেটুকু না করলেই নয়, সেটুকু করে দিচ্ছে। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, কোন জায়গাতে আপনি দুটো হাত ছেড়ে রেখে দিয়েছেন – জাগতিক ব্যাপারে না ঈশ্বরীয় ব্যাপারে? যদি জাগতিক ব্যাপারে ছেড়ে থাকেন, তাহলে আপনি একজন সাধক। ঈশ্বরীয় ব্যাপারে যদি ছেড়ে থাকেন তাহলে আপনার মনটা সংসারে ডুবে আছে। আপনি বলতে পারেন, আমি দুটোকেই ধরে রেখেছি, একটু ওটা, আরেকটু ওটাও। না, ওভাবে হয় না।

এই যে ঠাকুর বলছেন, ঋষিরা কত খাটত। কোন ভক্ত এসে যদি বলে, মহারাজ আমি অমুক মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, সারাদিন কতক্ষণ জপ করেন আর আসনে বসে কতক্ষণ ধ্যান করেন? তখন দেখা যাবে, অতক্ষণই জপ করেন, যতটুকু করলে মন্ত্রটা মনে

রাখা যাবে। দীক্ষা নেওয়া কেন? খাটবার জন্য। ওই মন্ত্রকে নিয়ে খাটতে হবে, যদি না খাটেন তাহলে দীক্ষা নেওয়ার কোন অর্থই হয় না। আর এই যে বলছেন, তাঁরা ব্রহ্মকে বোধে বোধ করতেন। আগে আমরা যখন ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ঠাকুর একই দিনে কথাগুলো বলছেন, আমাদের ক্লাশগুলো অনেকদিন পরে পরে হচ্ছে বলে মনে হতে পারে ঠাকুর অন্য দিন বলেছিলেন। বোধে বোধ করতেন, কিন্তু আমরা বলছি ব্রহ্মজ্ঞান, শব্দটা জ্ঞান কিন্তু জ্ঞান হয় না, ওটা বোধে বোধ হয়। গভীর নিদ্রা থেকে ব্যুত্থিত হয়ে মানুষ বলে, আমি সুখে ছিলাম, ওখানেও একটা বোধ হচ্ছে, কারণ তখন একটা অজ্ঞানের অবস্থায় থাকে। ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হল, এটা না বলে বলছেন, বোধে বোধ হয়।

"কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ-অবস্থায় 'সোহহং' বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ-অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়'।

বিদ্যা-অবিদ্যা দিয়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের উপর বলতে শুরু করেছেন। এবার ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনার কথা বলছেন, ব্রহ্মের পথ নেতি নেতি পথ। ধর্মের কথা যতই আমরা আলোচনা করি, যতই বলি, তাতে আমরা সাক্ষাৎ কোন ফল পাব না। মনে মনে ভাবছি, বাজার গেলাম, সবজি কিনে আনলাম, সবজি কাটলাম, রান্না করলাম, রান্না করে খেতে বসলাম, খাচ্ছি। এতে কি আমার পেট ভরে যাবে, একটুও না। পেট ভরাতে হলে আমাকে সশরীরে বাজারে যেতে হবে, বাজার থেকে সব কিনে শারীরিক ভাবে রান্না করতে হবে, তবেই বাস্তবিক খেয়ে আমার তৃপ্তি হবে। মানসিক তৃপ্তির জন্য আমরা মনে মনে সব কিছু করতে পারি।

ধর্মজীবনেও খাটতে হয়। অনন্ত পথ আমরা বলি ঠিকই, কিন্তু হিন্দুরা সব সাধনাকে মিলিয়ে মোটামুটি তিনটে সাধনার পথের কথা বলেন – ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং রাজযোগ, যেখানে সত্যিকারের খাটতে হয়। কর্মযোগ হল প্রস্তুতিমূলক আর অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাকে কর্মযোগ বলা হয় ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে যোগ ছাড়া এগোন যায় না। আচার্য শঙ্কর সেইজন্য বহিরঙ্গ সাধন আর অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলছেন, যোগকে বলছেন অন্তরঙ্গ সাধন। যতক্ষণ আমরা বাইরের কাজ করছি, বাইরের কাজ মানেই কর্মযোগ, যাকে আমরা বহিরঙ্গ সাধন বলছি। মনকে কেন্দ্রিত করে যত সাধনা হয়, সব সাধনাই অন্তরঙ্গ সাধন, অন্তরঙ্গ সাধন মানেই যোগ। যোগ সাধনকে যদি রাজযোগের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলেও দুই প্রকার সাধন হয়।

আর জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ তিনটেকে যদি আলাদা করে দেখা হয়, তাও অর্থ একই হবে। হয় ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বরকেই আমরা ধরে আছি; ঠাকুর ছাড়া আমি আর কোন দিকে মন দেব না। ভক্ত বলছে ঈশ্বর বৈ আমি আর কিছু জানি না, ধ্যানের সময় আমি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করব না। জ্ঞানী অন্য রকম ভাবে করেন, জ্ঞানী বলেন, মনে যে কোন চিন্তা এলে আমি তাকে ফেলে দেব। যোগ প্রথমে মনের একাগ্রতার শিক্ষা দেয়, যোগ এদিকেও যায় না, ওদিকেও যায় না। তবে যোগ এটাও বলছেন, ভক্তি দিয়েও এটা হয়, ওঁ এর উপর ধ্যান করলে হয়; কিন্তু যোগের মূল সাধনা মনকে কেন্দ্রিত করা। জ্ঞানীরা নেতি নেতির সাধনা করেন, ওটাও ধ্যান। জ্ঞানী ধ্যানে বসে ঠিক করে নেন, ব্রহ্ম চিন্তন ছাড়া যে কোন চিন্তাকে আমি ছেড়ে দেব। জ্ঞানী সচেতন ভাবে ধ্যান না করে বিচার করেন। যোগ আর জ্ঞানযোগ, দুটোতে এই টেকনিক্যাল পার্থক্য থাকছে।

যোগ মনকে কেন্দ্রিত করায়, যেমন একটা ফুলের উপর, কিংবা উদিত সূর্য কিংবা প্রদীপের আলো বা ইষ্ট চিন্তন, যে কোন একটা বস্তুর উপর মনকে কেন্দ্রিত করে। জ্ঞানী কোন বস্তুকে নেন না, তাঁরা গুরুর কাছে একটা মহাবাক্য পেয়ে গেছেন, তত্ত্বমসি বা অহং ব্রহ্মাস্মি, এই ধরণের কোন

মহাবাক্য, এখন তিনি চিন্তা করছেন, আমি সেই ব্রহ্ম। এবার ব্রহ্ম ছাড়া যে কোন চিন্তা যখনই আসবে, সেটাকে ফেলে দেবেন। অনেকের মনে হতে পারে, এটা তো ভক্তিপথই হয়ে গেল। না, একটা তফাৎ আছে। জ্ঞানপথের সাধনা মূলতঃ নিরাকার সাধন, নিরাকার সাধনে ওই ভাবে মনের ফোকাসিং হয় না, শুধু বিচার করে করে সব কিছুকে ফেলে দিতে হয়।

ভক্তিযোগে কি হয়, যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁরা একটা মন্ত্র পেলেন, মন্ত্রে ইষ্টের একটা রূপ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভক্ত সেই রূপের উপর ধ্যান করেন আর বাহ্যিক জীবনটাও সে-ভাবেই চালান। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ, তিনটে যেন একই। কিন্তু প্রথমে শুরু করার সময় কোথাও একটা তফাৎ আছে বলে মনে হয়। যদিও আসল তফাৎ কিছু নেই, কারণ তিনটেতেই শেষ পর্যন্ত এই জগৎকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তিনটেতেই ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হতে হচ্ছে, তিনটেতেই মনকে ফোকাস করা হচ্ছে একটি মাত্র চিন্তার উপর, তিনটেতেই আমিত্বের নাশ করতে বলা হয়। তিনটের মধ্যে গুণগত ভেদ কিছু নেই, বিস্তারে দেখতে গেলে সামান্য কিছু তফাৎ নজরে আসে।

এবার বলছেন, যারা নেতি নেতি করে, তার মানে *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমিই সেই *চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্*। কিন্তু যেই ওখান থেকে মন নামল, খাওয়ার সময় একটু ডান দিক থেকে বাম দিক হয়ে গেলে আগুন লেগে যাবে। তোতাপুরি ঠাকুরের সাথে ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা করছেন। সেই সময় দক্ষিণেশ্বরের এক কর্মচারী তাঁর পবিত্র অগ্নি থেকে আগুন নিয়ে যাচ্ছে কলকে ধরাবে বলে। তোতাপুরি রেগে গিয়ে চিমটে দিয়ে তাকে মারতে গেছেন। সবই ব্রহ্ম, এই ভাব ধরে রাখা যায় না। সবই যদি ব্রহ্ম হয়, তাহলে আপনি কেন ওকে চিমটে দিয়ে মারতে যাচ্ছেন? সবই ব্রহ্ম, এই ভাব সর্বদা বজায় রেখে জীবন চালানো অসম্ভব, বিশেষ করে যাদের একটুও শরীর বোধ আছে। যার জন্য ঠাকুরের অদ্বৈত সাধনার সময় দেখা যেত, তাঁর শরীর বোধ বলে কিছু ছিল না।

গিরিশ ঘোষ এক জায়গায় বর্ণনা দিচ্ছেন, তিনি আর স্বামীজী দুজনে মিলে পঞ্চবটীতে ধ্যান করছেন। মশার উৎপাতে গিরিশ ঘোষ বসতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে দেখছেন, স্বামীজীর সমস্ত শরীরে মশা এমন ভাবে ছেঁকে ধরেছে যে, মনে হচ্ছে স্বামীজী যেন একটা কালো কম্বল মুরি দিয়ে ধ্যান করছেন, অথচ স্বামীজীর কোন হুঁশ নেই। ঠাকুর বলছেন, পঞ্চবটীতে ধ্যান করছেন, সাপ ঠাকুরের গায়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কাঠ মনে করে। ঠাকুর এমন ধ্যানে ডুবে আছেন যে, পাখিগুলি এসে ঠাকুরের চুলের ভিতর খাবারের দানা খুঁজছে। এই রকম শরীর বোধ না চলে যাওয়া পর্যন্ত নিরাকার সাধনা, সাকার সাধনা কোনটাই হবে না।

সমস্যা হল, সন্ন্যাসী মানেই তাঁকে জ্ঞানচর্চা করতে হবে। হরিদ্বার থেকে যত উপরে যাবেন, সব সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানচর্চা করছেন, কিন্তু সব কটাই অহঙ্কারের একটা ঢিপি। একটি বেদান্তী সন্ন্যাসী পাওয়া যাবে না, যাঁর অহঙ্কার নেই। আর বেদান্তী সন্ন্যাসী মানে, আকাশসে বায়ুকা জনম্ হুয়া, এমন ভাবে বলবেন যে, মনে হবে তিনিই যেন সৃষ্টিকে জন্ম দিচ্ছেন, কারণ সেটাই তাঁর সাধনা। তাঁর সাধনা হল – আমার থেকেই সমস্ত জগৎ বেরিয়েছে। চারবার ওটা ভেবে নিল, ব্যস্ ওটাই এখন মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু হয়ে যায়।

হিন্দির খুব নামকরা সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের 'নেশা' নামে একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। কাহিনীতে দেখাচ্ছেন, একটি সাধারণ ছেলে কলেজে পড়ে, তার বন্ধু এক বড় জমিদার বাড়ির ছেলে। ছেলেটি ছুটিতে সেই জমিদার বন্ধুর বাড়িতে ঘুরতে গেছে। সাধারণ বাড়ির ছেলেকে কি করে বন্ধু বাড়ির সবার সাথে পরিচয় করাবে, সেইজন্য বলে দিল, আমার এই বন্ধুটিও বড় জমিদার পরিবারের ছেলে, কিন্তু ও গান্ধীবাদী বলে খুব সাদাসিধে জীবন-যাপন করে, সেইজন্য ফতুয়া পাজাম পড়ে থাকে। এখন বাড়ির চাকর-বাকর যারা আছে সবাই তাকে জমিদার বাড়ির ছেলে মনে করে খুব খাতির-যত্ন করতে লেগে গেছে। ওই রকম খাতির করছে দেখে ধীরে ধীরে ওর মধ্যে এই ভাবটা খুব জোর পেয়ে গেল –

আমি জমিদার। ধীরে ধীরে তার degradation হতে আরম্ভ হল। সত্যি সত্যি তার মনে হতে শুরু হল, আমিও জমিদার।

ছোট্ট গল্প, কিন্তু ওর মধ্যেই লেখক আমাদের মনের স্বাভাবিক একটা পরিণতি খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদেরও ঠিক এটাই হয়, যেটার জন্য আমি যোগ্য নই, সেটাই যদি গায়ের জোরে আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিছু দিন যেতে না যেতেই ধীরে ধীরে আমি ওটাকেই আপন করে নিয়ে নেব, আমি এই। তারপর বাইরে যখন ব্যবহার করতে শুরু করলাম, তখন আমার অহঙ্কার ফেটে বেরোবে। ভিতরে উপলব্ধি নেই, অথচ বাইরে আমি নিজেকে জ্ঞানীর মত জাহির করে যাচ্ছি, এটাই সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সত্যিই এগুলো বিরাট সমস্যা। যেমন বৈষ্ণবরা নিজেদের দীন, হীন, কাঙালী বলে দেখাবেন আর সব জায়গায় বিনয়ের ভাব দেখাবেন। বিনয়েরও অহঙ্কার হয়, সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু বেদান্তী মানে একেবারে অহঙ্কারের একটা বিরাট গ্যাস বেলুন।

আমি হিমালয়ে অনেক দিন ছিলাম, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বাইরে আমি অনেক সন্ন্যাসীকে দেখেছি, একজন বেদান্তী সন্ন্যাসী দেখিনি, যাঁর মধ্যে বিরাট একটা অহঙ্কারের ঢিপি নেই, এমন কোন সন্ন্যসী দেখিনি যাঁর মধ্যে একটু বিনয় আছে। এই সমস্যাটা থাকবে, কারণ physical reality আর spiritual realityতে mismatch হয়ে যায়। সাধনা নেই, কিন্তু তত্ত্ব জেনে গেছে, সেবক হওয়ার আগেই সেব্য হয়ে গেছে। সেবক হওয়ার আগে সেব্য হয়ে গেলে এই সমস্যাই হয়। এখনও সে অর্ডার দিতে শেখেনি, কিন্তু অর্ডার দিতে শুরু করে দিয়েছে।

ঠাকুর এই সব কিছুকে মিলিয়ে বলছেন – যখন অন্নগত প্রাণ, শরীরে মন পড়ে আছে, এই অবস্থায় যদি মনে করতে শুরু করে অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্বনাশকে ডেকে আনছে। ষোল সতের বয়সের টেররিস্টদের হাতে বন্দুক তুলে দিচ্ছে, আর সে মনে করছে যে কোন লোকের জীবন-মরণ এখন আমার হাতে, কেয়ারলেস হয়ে যায়। ট্রেনিং প্রাপ্ত মিলিটারিরা কখন কেয়ারলেস হবে না, তারও হাতে বন্দুক আছে, কিন্তু যেখানে সেখানে বন্দুক চালাবে না। সেইজন্য বলছেন, এর থেকে 'আমি ঈশ্বরের দাস' হওয়া আপেক্ষিক ভাবে অনেক ভাল। এরপর বলছেন –

"**জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি – সেই ইট, চুন, সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারি। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ**।

"**ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না, তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান**"।

বেদান্তে জ্ঞান ও জ্ঞানী প্রচণ্ড সংশয়াত্মক শব্দ। জ্ঞান, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী এই শব্দগুলি আচার্য শঙ্করের কাছ থেকেই নেওয়া, ঠাকুরও ওখান থেকেই এই শব্দগুলো নিচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর জ্ঞানী শব্দটা অনেক কিছুর জন্য ব্যবহার করছেন। যেমন বলছেন, যে নেতি নেতি বিচার করতে শুরু করেছে সেও জ্ঞানী। আমরা যেমন যাঁরা পিএইচডি করেছেন তাঁদের বলছি স্কলার, যে ক্লাশ ফাইভে পড়ছে তাকেও স্কলার বলা হয়। ভারত সরকারের নোটিফিকাশানে একটা শব্দ ছিল মেড স্কলার, অথচ ক্লাশ ফোর ফাইভের ছাত্র। যে বিদ্যা চর্চা করছে সে-ই স্কলার, টেকনিক্যালি স্কলার। কিন্তু আমরা জানি যতক্ষণ পিএইচডি না করছে, মাস্টার ডিগ্রি না পায় ততক্ষণ সে স্কলার নয়। আবার যিনি বিচার করে করে

তাত্ত্বিক ভাবে একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন, যেখানে তিনি দেখছেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, তিনিও জ্ঞানী। আর যিনি আত্মাকে সচ্চিদানন্দ রূপে সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন, তিনিও জ্ঞানী। আচার্য শঙ্কর এই তিনজনকেই জ্ঞানী বলছেন।

গীতাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দ অনেক জায়গায়ে এসেছে। আচার্য শঙ্কর তখন সেখানে জ্ঞানীকে ব্যাখ্যা করছেন, যিনি থিয়োরেটিক্যালি পুরো জিনিসটাকে জেনে গেছেন। আর বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যিনি বিশেষ রূপে জেনে গেছেন, যাঁর ওই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। ঠাকুর যখন এখানে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী বলছেন, তিনি তফাৎটা নীচের দিকে না করে উপরের দিকে করছেন। উপরের দিকে করা মানে – এই যে আমরা নেতি নেতি বলছি, তার মানে যখন সাধনা করছে, তখন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। অহং ব্রহ্মাস্মি যখন চিন্তা করছে, চিন্তা করতে করতে জগৎ খসে পড়ে গেল, শেষে থেকে গেল অহং ব্রহ্মাস্মি শুধু এই চিন্তা। এরপর ওটাকেও যদি ছেড়ে দিতে পারে, ঠাকুর বলছেন, নেতি নেতি করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে, ওই জায়গাতে এসে মন থেমে গেল। কারণ এরপর আর কিছুই আসবে না, জগৎকে আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, চিন্তা-ভাবনা আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর আমিই ব্রহ্ম, শুদ্ধ ব্রহ্ম, এই ভাবটাও খসে পড়ে গেল। তাহলে আপনি তো জেনে গেলেন, যেটা পাওয়ার জন্য মানব জীবন, সেটা তো পেয়ে গেলেন, আপনার তো সব হয়ে গেল, আর কিছু তো আপনার লাগবে না। ঠাকুর এনাদের বলছেন জ্ঞানী, আচার্য শঙ্করও সাধারণ অবস্থায় বলছেন জ্ঞানী।

কিন্তু বিজ্ঞানী শব্দটা যখন আসে, তখন আচার্য শঙ্কর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী শব্দটা পাল্টে দেন। ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর হয়েছে, ব্রহ্ম দর্শন যাঁর হয়েছে তিনি জ্ঞানী। কিন্তু সেই ব্রহ্মই জীবজগৎ হয়ে আছেন, এই অবস্থাটাকে ঠাকুর বলছেন বিজ্ঞান। কিন্তু আচার্য শঙ্কর ওই জায়গাতে তফাৎ আনছেন না, যিনি শুধু ব্রহ্মই আছেন, বাকি সব মায়া প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন, এনারা জ্ঞানী আর বাকিরা বিজ্ঞানী – এই ভাষা আচার্য ব্যবহার করছেন না। আচার্য শঙ্করের কাছে – যাঁর এই জ্ঞান হয়েছে, ব্রহ্মই বস্তু বাকি সব অবস্তু, তিনি তখনই এটাকে জ্ঞানী বলছেন যখন গীতাতে শুধু জ্ঞানী শব্দ আছে, যখন গীতাতে বিজ্ঞানী শব্দ আসছে তখন বিজ্ঞানীই বলছেন, কিন্তু ওই দুটোতে তফাৎ বলে কিছু নেই।

যিনি জ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করছেন, তিনি সমস্ত জগৎকে ফেলে দিচ্ছেন। একটু আগে বলা হল, সাধনা যা সিদ্ধিও তাই। এখন ইনি সেইভাবে সাধনা করেছেন, তাই তাঁর কাছে সিদ্ধি হবে – ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা, এর মানে দাঁড়ায়; এই জগতের সব কিছুই মিথ্যা, তোমার পড়াশোনা মিথ্যা, তোমার জপধ্যান মিথ্যা, জীবন-মৃত্যু মিথ্যা, ধর্ম-অধর্ম মিথ্যা, নিজের যে শরীর এই শরীরটাও মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা। তাহলে সত্য কি? ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু সত্য না। ঠিকই বলছেন, ভুল কিছু বলছেন না।

এই জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য স্বামীজী দেববাণীতে সমুদ্র আর ঢেউ এই দুটো উপমাকে বার বার নিয়ে আসছেন। সেখানে তিনি বলছেন, ঢেউ দেখলে সমুদ্র দেখা যায় না, সমুদ্র দেখলে ঢেউ দেখা যায় না। কারণ মন একটা চিন্তার পরে আরেকটা চিন্তাতে যায়, মন কখন একই সাথে দুটো চিন্তাকে নিতে পারে না, যার জন্য হয় সে ব্রহ্মকে দেখবে, নয় জগৎকে দেখবে। হয় সমুদ্র দেখবে, নয় ঢেউ দেখবে, দুটো এক সঙ্গে দেখতে পারবে না। কদাচিৎ কেউ কখন ওই রকম মন নিয়ে আসেন, যিনি একই সঙ্গে সমুদ্রকেও দেখেন ও ঢেউকেও দেখতে পারেন। আমরা সমুদ্র ও ঢেউএর কথা বলছি, মনটাও আমাদের দীঘা বা পুরীর সমুদ্রের তীরে চলে গেছে। মনে মনে পুরীর সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালে আপনার মনে একটা তরঙ্গায়িত ছবি চলে আসবে। আপনি বলবেন, আমি সমুদ্র আর ঢেউ দুটোই তো দেখছি। প্রথম কথা, আপনি দুটো এক সঙ্গে দেখছেন না, আপনি একটা ছবি দেখছেন। আর যদি আপনি ওটাকে alive চিন্তা করেন, তখন দেখবেন হয় আপনার সমুদ্র বোধ থাকবে, নয় তরঙ্গের বোধ থাকবে। যদি দুটোই থাকে, তাহলে বুঝবেন আপনার মন এত চঞ্চল, সমুদ্র আর ঢেউ এত দ্রুত আসছে

যাচ্ছে যে, আপনি ধরতেও পারছেন না যে দুটো আলাদা জিনিস। মন একটু শান্ত হলে বুঝতে পারবেন – ও! এটা সমুদ্র, ওটা ঢেউ। মন আমাদের এত চঞ্চল যে ওই তফাৎটা আমরা করতে পারি না। মন কক্ষণ একটার বেশি দুটো বিষয়কে নিতে পারে না। কেউ যদি বলে, আমি এক সঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা নিয়ে আছি, বুঝতে হবে তার মন এত চঞ্চল যে, সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে সে এতো চিন্তা করছে যে, সে বুঝতেও পারছে না।

যিনি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন, তিনি ওই আনন্দে এত ডুবে যান, এমন জ্ঞান তাঁর হয় যে, জগৎটা তাঁর কাছে খেলো হয়ে যায়। কদাচিৎ কেউ কখন আসেন, যিনি ওই অবস্থা থেকে নেমে এসে দেখলেন, যে জিনিসগুলিকে আমি ছেড়ে গিয়েছিলাম, এগুলোও সেই ব্রহ্ম।

এবার আপনি সমুদ্র আর ঢেউ ছেড়ে দিন। আপনি চিন্তা করুন, মিষ্টি দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈয়ার করা হয়েছে, যেমন অনেকে ছানা দিয়ে পালকির সন্দেশ বানিয়ে দিচ্ছে, আপনি হয় পালকি দেখবেন, নয় সন্দেশ দেখবেন, দুটো এক সঙ্গে দেখতে পারবেন না। যার সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছে, সে দেখতে যাবে না পালকির ডাণ্ডা খাচ্ছে নাকি পালকির দরজা খাচ্ছে। যিনি সন্দেশ খেতে এসেছেন, তাঁর ভারি বয়ে গেছে ওটা পালকি রূপে আছে, না কি অন্য কোন রূপে আছে, আমাকে সন্দেশ খেতে হবে, এখন সন্দেশ যে রূপেই থাকুক তাতে কিছু এসে যায় না।

ব্রহ্মজ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনি জগৎকে ছেড়েই ওখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ঠাকুর এনাদের বলছেন জ্ঞানী। যাঁরা ওখান থেকে নেমে এসে দেখছেন এই জগৎটা সচ্চিদানন্দময়, তাঁদের ঠাকুর বলছেন বিজ্ঞানী। আচার্য শঙ্কর এটাকে কোথাও তফাৎ করেননি, মূল বেদান্তেও এটার কোন তফাৎ হয় না। আচার্য শঙ্কর হয় দুটোকেই জ্ঞানী বলেন, নয় দুটোকেই বিজ্ঞানী বলেন। কারণ গীতাতে ওই টপিকটা আসে না, তবে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে যে শ্লোকগুলি আসছে, যেমন *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ*, যেখানে বলা হচ্ছে, এখানেও জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর তফাৎ করছেন না। কিন্তু ঠাকুর এই জায়গাতে এই অর্থে তফাৎ আনছেন, সব কিছু মিথ্যা বলাটা ঠিক না।

এই জায়গাতে ঠাকুরের একটা বড় অবদান এই জন্য যে, ভারতবর্ষে অনেক সর্বনাশ, অনেক ক্ষতি হয়েছে শুধু এই জগৎটা মিথ্যা, ত্রিকালমে জগৎ নেহি হ্যায়, এই একটি কথা বলে। কি রকম? জগৎ মিথ্যা। তাহলে মানুষের যে এত দুঃখ-কষ্ট? এগুলো মিথ্যা। মানুষ যে অনাহারে, দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরছে, বিনা চিকিৎসায় মরছে, এগুলো? মিথ্যা। এত অশিক্ষা, এত দারিদ্রতা, এটা? মিথ্যা। ভারতে এত দুর্নীতি, এত ঠকবাজ, জোচ্চর? এগুলো মিথ্যা। ঠাকুর এটাকে categorization করে দিচ্ছেন, তুমি যে মিথ্যা বলছ, ভুল কিছু বলছ না; এর থেকেও একটা উঁচু অবস্থা আছে। সেটাই হল বিজ্ঞানীর অবস্থা, যেখানে তুমি দেখবে, সচ্চিদানন্দই সব কিছু হয়েছেন। তুমি যে মিথ্যা বলছ, এটাকে না করার কিছু নেই। কিন্তু জানবে, তুমি যেটাকে মিথ্যা বলছ, ওর নাম আর রূপটা মিথ্যা।

উপনিষদেও বার বার এটাই বলছেন, নাম আর রূপ মিথ্যা। যেমন সোনা আর সোনার গয়না; গয়নার যে নাম ও রূপ ওটা মিথ্যা, আসলে ওটা সোনা। কিন্তু নাম আর রূপের জন্য আমরা ওটাকে একটা আলাদা জিনিস দেখছি। ঠাকুর স্বামীজী এসে এই দৃষ্টিভঙ্গীটাকে পালটে দিলেন, বলছেন, নাম রূপটা মিথ্যা কিন্তু সবটাই সোনা। সবটাই যে সোনা, এই জ্ঞান এখনও তোমার হয়নি, তাই নারায়ণ রূপে পূজা কর, নারায়ণ রূপে তার সেবা কর।

ঠাকুরের সাথে স্বামীজীর অনেকবার এই কথা হয়েছে। স্বামীজী বলছেন, সচ্চিদানন্দ সাগরে রস খেতে গেলে আমি ডুবে যাব। ঠাকুর বলছেন, তুই অমর হয়ে যাবি। স্বামীজী আবার বলছেন, আমি সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই, তার মানে স্বামীজী জ্ঞানীর অবস্থাতে থাকতে চাইছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে ঠাকুর যেভাবে তফাৎ করছেন, সেই অনুসারে দেখলে তাই হয়। আমরা যদি এটাকে ধর্মদর্শনের দিক

দিয়ে দেখতে যাই, আমরা দেখছি *সর্বত্র সমদর্শিনঃ*, এই জিনিসগুলো গীতা, উপনিষদে অনেকবার এসেছে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে নামাতে গিয়ে এটাকে কেউ নিতে পারছে না কেউ। আচার্য শঙ্কর অষ্টম শতাব্দীতে ছিলেন, গত বারো হাজার বছরে পুরো জিনিসটা degenerate হতে হতে এখন হয়ে গেছে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা', এর বাইরে আর কোন কথা নেই। এই জিনিসটা আমাদের দেশের মারাত্মক ক্ষতি করে দিয়েছে। আচার্য শঙ্করের এটা দোষ না, কারণ ওনার কাছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এটা কোন issueই ছিল না। শঙ্করাচার্যের পরবর্তিকালে যে বেদান্ত এলো, এই বেদান্ত শঙ্করাচার্যের সময়ে ছিল না। একটা সমস্যা যদি এক সময় না থাকে, কোন অবতার, কোন বৈজ্ঞানিক, কোন চিন্তক ওটাকে ঠিক করতে যান না, যখন সমস্যা হয় তখন ওটাকে ঠিক করা হয়। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর এটাকে নিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু post-Shankar যে অদ্বৈতবাদীরা এলেন, এনারা 'ত্রিকালমে জগৎ নেই হ্যায়', 'সব কুছ মায়া', এগুলোকে দিয়ে দেশের সর্বনাশ করে দিলেন।

রাজা মহারাজকে তাঁর শিষ্যরা বলছেন, 'মহারাজ, আপনি আমাদের কোন উপদেশ দেন না কেন'? রাজা মহারাজ বলছেন, 'আমি তোদের সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখছি, আমি কি করে উপদেশ দেব'! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখুন আর জগৎ মিথ্যা দেখুন, bottom লাইন কিন্তু এক, আপনি শিক্ষা দিচ্ছেন না। তাহলে ওদের কি হবে? সর্বনাশ হবে। আপনি নারায়ণ দেখছেন তাই শিক্ষা দিচ্ছেন না, বা জগৎ মিথ্যা বলে শিক্ষা দিচ্ছেন না, দুটোর ফল এক।

ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর এটাই বৈশিষ্ট্য, তাঁরা নারায়ণ দেখছেন, তা সত্ত্বেও শিক্ষা দিচ্ছেন। এই যে বোধ, সমুদ্র আর ঢেউ এক সঙ্গে দেখছেন, তিনি নারায়ণও দেখছেন, তার সাথে এটাও দেখছেন যে এটা একটা মুর্খ নারায়ণ, অজ্ঞানী নারায়ণ; কৃষ্ণ দেখছেন, কিন্তু দুষ্ট কৃষ্ণ। যশোদা কৃষ্ণকে যেভাবে শাস্তি দিচ্ছেন, ঠাকুরও সে-ভাবে মানবজাতিকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আর তাই শব্দগুলিকে আলাদা করে দিয়ে বলছেন – জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী। ঠাকুর যে এটা নূতন কিছু দিচ্ছেন, একেবারেই না, আমাদের উপনিষদ থেকে শুরু করে সব জায়গায় এই রকমই আছে।

কিন্তু পপুলার বেদান্তের কথা যখন আমরা বলি তখন শব্দগুলো মিশিয়ে দিয়ে বলে দিচ্ছে, ত্রিকাল মে জগৎ নেহি হ্যায়। আরে ভাই সবাই জানে ত্রিকাল মে জগৎ নেহি হ্যায়। কিন্তু তোমার খাওয়ার সময় তুমি চাইছ গরম রুটি, গরম ডাল-তরকারি, গরম চা, আর সব কিছু ভাল ভাল চাই। আর অপরের বেলায় বলছ, জগৎ মিথ্যা হ্যায়। একজন বিধবা কাঁদতে কাঁদতে তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে, তুমি তাকে জগৎ মিথ্যা হ্যায় বলে সরিয়ে দিচ্ছ। অনাথ শিশুর কি হবে? আরে জগৎ মিথ্যা হ্যায়, ভুল যাও সব ছোড়ো। আপনারা কি সর্বনাশ করছেন, ভেবে দেখেছেন একবারও? স্বামীজী এসে ওই জায়গাটায় একটা জোর ধাক্কা মারলেন, আর তার আগে ঠাকুর এসে যে নরেন আদিদের যে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করলেন, এটা মানবজাতির জন্য আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর এক বিরাট অবদান। এরপর ঠাকুর বলছেন –

"জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও আছে"। ভক্ত দেখেন ঈশ্বরই সব হয়েছেন, জ্ঞানী দেখেন আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, আত্মার বাইরে যা কিছু দেখাচ্ছে সবটাই মায়া। নাম-রূপের খেলা, নাম-রূপটা মিথ্যা, খেলাটাও মিথ্যা। যেমন সোনার গয়নার কথা আগে বলা হল। নাম-রূপটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ওটাকে গয়না বলছি, নাম-রূপ ছাড়া দেখতে গেলে আমরা সোনা দেখব।

"জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য – সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা"। আমাদের যে বিভিন্ন রকম মানসিক স্তর আছে, এগুলো তিনিই রেখে দিয়েছেন। ভক্তিপথ সোজা এইজন্য যে, এলেমেলো হওয়াটা কম হয়।

“বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎসংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।

“বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞান – এ-সব তাঁর ঐশ্বর্য। (সহাস্যে) **যে বাবুর ঘর-দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু।** (সকলের হাস্য) **ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত তাহলে কে মানত**”। (সকলের হাস্য)

আচার্য শঙ্করও ব্যাখ্যা করছেন, ঈশ্বর কে? ভগবান কে? বলছেন, যিনি ভক্তদের কামনা পূর্ণ করেন। আচার্য শঙ্কর কোথাও বলছেন না যে, ভগবান মিথ্যা। উনি একবারও বলছেন না, ব্রহ্ম যেমন নিষ্ক্রিয় ভগবানও তেমন নিষ্ক্রিয়; তিনি বিধাতা, শুধু বিধাতা না, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তদের তিনি ইচ্ছাপূর্ণ করেন। এই যে ঠাকুর বলছেন, বিজ্ঞানী দেখেন ব্রহ্ম আর ভগবান এক, আচার্য শঙ্করও তাঁর গীতার ভাষ্যে বারবার এই কথা বলছেন – যিনি বাসুদেব, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আমার আত্মা। ঠাকুর তাই বলছেন, ঐশ্বর্য যদি না থাকে, তাহলে তিনি কিসের ভগবান।

“দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কতরকম জিনিস – চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কতরকম জীব। বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশি শক্তি, কারু কম শক্তি”।

“বিদ্যাসাগর – তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন”?

এই যে ঠাকুর বলছেন, জগৎ কি চমৎকার, ঠাকুরের এই কথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জগৎকে মোটামুটি তিন ভাবে দেখা হয়। একদল বলছে, এই জগৎ দারুণ জায়গা, লুটপুটে খাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে বিষয়ীরা এ-ভাবে জগৎকে দেখে। লুটেপুটে খাওয়ার ক্ষমতা থাকে যৌবনে। যৌবন যত ঢলে পড়তে থাকে তত সে বেশি করে জগৎকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু আগের মত ক্ষমতা না থাকাতে জগৎ ফসকে যায় বলে আসে হতাশার ভাব। এরা হল একটা থাক। আরেক ধরণের আছেন, যাঁরা সাধক, তাঁরা চাইছেন যে করেই হোক আমাকে এই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এদের বাইরে একটা তৃতীয় থাক আছে, এখানে ঠাকুর এদের কথাই বলছেন। ঠাকুর বলছেন, এই জগৎ কি চমৎকার, এটা প্রথমটাও না, দ্বিতীয়টাও না। শাস্ত্রে যখনই জগৎকে নিয়ে আলোচনা করা হয়, বিশেষ করে বেদান্তে, অবশ্যই তাঁরা জগৎকে ত্যাগের কথা বলবেন। ত্যাগ না করলে কিছু হয়ও না, এতে কোন সন্দেহ নেই। সাধকদের জন্য যখন বলা হয়, তখন এক রকম কথা বলা হয়। কিন্তু সিদ্ধদের মনের অবস্থার বর্ণনা করার সময় একটু তফাৎ হয়ে যায়। দৃষ্টিভঙ্গীতে সাধক ও সিদ্ধির কোন তফাৎ থাকে না, কিন্তু কোথাও কোথাও যে তফাৎ হয়, সেই তফাৎটা খুব বড় তফাৎ হয়।

তার মানে এখন দু-রকম হয়ে যাচ্ছে – একজন ভোগ করার জন্য বলছে জগৎ কি দারুণ জায়গা। আরেকজন যাঁর সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে গেছে, তিনিও বলছেন, এই জগৎ কি চমৎকার জায়গা। সহজ একটা উপমা দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে আছেন, আর সীতার অপহরণ হয়ে গেছে। বাল্মিকী রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী ওই মুহুর্তে শ্রীরামচন্দ্র পাগলের মত হয়ে গেছেন। উন্মত্তের মত দুই ভাই মিলে সীতাকে খুঁজে যাচ্ছেন। খুঁজতে খুঁজতে কিষ্কিন্ধ্যা পৌঁছালেন। বালি বধ হল, সুগ্রীব রাজা হলেন। মহাবীর হনুমান লঙ্কা গেলেন, সীতাকে খুঁজে বার করলেন। এবার রামচন্দ্রের সেনারা চলল। একটা করে দিন গুনতে গুনতে সবাই লঙ্কার দিকে এগোতে লাগলে, কিন্তু পাগলের মত সবাই ছটফট করছেন। যুদ্ধ হল, রাবণ বধ হল। সীতাকে নিয়ে শ্রীরাম পুষ্পক যানে করে অযোধ্যা ফিরছেন। যেমনি পুষ্পক যান চলতে শুরু করল, শ্রীরাম সীতাকে সব দেখাতে লাগলেন – এই যুদ্ধভূমিতে যুদ্ধ হয়েছিল, এখানে কুম্ভকর্ণ মারা গিয়েছিল, এখানে রাবণ মারা গিয়েছিল, এই সেই সমুদ্র, এখানে তোমার

কাছে যাওয়ার জন্য সেতুবন্ধ হয়েছিল, এই পারে আমরা ছিলাম, এটা হল কিষ্কিন্ধা রাজ্য, এখানে বালি বধ হয়েছিল।

এবার দেখুন কত তফাৎ এসে যাচ্ছে, এই সেই রামচন্দ্র পাঁচ ছয় মাস আগে যিনি এ-সব জায়গায় উন্মত্তের মত সীতাকে অন্বেষণ করে যাচ্ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ভগবান মানছি, তিনি লীলা করছেন তাও মানছি, কিন্তু ওই লীলাতে তিনি উন্মত্তের মত, পাগলের মত আচরণ করছেন – আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। শ্রীরামচন্দ্র সঙ্কল্প নিলেন, কার্যসিদ্ধিও হয়ে গেল। এবার তিনি সীতা, লক্ষ্মণ ও অন্যদের সাথে করে ফিরে আসছেন। যে জিনিসটা কিছু দিন আগে একটা বিভীষিকার মত ছিল, সেটাই এখন মধুর হয়ে গেছে। তাহলে কি পরিবর্তন হল? কিছুই পরিবর্তন হয়নি। কিষ্কিন্ধ্যা যেমন ছিল তেমনই আছে, সমুদ্রের তীর যেমন ছিল তেমনই আছে, বনজঙ্গল আগের মতই আছে। কিন্তু রামের মন এখন পালটে গছে, সঙ্গে সীতাও আছেন, জিনিসগুলো এখন পুরোপুরি অন্য রকম দেখাচ্ছে।

এই জিনিস আমাদের সবারই হয়। সব বাচ্চারই স্কুলে যাওয়ার নামে আতঙ্ক হয়। আমারও আতঙ্ক হত, স্কুলে গেলে মাস্টারের সেই পড়া ধরা, সেই বকুনি খাওয়া। একদিন বিকেলের দিকে কারু একজনের সঙ্গে স্কুলে যেতে হয়েছিল। প্রথমে ভয় পাচ্ছিলাম আবার সেই স্কুল! কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর খুব আনন্দ লাগছিল, না আছে মাস্টার, না আছে বকা খাওয়া, না আছে বেত্রাঘাৎ, না আছে স্কুলের পড়া। আমি যার সাথে গিয়েছিলাম তাকে আমি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি – এখানে আমি পড়ি, এখানে পিটি করি। ওই ছোট বয়সেও এই জিনিসটা আমার মনে একটা চিন্তার ঢেউ তুলে দিয়েছিল। আজকেই সকালে যে জায়গাটা আমার আতঙ্কের জায়গা ছিল, এখন বিকালবেলায় অন্য রকম মনে হচ্ছে। পরের দিন স্কুলে ঢোকার আগেই আবার স্কুলটা আগের মত হয়ে গেল। পাশ করে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার পর আর ওখানে ঢুকতে হবে না।

আমি অনেকদিন দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলাম। দেখতাম প্রাক্তন ছাত্ররা বড় হয়ে বিয়ে করে নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যখন স্কুলে আসত, তখন বাচ্চাকে দেখাচ্ছে, জানো আমি এই হস্টেলে থাকতাম, এখানে ক্লাশ করতাম, এখানে আমরা ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল সব খেলতাম। এখানে আমাদের অমুক টীচার থাকতেন, বাবাঃ কি কড়া শিক্ষক ছিলেন। এখন তার ভয়ের বিষটা চলে গেছে, ব্যক্তিত্ব যেখানে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিল, নিজের জায়গাটা সেখানে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা, শক্তি আর স্পেস তিনটে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; একটা গেলে অন্যটা চলে যায়। যেমনি স্কুলে যাচ্ছে তার স্পেস ছোট হয়ে গেল, স্পেস চলে যাচ্ছে মানে আসলে তার ফ্রীডম চলে যাচ্ছে, ফলে শক্তিটাও চলে যাচ্ছে। তখন নিজেকে দুর্বল মনে হয়, তখন চোখে জল আসে।

আজকে এই জগতে, আমার, আপনার সবার ফ্রীডম চলে গেছে, কারুরই কোন ফ্রীডম নেই। এখন আমাদের না আছে দৈহিক স্বাধীনতা, না আছে মনের স্বাধীনতা; মনে হচ্ছে জগৎ আমাকে চেপে ধরে আছে। একবার যদি কোন রকমে বেরিয়ে যাওয়া যায়, বেরোন হল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরকে ভালবাসা; সীতাকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর রামচন্দ্র যেমন ফ্রী হয়ে গেলেন, আমরা স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেমন ফ্রী হয়ে গেলাম; ঠিক তেমনি বেরিয়ে যাওয়া মানে ফ্রী হয়ে যাওয়া। আপনি জানেন এই জগতের সাথে আপনার আর কোন সম্পর্ক নেই, আপনি জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। জগৎ এখনও সবাইকে বাঁধবে, আপনাকেও বাঁধবে, কিন্তু আপনি জানেন আপনি আর এই জগতের কেউ নন।

এই দুটোর পারে তৃতীয় একটা থাক আছে, এরা হল জেল খাটা আসামী। জেল নিয়ে প্রচুর কাহিনী, উপন্যাস আছে। কেউ পনের বছর বা কুড়ি বছর জেলে ছিল, তার জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সে আর জেল ছেড়ে যেতে চাইছে না। লোকটি কেঁদে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে কোন ভাবে যদি সেখানেই থেকে যেতে পারে। জেল ও জেলের কয়েদীদের উপর The Shwashank Redemption

একটা খুব নামকরা সিনেমা। শ্বশাঙ্ক নামে একটা ছেলেকে বদমাইশি করে আমেরিকার জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার জেল যে নরকের থেকেও কত জঘন্য জায়গা এই সিনেমা না দেখলে কেউ জানতে পারত না। সেখানে একজন বয়স্ক মানুষ জেলের লাইব্রেরী দেখাশোনা করে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, একটা পেন নাইফ্, ছোট্ট একটা ছুরি নিয়ে সেই বয়স্ক লাইব্রেরীয়ান আরেকটা কয়েদিকে মাটিতে ফেলে গলায় ছুরিটা লাগিয়ে বলছে ওর গলা আজ আমি কাটব। সেই লোকটা ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু দেখা গেল, যে ছুরি চালাবে তার হাত অনেক বেশি কাঁপছে। অথচ বয়স্ক লোকটা এত ভদ্র, এত শান্ত প্রকৃতির, লাইব্রেরী ছাড়া কিছু বোঝে না। তখন একজন বলল, আসলে ওর জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। অনেক বছর এই জেলে থাকতে থাকতে এমন হয়ে গেছে যে, এই জেল ছাড়া বাইরের জগতের কিছু জানে না। তার উপর সে লাইব্রেরী দেখছে, লোকেরা তাকে জানছে, মানছে। জেলের বাইরে তাকে কে পুছবে, জেলের বাইরে একজন জেল খাটা আসামী বলেই তার পরিচিতি হবে। সে কাঁদছে, সব কিছু করছে, কিন্তু কিছু করার নেই, মেয়াদ উত্তীর্ণ, তাকে ছাড়তেই হবে। ছেড়ে দিয়েছে, বাইরে গেল, একদিনের মধ্যে আত্মহত্যা করে নিল।

সন্ন্যাসীরা যাঁরা আছেন, তাঁদেরও একই জিনিস। এখানে দশ জনের সাথে আছেন, বেলুড় মঠের সাথে, বেলুড় মঠের কাজের সাথে identified হয়ে আছেন। যদি মঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান, তাঁকে কে পুছবে, জীবন দুর্বিষহ হয়ে শেষ হয়ে যাবেন। আমরা যাঁরা সাধন জগতে ঢুকছি, আমাদের অবস্থা আরও বাজে হয়ে যায়। এখন আপনি একটা কিছু আছেন, আপনি মা, আপনি বাবা, কিছু একটা আছেন, আপনার ঘরবাড়ি আছে। হঠাৎ ধর্মকর্ম শুরু করলেন, বলে দেওয়া হল, ঠাকুরকে ভালবাসতে হবে। যাদেরকে আপনি আঁকড়ে আছেন, অক্টোপাস যেমন সব কিছুকে আঁকড়ে থাকে, আপনিও সেইভাবে সব কিছুকে ধরে আছেন। এবার সেগুলোকে আপনার ছাড়তে হবে। আপনি ভাবতে শুরু করলেন, ওরে বাবা! যা ছিল সব তো চলে যাবে, তখন আঁৎকে ধর্মকে ছেড়ে আবার সংসারকে জাপটে ধরলেন। কারণ, আজকে আপনি যে জগতে আছেন, এখানে আপনি একটা কিছু হয়ে আছেন।

একজন ভদ্রলোককে জানতাম, উনি কোথাও একজন অফিসার কিছু ছিলেন, অত্যন্ত ভদ্রলোক। কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর উনি পাড়াতে একটা লাইব্রেরী ছিল, সেখানে গিয়ে বললেন, আমি সেবা করব। সারা জীবন কাজ করেছেন, কাজ ছাড়া থাকেননি কোন দিন। সত্তর বছরেও তাঁর কাজ দরকার, আশি বছরেও কাজ দরকার। কাজ ছাড়া সময় কাটে না, কাজ ছাড়া পাগলের মত হয়ে যান। যাই হোক, ওনাকে লাইব্রেরীতে বইগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কাজ দেওয়া হল। খুব নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। বেশ কিছু দিন বাদে ওনার কোথাও যাওয়ার ছিল। দিন সাতেকের জন্য উনি আসতে পারবেন না। খুব ভদ্র ভাবে লাইব্রেরিয়ানকে বললেন, 'আমি দিন সাতেকের জন্য বাইরে যাচ্ছি, আমি আসতে পারব না, কিছু মনে করবেন না'। লাইব্রেরিয়ান বললেন, 'আপনার তো এখানে কোন দরকারই ছিল না'। কথাটা শুনে ভদ্রলোকের মনটা ভেঙে গেল। মনে মনে ভাবছেন, আমি এত নিষ্ঠার সাথে সেবা করছি, আর বলছে কিনা, আপনার তো এখানে কোন দরকারই ছিল না! অনেক দিন পরে আমার সাথে দেখা হতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এখন কি করছেন'? আমার কথা শুনেই ওনার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। 'এই দেখুন আমাকে এই ভাবে বলল'। আমি মনে মনে ভাবলাম, এ-ছাড়া আর কি বলবে!

সত্যিকারের আমাদের সবারই এই এক অবস্থা। লঙ্কায় রাবণ মরল আর বেহুলা কেঁদে আকুল হল। আমরা যাদের জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছি, আমরা বুঝতে পারছি না যে, কাদের জন্য আমি কাঁদছি! ঠাকুর বলছেন, কোথায় লঙ্কাতে রাবণ মরেছে আর এখানে বেহুলা কাঁদছে। যাদের জন্য আপনি এত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা করছেন, আসলে এরা কেউ আপনার কিছু না। এক্ষুণি যদি আপনি মরে যান, জগতের তাতে কিছু হবে না, আর যাদের জন্য আপনি এত দুশ্চিন্তা করছেন, এত কাঁদছেন, এদেরও কিছু হবে না। বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, আপনি মরলে এদের ভালই হয়ে যায়। যখন এই বোধটা আসে, এই

জগৎটা কি জ্বালার, তখন জগৎকে সত্যিই জ্বালাময় মনে হয়। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমাকে ছাড়া চলবে না।

ঠাকুর বর্ণনা করছেন, গঙ্গার ঘাটে বসে বিধবারা সাংসারিক কথাবার্তা করছে, সেখানে বলছে, 'আমাকেই সব করতে হয়, এমনকি ফুলশয্যার খাটটাও আমাকেই ঠিক করতে হয়'। নিজে বিধবা এদিকে অপরের ফুলশয্যার খাট তৈরী করে বেড়াচ্ছে। একটু চেতনা নেই যে, তোমাকে কারুর প্রয়োজন নেই। যাকে ভালবাসছি সে যখন জীবন থেকে বেরিয়ে যায় তখন মনে হয় যে, হাট ভেঙে গেল। নদের হাট জমিয়ে রেখেছিল, সেই নদের হাট ভেঙে গেল, চোখের জল আর থামছে না। আর এটা সত্যি যে, কেউ যখন কাঁদে, দুঃখের জন্য কেউ কাঁদেনা, ভাবতে গেলে সত্যিই খুব খারাপ লাগে। ওই সময় তাকে এই কথাগুলো বললে জীবনে সে আপনার দিকে আর তাকাবে না।

একটু যদি আমরা বিচার করে দেখি, সিনেমাতে যখন নায়ক-নায়িকারা কাঁদে, তখন ওই কান্না দেখে আমরা বলি, কি দারুণ অভিনয় করলেন। এই জগতে বাস্তবে যে কান্নাকাটি হয়, একটু পরে ওই দিকে তাকালে ড্রামার মতই মনে হবে, অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। সমস্যা হয় এই জায়গাতে, সাধনার অবস্থায় জগৎকে যখন আমরা দূর ছাই করতে শুরু করি, কিন্তু তার আগের যে অবস্থাগুলো খুব সাধারণ। সাধনার আগের এই যে তিনটে খুব সাধারণ অবস্থা, আমরা ধরতে পারি না। কি কি তিনটে অবস্থা? উপমা দিয়ে বললে সহজে বোঝা যাবে।

জেলের কয়েদী সে নিজের জেলকে ভালবাসে, আরেকজন কয়েদী জেল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে, আরেকজন জেল থেকে বেরিয়ে রামের মত পুষ্পক যানে করে সীতাকে দেখাচ্ছে, জানো আমি এই জেলে ছিলাম বা কেউ হয় বিশেষ অনুমতি নিয়ে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে করে জেলে ঘুরতে এসেছে। জেলরের সাথে পরিচয় করিয়ে বলছে, এনার সঙ্গে এখানে কত দিন ছিলাম। এখন সে মুক্ত, তাই জেলকে তার চমৎকার মনে হচ্ছে। আর যারা অনেক দিন জেল খাটছে, সে সবাইকে বলছে, খুব ভাল, খুব ভাল, সবাই মন দিয়ে কাজ কর। ঠিক তেমনি, যিনি দেখেন জগৎ কি চমৎকার, তিনি বিজ্ঞানী। তিনি বুঝে গেছেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, সবটাই ব্রহ্ম, সব কিছু ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সমুদ্রে যেমন ঢেউ হয়, এগুলো হল সেই সমুদ্রেরই ঢেউ। চিনি দিয়ে যে মঠ তৈরী হয়; তাতে হাতি, ঘোড়া, সিংহ বানানো হয়, ডেলাটাও চিনি, হাতি ঘোড়াও চিনি। যখন এটা জানা হয়ে গেল, তখন বুঝে গেল চিনি ছাড়া কিছু নেই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? বিদ্যাসাগর মশাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করছেন, কারণ বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ভাল মানুষ, কত বড় একজন পরোপকারী, কিন্তু উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতাটা অন্য জিনিস। ঠাকুর এরপর বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের যে উত্তর দিচ্ছেন, তার আলোচনা করার আগে একটা খুব সহজ সিদ্ধান্ত, আপনি চাবিকাঠি বলতে পারেন, ওটা বুঝে নিলে বাকি কথাগুলো বুঝতে সুবিধা হবে।

এই জগতে তিনটি সত্য চলে, এই তিনটে সত্যকে যদি আমরা সব সময় মনে রাখি, তাহলে শাস্ত্র আদি পড়লে, জীবনে কোন সমস্যা এলে, আমরা এর সমাধান করে নিতে পারব। একটা হল 'তুমি', আরেকটা হল 'আমি' আর অন্যটা হল 'তিনি' – তুমি, আমি ও তিনি। তুমি কে, আমি কে, তোমার আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক এবং আমার ওনার সাথে কি সম্পর্ক? এই প্রশ্নের একবার যদি পরিষ্কার রূপে মীমাংসা হয়ে যায়, তাহলে জীবনে আর কোন সমস্যা থাকবে না। দুঃখ যে হবে না, তা না, আপনজন কেউ মারা গেলে দুঃখ অবশ্যই হবে, এবার আমি কার সাথে কথা বলবে, মনে দুঃখ হবে। ঠাকুর যেমন কেশব সেনের নাম করে বলছেন, ওর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে কলকাতায় গেলে কার সাথে কথা বলব। এটাকে শোক বলা যায় না – I will miss you and I am shattered, আমি

শেষ হয়ে গেলাম, আমার সব কিছু ভেঙে গেল, আর আমি তোমার অভাব অনুভব করব, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

এই তিনটের সম্পর্ককে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে আগে দেখা যাবে, আমাদের মত সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে 'তিনি' বলে কিছু নেই। খুব হলে মন্দিরে গেলাম, একটু প্রণাম আদি করে চরণামৃত খেয়ে এতটুকু বলার জন্য বলি – ঠাকুর তুমি একটু আমাকে দেখো। 'তুমি' হল তার স্বামী বা স্ত্রী, তার সন্তানাদি, তার বাড়ি, তার কুকুর, তারা বেড়াল। একটা বাচ্চাকে নিয়ে মন্দিরে গেল, বাচ্চাটাকে জোর করে মন্দিরের বিগ্রহের সামনে মাথাটা ঠুকিয়ে বলবে, ঠাকুর এই নাতিকে নিয়ে এসেছি, একটু দেখো। এগুলো করলেও আমাদের কাছে তিনির অস্তিত্ব নেই। আমাদের কাছে অস্তিত্ব হল – 'আমি' ও 'তুমি', আমি আর এই জগৎ। এই জগৎ আর আমি একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে।

যখন ঈশ্বরের কৃপায় মনটা তিনির দিকে যায়, তখন দেখে তুমিও আছ, আমিও আছি, তিনিও আছেন। এরপর তুমি, আমি ও তিনির মধ্যে সাধনার বাচ খেলা শুরু হয়। বাচ খেলা চলতে চলতে তুমিটা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে, কমতে কমতে একটা সময় দেখা যায় শুধু আমি আর তিনিই আছেন, আর কখন-সখন আমিই তিনি, তিনিই আমি। আর কখন-সখন তিনি-আমির পারে, কিছুই নেই, মুখ বন্ধ – অদ্বৈত, শেষ কথা।

এখন আমি আর তুমির মধ্যে যখন বাচ খেলা চলে আর আমি আর তিনির মধ্যে যখন চেষ্টা চলে, এই জায়গাতে দরকার হয় শক্তির। কারণ শেষে আমরা যেটা আলোচনা করলাম, তুমি বলে অর্থাৎ জগৎ বলে কিছু থাকে না, থাকে শুধু আমি আর তিনি। তার মানে থেকে যায় উপনিষদের শেষ কথা – অহং ব্রহ্মাস্মি। অহং ব্রহ্মাস্মির মধ্যে তিনটে জিনিস – আমি আছি, অহং অস্মি। আগেও যতক্ষণ সাধনা শুরু হয়নি তখনও বলছে অহং অস্মি, আমি আছে। আর যখন ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়ে যায়, তখন হয়ে যায় সেই ব্রহ্মই আমি, ওই অস্মিটা তখন silent হয়ে যায়। অহং ব্রহ্মাস্মি বললে অনেক সময় সংশয় হয়ে যায় যে, আমি ব্রহ্ম, কিন্তু এই সমর্পণানন্দ কখনই ব্রহ্ম না। যতক্ষণ সমর্পণানন্দের দেহ আছে, যতক্ষণ মন আছে, যতক্ষণ আমিত্ব আছে, ততক্ষণ সমর্পণানন্দ কোন মতেই ব্রহ্ম না। যখন সব উপাধি খসে পড়ে যাবে, তখন সে ব্রহ্ম। সেইজন্য উপনিষদের মহাবাক্য অয়মাত্মা ব্রহ্ম অনেক বেশি appropriate, এই আত্মা যেটা, এটাই ব্রহ্ম। তার মানে সীমিত বলে কিছু নেই। যে সত্তাকে আমরা সীমিত বলে মনে করছি, আসলে সেটা অসীম। Individual বলে কিছু নেই, আসলে আছে universal। আসলে individualটাই universe। Individual is one with universe এই কথা বলার জন্য চারটে মহাবাক্য আনা হয়। এটা বোঝাবার জন্য যে, যা কিছু আছে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই।

এখন একজন সমাধিবান পুরুষ, যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে, তিনি দেখছেন তিনি ছাড়া কিছু নেই, আর আমরা দেখছি জগৎ ছাড়া কিছু নেই, কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া কিছু নেই, আর ওই দিকে সমাধিবান দেখছেন ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে। আপনি বলবেন, দৃষ্টিতে গোলমাল। কিসের দৃষ্টিতে গোলমাল! আমি স্পষ্ট আমার চোখের সামনে জগৎকে দেখতে পাচ্ছি, আমি আমার ভোগ্যবস্তু আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই জগৎকে যদি আমি সন্দেহ করি, তাহলে ঠাকুর যে বলছেন, ঈশ্বরই সত্য, সেটাকেও সন্দেহ করতে হবে। কারণ দুটো জিনিসকে জানার জন্য মাধ্যমটা এক, সেটা হল আমার মন। যদি আমার মন এটাকে ভুল দেখে, তাহলে আমার মন ঠাকুরকেও ভুল দেখছে। যদি এই জগৎকে আমি সন্দেহ করি, তাহলে আমি ঠাকুরের কথাকেও সন্দেহ করব, কারণ instrumentটা এক। দাঁড়িপাল্লায় এক কিলো কোন জিনিস মাপার পর যদি সেটা নয়শো গ্রাম হয়, সেই দাঁড়িপাল্লায় চিনি মাপলেও নয়শো গ্রাম আসবে, লবণ মাপলেও নয়শো আসবে, কোনটা বাড়বেও না, কমবে না। কারণ তার মাপার যন্ত্রটাতেই গোলমাল। আমার যে মাপার যন্ত্র মনটাই যদি গোলমেলে হয়, ওই গোলমেলে মন নিয়ে যদি জগৎকে ভুল দেখি, তাহলে ঈশ্বরকেও ভুল দেখব।

ব্যাপারটা তা নয়, আসলে এগুলোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু এই ভাসমান জগতের সাথে যখনই আমি interact করছি, interact করা মানেই শক্তি দরকার। যখন আমি কথা বলছি, যখন কথাগুলি আপনাদের বোঝানর চেষ্টা করছি, তখন এখানে শক্তি এসে যাচ্ছে। তখন বলছেন – ব্রহ্ম আর শক্তি। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু ব্রহ্ম যখন এই জগৎ রূপে ভাসমান হন, তখন সেই ব্রহ্মকেই শক্তি রূপে দেখা হয়। ভগবান সেইজন্য গীতায় বলছেন, আমার দুটো প্রকৃতি – পরা ও অপরা। পরা প্রকৃতি হল আত্মা আর অপরা প্রকৃতি হল জগৎ, জগৎ মানেই শক্তি। যেখানেই জীবন, সেখানেই পরা শক্তি ও অপরা শক্তির খেলা চলছে বুঝতে হয়। এই দুটো শক্তির খেলা ক্রমাগত চলতে থাকে। এখন অপরা শক্তি, এই শক্তিটাই মূলতঃ মন। বিজ্ঞানের দিক দিয়েও যদি দেখা হয়, ওনারা বলবেন mind power।

এখন বলছি অহং ব্রহ্মাস্মি, মানে আমি; তার আগে বলা হচ্ছিল, তুমি, আমি; এখন বলা হল শক্তি আর মন। তার মানে তুমি, আমি, শক্তি, মন, সব কটা একই জিনিস। আমি যেটা, শক্তিও সেটা, মনও সেটা, জগৎটাও সেটা, সব কিছু এক – সবটাই হল মন। এই মনই জগৎকে সামনে নিয়ে আসে, এই মন দিয়েই শক্তি বেরোয়, এই মন দিয়েই আমি বোধ হয়। এই তিন চারটে জিনিস দিয়ে আমাদের যে সংসার চলছে, সবটাই হল মন। এই মনকে আপনি আমি বলুন, শক্তি বলুন, যাই বলুন; ওই ব্রহ্ম, শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁকে ভগবান গীতায় পরা প্রকৃতি বলছেন, ওটাই যখন মন দিয়ে আসতে শুরু হয়ে জগতের প্রকাশ হয়, আমরা তখন ওটাকে বলছি শক্তি। ওই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে করে যখন উপরে উঠতে শুরু করে, আমিত্বটা তত কমতে শুরু করে, অন্য দিকে আমিত্ব কিন্তু বিশাল হতে থাকে। কারণ শক্তি বাড়ছে কিনা, শক্তি আর আমি এক।

শক্তি বাড়া মানে আমি বাড়ছে, কিন্তু ওই আমিকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য শক্তিটাও পুঞ্জিভূত হচ্ছে। শক্তি যত পুঞ্জিভূত হয়, দৃশ্য তত সূক্ষ্ম হয়। দৃশ্য যত সূক্ষ্ম হয়, তার ক্ষমতা তত বাড়ছে, কারণ শক্তি বাড়ছে কিনা। ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে এত বেড়ে যায় যে, সে সত্যি সত্যি মনে করে যে আমি আলাদা একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করে দিতে পারি, কিন্তু তখনও সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে।

আমাদের কাছে ক্ষমতা আসাটা কোন সমস্যা না, ক্ষমতা অর্জন করা খুব সহজ, কিন্তু ক্ষমতাকে ধরে রাখার শক্তি আমাদের থাকে না। একটা ঘোড়া আপনি যেখান থেকে খুশি সংগ্রহ করে নিতে পারেন, কিন্তু সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ারি হওয়ার পর ঘোড়া উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলে দেবে আপনি টেরই পাবেন না। ভগবান সেইজন্য যাকে তাকে ক্ষমতা দেন না। তিনি জানেন এরা সব অতি সাধারণ কয়েল, ওই কয়েলের মধ্য দিয়ে হাই ভোল্টেজ গেলে ফিউজটাই উড়ে যাবে। সেইজন্য ভগবান শক্তি দেন না। ভগবানের শক্তি আসার জন্য আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। প্রস্তুত করতে করতে যখন 'আমি' উড়ে যায়, সেখানেই শক্তির শেষ। শক্তি মানেই জগৎ, শক্তি মানেই মন। শক্তির শেষ, শেষ মানে একেবারে শেষ কথা। বেদান্ত মানে, বেদের যেখানে অন্ত, পুরো বেদ যেটা বলতে চাইছে সেটাই বেদান্ত, মানে উপনিষদ। শক্তির শেষ মানে, শক্তি সেখানে highest, ব্রহ্মের সঙ্গে এক। সেই মানুষ যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, *যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ*, তিনি যেটাই ইচ্ছা করবেন, সেটাই তার হয়ে যাবে। যা চাইবে তাই করে দিতে পারবে, ইচ্ছামাত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে দেবে। কারণ সে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

তাহলে এতক্ষণ সে কি ছিল? এতক্ষণ ব্রহ্ম আর শক্তি যেন আলাদা দেখাচ্ছিল। আমার আপনার ক্ষেত্রে ব্রহ্ম আর শক্তি আলাদা, কারণ, আত্মা আমার আলাদা আমার মন আলাদা। আমি জানি আমার মন দিয়ে আত্মার চিন্তন করছি, ধ্যান করছি; তার মানেই মন আলাদা, আত্মা আলাদা। মন যত কেন্দ্রিত হয় শক্তি তত বাড়ে। সেই শক্তি সংসারে পরিষ্কার দেখা যায়। যাঁরা বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, তাঁদের যে মনের শক্তি, সেটাও আত্মারই শক্তি। অসুরদের শক্তি, সেটাও আত্মার শক্তি। সমস্যা হল, ওদের শক্তিটা

সীমিত হয়ে আছে। ওরা আমিত্বটাকে কখন ছাড়তে পারে না। আমিত্বটা ছাড়তে না পারার জন্য, ওরা একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যায়। যোগীদের আমিত্বটা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকার জন্য, ওনারা আরও এগিয়ে চলে যান।

আইনস্টাইন আর স্বামী বিবেকানন্দ, দুজনের তফাৎ কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে আইনস্টাইনের মনের সাংঘাতিক শক্তি, স্বামী বিবেকানন্দেরও সাংঘাতিক মনের শক্তি। তাহলে তফাৎ কোথায়? আইনস্টাইন তাঁর আমিত্বকে, 'আমি' ভাবটা ছাড়বেন না, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য শঙ্কর, এনারা তাঁদের আমিত্বকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। কোথাও তাঁদের মধ্যে 'আমি' ভাবটা পাওয়া যাবে না। আমিকে ছেড়ে দিচ্ছেন বলে এনাদের শক্তিটাও অনন্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে আইনস্টাইনের মধ্যে আত্মার শক্তির প্রকাশ সাংঘাতিক। মূল বক্তব্য, ব্রহ্ম আর শক্তির যে খেলা, এটাই জগৎ।

এটা একটা থিওরেটিক্যাল ব্যাখ্যা করা হল। স্বামীজী যখন বলছেন, Each soul is potentially divine, এখানে তিনি একটা নূতন ফিলজফি দিচ্ছেন। যদিও বাংলায় বলা হয় অব্যক্ত ব্রহ্ম, ঠিকই বলছেন, কিন্তু এই যে বলছেন, potentially divine, তার মানে আত্মা রয়েছেন, আর potential রয়েছে, potential যে kineticএ যাবে, এটার জন্য দরকার শক্তি। যখন সচেতন ভাবে চেষ্টা শুরু হয়, তখন এই শক্তি বেরোতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেটা পরে পরেও আসবে, রামকৃষ্ণ ভাবধারায় যাঁরা আছেন তাঁরা মোটামুটি সবাই না বুঝেই জেনে গেছেন যে, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সবাই না বুঝেই বলতে থাকে, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, *যথা অগ্নের্দাহিকা শক্তি*। এটা সত্যি যে, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, এটার উপরেই বেদান্ত দাঁড়িয়ে আছে। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও বলছেন, শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। তবে কি হয়, যিনি যে দর্শন বা গ্রন্থকে নিয়ে কাজ করছেন, অর্থাৎ তিনি যে এরিয়া নিয়ে কাজ করেন, তিনি সেই এরিয়াতেই বেশী নিজেকে ফোকাস করেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর সময়ে যে দর্শনগুলি ছিল, সেগুলোর উপর বেদান্তকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন বলে, তিনি ব্রহ্ম, শক্তির এদিকে বেশি যাননি। মাণ্ডুক্যকারিকাতে যাঁরা আছেন তাঁরা আবার ব্রহ্ম ছাড়া কিছু মানতে চান না, কারণ তাঁদের কাছে এটাই দরকার।

কিন্তু স্বামীজী এসে দেখালেন দেশ সেবা করা কেন দরকার, দেশ সেবার কথা না বললে দেশের প্রচণ্ড সর্বনাশ হয়ে যাবে। পরবর্তিকালে যিনি আসবেন তিনি বলবেন, দেশ সেবার কোন দরকারই ছিল না, তাঁরা নানান রকমের দোষ বার করতে শুরু করবেন। আমাদের সাধুরা স্বামীজীর প্রেরণায় যখন হরিদ্বারের ওদিকে সাধুদের সেবা করতে লাগলেন, তখন সবাই আমাদের সেখানে ভঙ্গি সাধু বলতে শুরু করলেন। কারণ তাঁদের ফিলজফিতে এগুলো মিলছে না, না মেলারই কথা।

কিন্তু ব্রহ্ম আর শক্তি, এই যে দুটো সত্তা, জগতে এসে যেন দুই হয়ে শিব আর শক্তি হয়ে যায় – এটাই ঠিক ঠিক বেদান্ত। কিন্তু প্রাচীন বেদান্তীরা এটা মানবেন না, বুঝবেনও না; কারণ পরম্পরায় বড় হচ্ছেন না, সম্প্রদায়ে বড় হচ্ছেন না। আমাদের এখানে একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি বলতেন, ঠাকুর হলেন শাক্ত অদ্বৈত। বিজ্ঞানবাদী, শাক্ত অদ্বৈত, এগুলো শব্দ ছাড়া কিছু না। এক কথায় অদ্বৈত, এটাই অদ্বৈত, অদ্বৈত ছাড়া কিছু আছে নাকি! দেববাণীতে স্বামীজী বলছেন, অদ্বৈত সবটাই নেয়। যখন আপনি বলছেন, শুদ্ধ ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই – এটাই অদ্বৈত। আর যখন আপনি বলছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ – এটাও অদ্বৈত। আর যখন বলছেন, ঈশ্বরই জীব, জগৎ, বস্তু হয়েছেন – এটাও অদ্বৈত। যাদের বুদ্ধি আছে তারা এগুলোকেই বিভিন্ন শব্দ আর নাম দিয়ে খেলা করে। সাধারণ মানুষ এগুলো বুঝতে পারে না, আর যার যত চেলা, যে যত বড় বড় যুক্তি নিয়ে খেলা করে, মনে করে এরা ঠিক বলছে। আমাদের মা বলে দিয়েছেন – তোমাদের ঠাকুর অদ্বৈতী ছিলেন, তোমরাও অদ্বৈতী – এটাকেই আমরা আমাদের শেষ কথা ধরে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আর দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সব অদ্বৈতের মধ্যে। এরপর শাক্ত অদ্বৈত

আসবে, বিজ্ঞানবাদ আসবে, বৈষ্ণব অদ্বৈত আসবে, আগামীকাল রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আসবে, সারদা অদ্বৈত আসবে, যত নাম আর শব্দ দিয়ে অদ্বৈত আসবে সবটাই অদ্বৈতের মধ্যেই থাকবে, অদ্বৈতের বাইরে কিছু নেই।

ঠাকুর এই কথাগুলো বলছেন বোঝানর জন্য; আর শঙ্করাচার্য আদিরা যখন শুধু ব্রহ্মকেই নিয়ে বলছেন, তাঁরাও বোঝানর জন্যই বলছেন। কিন্তু রামানুজ, মাধ্বাচার্যরা যখন বলছেন, তখন ওনারা বোঝানর জন্য বলছেন না, ওনারা গোঁড়া। মাঝে মাঝে ইউটিউবে কমেন্টে আমাকে বলা হয়, আপনি বিশিষ্টাদ্বৈতের কিছু বোঝেন না। কি করে বুঝব! ওটা আমার মতই না, আমি কেন বুঝতে যাব! আমরা অদ্বৈতী। আমরা এটাও জানি যে, বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈতেরই অঙ্গ। কেন তফাৎ? মনকে নিয়ে; এই যে বলা হল, আমি, মন ও শক্তি। মনের লয় হয়ে গেলে ব্রহ্ম নেই, শক্তি নেই; কি আছে মুখে বলা যাবে না। যেমনি আবার মনে এসে গেল, এরপরে সেই শক্তিকে ব্রহ্মার শক্তি রূপে দেখাবে, কখন শিবশক্তি রূপে দেখাবে, কখন বিশিষ্টাদ্বৈত রূপে দেখাবে, কখন দ্বৈত রূপে দেখাবে। কি দেখাবে, কাকে দেখাবে, কিভাবে দেখাবে, কেউ জানে না। ঠাকুরও এর ব্যাখ্যা করতে যাননি, কারণ যত কথা বেরোয় সব মন থেকেই বেরোয়, কিন্তু যেখানে মনই নেই, যেখানে শক্তি শেষ, মানে শক্তি একেবারে তুঙ্গে; মন নেই তো ধরবে কে। যদি ধরতেই পারছেন না, তাহলে আপনি বলবেন কি করে! এরপর আপনি যেটাই বলবেন, any theory is as good as theory। ঠাকুর এবার এটাকে ব্যাখ্যা করে বলছেন –

“**শ্রীরামকৃষ্ণ – তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন**”। একই জিনিস, যেটা এতক্ষণ আলোচনা করা হল। “**পিঁপড়েতে পর্যন্ত**”। আসলে পিঁপড়েতেই না, সব কিছুতে, শুকনো ঘাসের টুকরো, পাথর থেকে শুরু করে জীবজন্তু সব কিছুতে তিনিই আছেন। “**কিন্তু শক্তিবিশেষ**”। জগৎ এসে যাওয়া মানেই এখানে শক্তিবিশেষ হতেই হবে। এই জগতে একবার এসে পড়লে আপনি আর বলতে পারবেন না, তুমিও যা আমিও তাই। চেলাও গুরুকে বলতে পারবে না, গুরু তুমিও যা আমিও তাই। জনক রাজা শুকদেবকে বলছেন, আগে দক্ষিণাটা দিয়ে দাও, কারণ পরে গুরু-শিষ্যের কোন প্রভেদ থাকবে না। জনক রাজা মজার জন্য বলছেন, আসলে গুরু-শিষ্যের ভেদ কক্ষণ মিটে যাবে না। যার জন্য আচার্য শঙ্কর গুরুস্তোত্রাদি রচনা করে গেছেন। আচার্য শঙ্করের মত অদ্বৈতী আর কে আছেন, তিনিও গুরুস্তোত্র, দেবদেবীর স্তোত্রগুলি রচনা করেছেন। স্বামীজী এত বড় অদ্বৈতী, কিন্তু কোথাও তিনি ঠাকুরকে এক মুহুর্তের জন্য ছাড়ছেন না, শ্রীশ্রীমাকে ছাড়তে পারছেন না। অদ্বৈতের শেষ অবস্থায় গিয়ে গুরু-শিষ্যের ভেদ যেন থাকে না, 'যেন' শব্দটা আনছেন, কাহিনীগুলো বলা হয় বোঝানর জন্য। আমরা নামকরা যত বেদান্তীদের জানি, তাঁরাও গুরু-বন্দনা করেন, আর এখনও বেদান্তীরা অন্য কোন উৎসব পালন করুক আর না করুক, গুরুপূর্ণিমা উৎসব পালন করবেনই করবেন।

শক্তির এই তারতম্যকে ঠাকুর বলছেন, “**তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়, আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে – অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ-কথা মানো কিনা?** (বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন)”।

এই দেখুন, শক্তি শব্দ যেমনি এসে গেল, শক্তি শব্দেতে এসে গেল দয়া, বিদ্যা। শক্তি মানেই তিনটে গুণ – সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ। তমোগুণে আছে মানে শক্তি সেখানে কম আর বাজে ধরণের। রজোগুণে যখন আসে তখন শক্তিটা যেন বাড়ছে। বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে রজোগুণের প্রাধান্য। ভারতবর্ষে শক্তিটা তমোগুণে ঢুকে আছে, আমরা ঘোর তমোগুণী। উত্তরাখণ্ডে ভক্তরা সাধুদের গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'কি করতে হবে বাবাজী, একটু বলে দিন'। 'সিধা হো কে ঠিক সে বৈঠো, নাকসে শাঁস খিঁচো, দো বার ই নাকসে দো বার উ নাকসে'। 'আহা, কিতনে বড়ে মহাত্মা হ্যায়'। হাজার টাকা প্রণামী পড়ে গেল। আর যেমনি কোন বাবাজী বলে দিল একটু খাটতে হবে। থাক

বাবা, এ বাবাজী চলবে না। পাঁচ টাকাও প্রণামী পড়বে না। কত বড় সাধু মাপা হয়, কত টাকা প্রণামী পড়ছে দেখে। সব জাগতিক মানুষ কিনা, টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। কে বড় সাধু? যার ভক্ত ভক্তানি বড়, যেখানে প্রণাম-প্রণামী প্রচুর, যার নাম-যশ আছে, সোস্যাল মিডিয়াতে যাকে নিয়ে বেশি চর্চা হয়, সেই বড় সাধু। বড় সাধু হওয়ার জন্য কি দরকার? সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় – এই নির্মাল্য দিলাম, পূর্ণিমার দিন আলমারির মাথায় যত্ন করে তুলে রাখবে, তোমার সমস্ত সমস্যা চলে যাবে।

আমি একজনকে জানতাম, খুব নাম-যশ ছিল তাঁর। উনি বলতেন, অমুক মন্দিরে গিয়ে এই এই কর, তোমার হবেই হবে। ওখানে অমুক বাবাজী আছেন, ওনাকে এই দক্ষিণা দেবে। যদি না হয়, তা হলে বুঝবে, তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য এটা আটকে দিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি দেখছি দু-দিকটাই সামলে রাখছেন; যদি হয় তাতেও আপনার ক্রেডিট, আর যদি না হয় তাতেও আপনার ক্রেডিট'। ধর্মে ঢপ্‌বাজী করা অনেক সহজ, সারা দেশ জুড়ে তাই ধর্মের নামে যত রকমের বুজরুকি, ঢপবাজী চলছে।

এই যে ঠাকুর বলছেন, তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা, এটা হল সত্ত্বগুণের লক্ষণ। সত্যিকারের যেখানে শক্তি সেখানে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ এলে তবেই আসল শক্তির প্রকাশ হয়। তমোগুণে শক্তি কিছুই হবে না, গরুর লেজে হাত দিলে শুয়ে পড়বে। লেজে হাত দিলে তিড়িং বিড়িং যে লাফাচ্ছে, তার মানে রজোগুণ আছে। আর লেজে হাত দেওয়ার পর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে কার এত সাহস আমার লেজে হাত দেয়। যদি দেখে তার থেকে কম শক্তি, এক লাথি মেরে তাকে ছিটকে ফেলে দেবে। এই হল সত্ত্বগুণ, ভিতরে দম আছে।

বিদ্যাসাগরের যাই মত থাকুক, যেটা উনি এখানে বলছেন না, পরেও উনি বলবেন না। ওনার যাই মত থাকুক, ঠাকুর ওনাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন – মানুষ মানুষে তফাৎ থাকবেই, inequality এটাই জীবনের ধর্ম। Equality একমাত্র আধ্যাত্মিকতাতে গিয়ে হয়। সংসারে, এই জগতে equality কক্ষণ হবে না। অপরকে বোকা বানাবার জন্য, ধাপ্পা মারার জন্য equalityর কথা বলা হয়, মায়ার রাজ্যে সমতা কক্ষণ হয় না। কেউ নিজের ক্ষমতা দিয়ে আলাদা হয়ে যান, আইন আদালতে কখন পয়সা দিয়ে, কখন ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে বিচারকে নিজের অনুকূলে নিয়ে নেন। এই জগৎ কক্ষণ এক হতে পারে না। কারণ শক্তির তফাৎ। এই শক্তির তফাতের জন্য মানুষ কখন এক হতে পারবে না, কোন অবস্থাতেই না। একমাত্র আত্মজ্ঞানেই equality হতে পারে। আত্মজ্ঞানে গিয়ে সবাই এক হয়ে যায়, কারণ সেখানে শক্তির তারতম্য নেই, শক্তি এখানে শেষ, মানে full power। ওখানে উপর নিচু বলে আর কিছু থাকে না।

এই আলোচনায় দুটো জিনিস বেরিয়ে আসছে। এই জগৎ কেন চমৎকার? এখানে শক্তির প্রকাশ। এখানে শক্তির যে তারতম্য, এই তারতম্য একটা বিউটি নিয়ে আসে। এখন যদি কারুর হাতে বন্দুক থাকে, আর ব্যারল আপনার দিকে থাকে, আপনার দম বেরিয়ে যাবে, ট্রিগারে আপনার আঙুল রাখা আছে, আপনার শক্তি বেড়ে যাবে। জগৎটা বন্দুকের পজিশানের ব্যাপার। তোমার দিকে ব্যারল আছে, নাকি ট্রিগার আছে? আমরা যারা সংসারে আছি, ব্যারলটা আমাদের দিকে। জ্ঞানী হয়ে গেলেন, ট্রিগার আপনার হাতে, তখন জগৎটা চমৎকার।

আমাদের মনে হচ্ছে ঠাকুর এখানে সব কথা যেন বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঠাকুর আমাদের উদ্দেশ্য করেও বলছেন। ঠাকুর আবার বলছেন –

"**শ্রীরামকৃষ্ণ – শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই**"।

আমরা সবাই জানি বিদ্যাসাগর একজন সত্যিকারের পণ্ডিত ছিলেন। আগে আগে আমরা একটা কথা আলোচনা করেছিলাম, পরে ঠাকুরও আবার বলবেন, সেটা হল – হিন্দু ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মে একটা বড় পার্থক্য হল – এই জীবনে আপনি যা কিছু করেছেন, সেই কর্মের উপর নির্ভর করে আপনার মুক্তি হতে পারে, আপনি স্বর্গে যেতে পারেন; হিন্দুরা এটাকে মানে না। হিন্দুরা মনে করে, তুমি জন্ম নিয়েছ একদিন মরবে, মরে আবার জন্মাবে আবার মরবে। এর আগে ব্রহ্ম শক্তি আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল শক্তি মানে আমি, শক্তি মানে মন; ওই মন, ওই শক্তি আপনার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে সব সময় আপনার সঙ্গে থাকবে যতক্ষণ আপনার মুক্তি না হচ্ছে। যত সাধুসঙ্গ করুন, যত শাস্ত্র পড়ুন, যত পাণ্ডিত্য থাকুক, ওই আইডিয়াগুলি যতক্ষণ আপনার ভিতরে প্রবেশ না করে ভিতরে ভিতরে আপনাকে একটা সম্পূর্ণ ত্যাগের দিকে না নিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই হবে না।

আমাদের কাছে ভক্তরা আসেন, আমি দুটো কথা বললাম, ওনারাও দুটো কথা বললেন; তবে বেশির ভাগ ভক্তরাই হলেন casual talkers, পাঁচটা জিনিস যেমন জানেন তার মধ্যে ধর্মটাও জানেন। এরপর কথামৃত থেকে নিজের কিছু পছন্দের কথা মুখস্ত করে রাখা আছে, সেটাকে নিয়ে বলবেন। কিন্তু আরও মুশকিল হল, সেটাকে নিজের মত ব্যাখ্যা করে দেন, এদের সাথে কি কথা বলব! জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মুক্তি লাভ। ধর্ম, অর্থ, কাম এগুলো নিজের নিজের স্তরে মুক্তি দিচ্ছে। কিন্তু আসল মুক্তি হল জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। হিন্দু ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য এই জীবনেই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। বাকি যা কিছু আছে এগুলো মন্দের ভাল। মানুষ কিছুই করতে চায় না, অসুরের মত সব লুটেপুটে খেতে চাইছে, জগতের সব সুখ নিজে ভোগ করতে চাইছে। ভগবানও তাই এদের ঘোরাতে থাকেন। গীতায় ভগবান বলছেন, *মূঢ়া জন্মনি জন্মনি*, জন্ম জন্ম ধরে এরা এই চক্রের মধ্যে ঘুরতে থাকে।

আপনার মধ্যে এখন যদি তমোগুণ থাকে তাহলে আপনি অসুরদের মত আছেন, রজোগুণ আছে, তখনও অসুরদের মত আছেন। সত্ত্বগুণ আসার পর বিরাট বড় সমস্যা হয়ে যায়, সত্ত্বগুণে সে মনে করছে আমি যা আছি ভালই আছে। আশেপাশের যারা আছে, তারাও মনে করছে সে ভাল আছে, তার মানে জন্ম-মৃত্যুর দ্বার খোলা। আর সত্ত্বগুণ থেকে রজোগুণে আসতে বেশি সময় লাগবে না। এরপর রজোগুণ থেকে তমোগুণে আসতেও বেশি সময় লাগবে না। ওই যে শেষ জাম্পটা দেবে, যেখানে সত্ত্বগুণকে পেরিয়ে ত্রিগুণাতীত হয়ে যাব, যেখানে সে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাবে; এই শেষ জাম্পটা না মারা হলে তিনটে গুণের ওঠা-নামা থাকবে এবং তার সাথে জন্ম-মৃত্যুর চক্রটাও আরামসে চলতে থাকবে। এখানে মজার ব্যাপার হল, রজোগুণী ও তমোগুণীদের সম্ভবনাটা বেশি থাকে, কারণ এই দুটো গুণের মধ্যে থাকার জন্য প্রচুর ধাক্কা খায়, যেমনি ধাক্কাটা খাবে, তখন বলবে, আমার আর লাগবে না। এই যে বলে দিল আমার আর লাগবে না, এবার সে সাঁ করে এগিয়ে চলে যাবে। সেইজন্য ধর্ম জীবনে কক্ষণ বলা যাবে না যে, কার হবে আর কার হবে না।

একজনকে দেখছেন খুব ভাল মানুষ, সারাদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যাচ্ছে, নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি করছে, কিন্তু দেখা গেল তার মুক্তি হল না। অন্য দিকে একজন অতি সাধারণ মানুষ, কিন্তু এমন মার খেয়ে যাচ্ছে, এত মার খাচ্ছে যে, সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে চলে গেল। তাহলে যিনি পণ্ডিত মানুষ তাঁর কেন হবে না? গীতায় ভগবান বলছেন, *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, যে মানুষ সুখী, যে মানুষ শাস্ত্র নিয়ে আছে, এরা কিন্তু ফেঁসে গেছেন। সত্ত্বগুণ হল সিল্কের দড়ি দিয়ে বাঁধা, সিল্ক নরম, আরাম অনুভব করছে, বেরোতে পারবে না। লোহা দিয়ে বাঁধা থাকলে তাও বোঝা যায়, বহির্বন্ধন পরিষ্কার বোঝা যায়, ছটফট করে। কিন্তু ভালবাসার বন্ধন থেকে মানুষ কিছুতেই বেরোতে পারে না।

আজকে আপনাকে জেলে পুরে রাখা হল, আর আপনি যদি একটু নামকরা কেউ হয়ে থাকেন, তখন কত সংস্থা, কত এনজিও, কত লোক রাস্তায় নেমে আপনাকে জেল থেকে ছাড়ানোর জন্য চিৎকার করবে। ভালবাসার বন্ধন আপনাকে নরকে বন্দী করে রেখেছে, সেখান থেকে আপনাকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা কেউ করবে না। জেলখানা যত নরক, সংসার তার থেকে আরও বাজে নরক। একটা আইনের বেড়াজালে ঘিরে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে গারদের মধ্যে পুরে রেখেছে, আরেকটাতে ভালবাসার বন্ধন দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ভালবাসার বন্ধন থেকে বেরোন অসম্ভব হয়ে যায়। একটা ঝগড়াটে মেয়েকে ডিভোর্স দেওয়া অনেক সহজ, কিন্তু যে মিষ্টি কথা বলে ফাঁসিয়ে রাখে, সাইকোপ্যাথ যারা, তাদের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনা খুব মুশকিল। সত্ত্বগুণ হল ওই সাইকোপ্যাথ, যেমনি আপনি বেরোতে যাবেন, আরেকটা সুখ, আরেকটা জ্ঞানের ইচ্ছা আপনাকে টেনে ধরে রাখবে।

বিদেশে ডক্টর ফস্টার একটা খুব নামকরা নাটক। স্বামীজীও আমেরিকায় এই নাটক দেখেছিলেন। ডক্টর ফস্টারের বিদ্যার প্রতি আগ্রহ, তিনি বিদ্যাকে নিয়ে ডুবে আছেন। ডেভিল বলল, ব্যাটাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। ডেভিল এখন ফস্টারের বিদ্যার সঙ্গী হয়ে এমন সংসাররূপী নরকে নামাতে শুরু করল, নামাতে নামাতে তাঁর একেবারে সর্বনাশ করে দিল। ওখানে অবশ্য বিদ্যার অহঙ্কারকে দেখানো হয়েছে। এখানে অহঙ্কার না, শুধু বিদ্যা জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন। এটাই ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন – শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই।

“**তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কি আছে, একজন জিজ্ঞাসা করলে, সাধু খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় ‘ওঁ রামঃ’ লেখা রয়েছে, আর কিছুই লেখা নেই**”।

যাঁরা ধ্যান করেন, ধ্যান করা মানে ঠিক ঠিক ধ্যান করা, তাঁরা এগুলো একটু ধারণা করতে পারবেন। জপ করলে কেন হবে না, অবশ্যই হবে। কিন্তু আসলটা হল ধ্যান, ধ্যান মানে ঈশ্বরে মনটা একেবারে যেন ডুবে যায়। জপ করতে করতেও যদি মন ইষ্টে ডুবে যায়, তখন মালা থেমে যায়, হাত থেমে যায়। আমাদের মত লোকেদের উল্টোটা হয়, মালাটাও থেমে যায় আর মনটাও ইষ্ট থেকে পালিয়ে যায়, এখানে সেটার কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে মনটাকে ইষ্টে বসানো, তা ধ্যান করেই হোক আর জপ করেই হোক। ইষ্টে মন ডুবে যাওয়া, ঈশ্বরে মন ডুবে যাওয়া, উদ্দেশ্য এটাই।

ঠাকুরও কথামৃতে বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে, গায়ত্রী ওঁঙ্কারে লয় হয়। সমস্ত শাস্ত্র যখন পড়ে নেবেন, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি সব কিছু পড়ার পর দেখবেন সব শাস্ত্রের সার কথামৃতে রয়েছে। সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিকতার যা কিছু আছে, তার নির্যাস কথামৃতে রয়েছে। তাহলে আর অন্য শাস্ত্র পড়া কেন? এইজন্যই পড়া, কথামৃতের নির্যাস ইষ্টমন্ত্রে রয়েছে, ইষ্টমন্ত্রের নির্যাস ওঁঙ্কারে রয়েছে, ওঁঙ্কারের নির্যাস মৌনে রয়েছে। তাহলে কথামৃত পড়ার দরকার নেই। যদি কথামৃত পড়ার দরকার থাকে, তাহলে বাকি শাস্ত্রগুলিও পড়ার দরকার আছে। কারণ, তা নাহলে কিছুই ধারণা করতে পারবেন না। এ এমন সূক্ষ্ম জিনিস যে, কবে জালের ফোকর দিয়ে মাছ বেরিয়ে গেল, বুঝতেও পারবেন না। মনকে সূক্ষ্ম করার জন্য খাটতে হয়।

ব্যাখ্যা দিতে ভারতীয়রা ওস্তাদ, যে কোন জিনিসের ব্যাখ্যা দিতে বলুন, আপনাকে ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে। ঠাকুর কি পড়েছিলেন? লাটু মহারাজ কি পড়েছিলেন? একজন আমাকে বললেন, ‘বাক্ বৈখরী নিয়ে খুব ঝেড়ে যাচ্ছেন’? ‘কি আর করি ভাই, এটাই আমার সাধনা’। নিন্দা করতে হলে যে কোন একটা কিছু নিয়ে নিন্দা করে দেওয়া যায়। খ্রাইস্টকেই ক্রুশিফাই করে দিল, সেখানে আমরা তো চুনোপুটি। আসলে যেমন যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়, যেমন যেমন শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করা হয়, তেমন তেমন মন সূক্ষ্ম হতে শুরু করে। মন সূক্ষ্ম হওয়া মানে শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। ব্রহ্ম ও শক্তির আলোচনায় বলা হল, মনও যা শক্তিও তাই। কেন্দ্রিত মন যা সূক্ষ্ম মনও তাই, কেন্দ্রিত মন যা শক্তিও তাই, কেন্দ্রিত মন

মানেই শক্তি। এই সংসার শক্তির খেলা, এই সংসার থেকে বেরোতে গেলে শক্তির দরকার পড়ে। শক্তি না হলে কখনই এই সংসার থেকে বেরোন যাবে না। কেন্দ্রিত মন মানেই শক্তিতে সঞ্চিত মন। শক্তি আসে একাগ্র মন থেকে, ধ্যান মনকে একাগ্র করে। ইষ্টমন্ত্রে ইষ্টের যে স্বরূপ বলা হয়েছে, ইষ্টের যে গুণের কথা বলা হয়েছে, সেটা নিয়ে যখন চিন্তন করতে থাকছে, তখন মন ইষ্টে ডুবে গেল। মন যখন ডুবে গেল মন তখন একাগ্র হয়ে গেল। একাগ্র মন শক্তিমান।

'ওঁ রামঃ' যে সাধুর খাতার পাতায় পাতায় লেখা আছে, সেই সাধু যখন খাতার একটা যে কোন পাতা উল্টাচ্ছেন তিনি পড়ছেন, 'ওঁ রামঃ', সাধুর মন রামে ডুবে যাচ্ছে, রাম ছাড়া তিনি আর কিছু দেখছেন না। শাস্ত্র আদি পড়ার উদ্দেশ্য হল, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মনকে বসানো। যদি ধ্যান করে মন বসে যায়, তাহলে খুব ভাল। আর যদি ধ্যান না হয়, জপ করে, জপ যদি না হয় শুধু ওঁ ওঁ ওঁ জোরে জোরে উচ্চারণ করে, তাতেও যদি না হয়, কথামৃত পড়ে, তাতেও যদি না হয় তাহলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকুন। আপনি দেখুন আপনার মন কোথায় কিভাবে একাগ্র হচ্ছে। মন একাগ্র হলে দেখবেন, পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই আপনাকে সম্মান করবে। আপনি বলবেন, নিকুচি করেছে পাড়া-প্রতিবেশীরা আমাকে মানে কিনা। পাড়া-প্রতিবেশীরা যদি আপনাকে না মানে, তারা যদি ধরতে না পারে যে, আপনার ভিতরে শক্তি আছে, তাহলে বুঝবেন আপনার ভিতরে কিছু নেই। পাঁচজন লোককে মানতে হবে যে, আপনার ভিতর শক্তি আছে। খ্রাইস্টকে যখন ক্রুশিফাই করছে, তাঁর শিষ্যরা জানছেন, ইনি একজন বিরাট পুরুষ। সবাই না মানতে পারে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, এর ভিতর শক্তি আছে। এরপর গীতার অর্থ নিয়ে ঠাকুর বলছেন –

"গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা', দশবার বলতে গেলে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা – হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়"।

এই যে বলছেন, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়; মানুষ সব আসক্তি ত্যাগ করতে পারে না। ঠাকুর যেমন বলছেন, মা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন। কিছুতেই আসক্তি যাবে না। কিছু না করার থাকলে চলে যাবে পরের মঙ্গল করতে। স্বামী অখণ্ডানন্দজী মঠের প্রথম সন্ন্যাসী যিনি মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের সময় সারগাছিতে রিলিফ করছিলেন। সেই সময় কোন সংস্থার ব্যানারে রিলিফ হবে এই নিয়ে খুব সমস্যা দেখা দিয়েছিল। স্বামীজী তখন বলছেন, মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে, আর এই সময় তোমরা নাম নিয়ে ঝামেলা করছ। ওটারও দরকার আছে, তা নাহলে ফাণ্ড আসবে না, কিন্তু ওটা শেষ কথা নয়। এক নম্বর – ঈশ্বরের দিকে যদি এগোতে চান আর দুই নম্বর – সংসারে যদি শক্তি পেতে চান, তাহলে আসক্তি থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনি যাই হয়ে থাকুন, আসক্তিকে আপনার ছাড়তে হবে।

বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের দেখুন, নিজেদের গবেষণাতে ডুবে থাকার জন্য জাগতিক ব্যাপারগুলিতে তাঁদের প্রচণ্ড অনাসক্তি লক্ষণীয়। আইনস্টাইন যখন থিওরি অফ রিলেটিভিটি লিখছেন, তখন তাঁর দুই সন্তান। ছোটটাকে কোলে রেখে ঘুম পাড়ানোর জন্য ছেলের পিঠে বাঁ হাত দিয়ে চাপড়ে যাচ্ছেন, আর ডান হাত দিয়ে লিখে যাচ্ছেন। বড় ছেলে এসে বলে যাচ্ছে, বাবা খিদে পেয়েছে খেতে দাও; আইনস্টাইনও সমানে ওকে বলে যাচ্ছেন, এই যাচ্ছি। স্ত্রী কোথাও বাইরে গেছেন, আর তিনি বাড়িতে দুই ছেলেকে সামলাচ্ছেন, ছোটটাকে কোলে রেখে পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন, অন্য হাতে লিখে যাচ্ছেন; আরেক দিকে অন্যজন বলে যাচ্ছে, বাবা খিদে পেয়েছে।

বার্ণার্ড শ একটা জায়গায় বলছেন, লেখক কে হতে পারে? বাড়িতে খাওয়া নেই, তোমার স্ত্রীর কোলে সদ্যোজাত শিশু, যাও তোমার স্ত্রীর বুক থেকে দুধ বার করে সেই দুধ বাজারে নিয়ে বিক্রি কর, বিক্রি করে যে পয়সা হবে সেই পয়সা দিয়ে কালি কেনো, কারণ তোমার কালি কেনার পয়সা নেই

কিনা। এরপর সেই কালি দিয়ে সাদা কাগজে সাহিত্য রচনা কর। এই রকম দম যদি তোমার মধ্যে থাকে তবেই তুমি লেখক হতে পারবে। এটাই দেখার, যে মুহুর্তে বিদ্যার প্রতি যাচ্ছে, বাকি সব কিছু সে ত্যাগ করে দিচ্ছে, নিজের সন্তান, নিজের স্ত্রী, কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। আমরা এসব শুনে বলব, থাক বাবা, আমার দ্বারা এই জন্মে হবে না, পরের জন্মে দেখা যাবে। তাহলে এটা অন্তত বলবেন না যে, কিসে হবে। এই যে ঠাকুর বলছেন, সাধুই হোক সন্ন্যাসী হোক, কোন তফাৎ নেই, সাধনার জন্য যা যা করার, যা যা দরকার সবার জন্য সমান। তাহলে ঠাকুর যে বলছেন, সংসারীদের কেন হবে না, হবে, কিন্তু বিষয়াসক্তির একটু ফেকড়ি থাকলে হবে না। পরে বলবেন, আসক্তি ঘুরে ঘুরে কোথা থেকে যে চলে আসবে টের পাওয়া যাবে না। এই টপিকটা আবার ঘুরে আসবে, তার আগে ভালবাসা নিয়ে বলছেন –

"চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণে করছিলেন – দেখলেন, একজন গীতা পড়ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে – কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাস করলেন, তুমি এ-সব বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর আমি শ্লোক এ-সব কিছু বুঝতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বললে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি"।

এটাই উদ্দেশ্য। ঠাকুর বলছেন নামজপ কিভাবে বুঝতে হয়, গায়ে যদি কাঁটা দেয়। একবার ঈশ্বরের নাম শুনলে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে কিনা। জপধ্যান করছেন, হরিনাম করছেন, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে না, শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে না, মন ঈশ্বরে ডুবে যাচ্ছে না; তাহলে বুঝতে হবে এখনও অনেক সময় লাগবে। ধ্যান হবে না, এখন জপ করতে থাকুন, দিনে কয়েক হাজার করে জপ করলে মন কিছুটা বসবে। এমনিতেও আমাদের বলা হয়, জপ-ধ্যান-পাঠ। ধ্যান করার আগে জপ করবে, জপের আগে পাঠ। এই ভাবে করতে থাকলে আস্তে আস্তে মন সূক্ষ্ম হতে শুরু হবে। ধ্যান থেকে যখন নামবেন, তখন আবার পাঠে মন লাগিয়ে দিতে হবে। সব সময় মনকে ঈশ্বর চিন্তনে ডুবিয়ে রাখলে তবে গিয়ে ধীরে ধীরে মন একাগ্র হয়। এরপর পঞ্চম পরিচ্ছেদ শুরু হয়। সেখানেও ভক্তিকে নিয়েই চলছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্তিযোগের রহস্য

"শ্রীরামকৃষ্ণ – বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে, 'আমি' যায় না"। এই যে একটু আগে বলা হল, 'আমি' কিছুতেই যাবে না। আমরা যেখানে ব্রহ্ম শক্তিকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আবার যদি সেখানে যাই – শুদ্ধ চৈতন্য সচ্চিদানন্দ যিনি, তিনিই আছেন। কিন্তু এটা একটা বিরাট রহস্য, এই 'আমি' কোথা থেকে, কার ক্ষেত্রে, কখন আসে, কিভাবে আসে, কেউ জানে না, কিন্তু থাকে, এ এক রহস্য। জ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত থাকে। মুশকিল হল, জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর মন আবার চলে আসে, 'আমি' আবার চলে আসে। মন মানে শক্তি, শক্তি চলে আসে, আমি, মন ও শক্তি চলে আসে মানে, সংসার চলে আসে। সংসারকে জ্ঞানী এখন মজা রূপে দেখতে পারেন, যে রূপেই দেখুন, সংসার থাকবেই। মাধ্বাচার্য ঠিক এই জায়গাতে আক্রমণ করেন, তোমার নির্বিকল্প তো তোমার মনের অবস্থা, তার আগেও ঈশ্বর, তার পরেও ঈশ্বর সেইজন্য দ্বৈতই সত্য। মাধ্বাচার্য একজন সম্প্রদায় আচার্য, তাঁর বক্তব্যের উপর আলোচনা করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। আমরা যাঁর পথে চলি, তিনি যেমনটি বলে দিয়েছেন, সেটাকেই মেনে চলি।

'আমি' যাওয়া নিয়ে ঠাকুর পরের বাক্যে বলছেন, **"সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না। অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেঁকড়ি বেরিয়েছে"**।

যাঁরা ধর্ম পথে নূতন নূতন আসেন, কি সুন্দর বলে দেন, মহারাজ আমি আমার আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আমার আমি নেই। সেইজন্যই আগেকার দিনে উপনিষদ আদি সাধারণ লোকেদের জানতে দেওয়া হত না। কিছু করার নেই, এখন সবাই কথামৃত পড়ে নিচ্ছে; হিন্দুরা গত আট হাজার দশ হাজার বছর ধরে যা যা অর্জন করেছেন, একটা বইয়ের মধ্যে সব এসে গেছে, কথামৃত পড়ে নিলে সব জেনে যাবেন। বুঝতে তো কেউ কিছু পারবেন না, কিন্তু বলা চাই – আমার আমি বলে কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন, সাধারণ জীবের অহং যায় না। বিভিন্ন ভাবে এই আমি ভাব এসে যাবে। স্বামী মরে গেল, এবার সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। সন্তান নেই, সোস্যাল ওয়ার্কে নেমে যাবে। সোস্যাল ওয়ার্ক নেই, আশ্রমের কাজে নেমে যাবে। কিছু নেই, সব জায়গা থেকে খেদিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে, রাস্থার একটা বিড়ালকে ধরে আনবে। আমি কিছুতেই যাবে না, যতক্ষণ বেঁচে আছেন, তার চেয়ে বড়, সমাধি অবস্থা ছাড়া আমি থাকবেই।

“জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে আমি এসে পড়ে। স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক ধুড়দুড় করছে”।

জ্ঞানীরও আমি থাকবে। কারণ জ্ঞানীর যে সংস্কারগুলো থেকে গেছে, যদিও পরে সেগুলো ক্ষতি করে না, কিন্তু তাঁর যে অভ্যাস, তাঁর যে প্রবৃত্তি, তাঁর যে সংস্কার, সমাধির আগে যেমন ছিল, সমাধির পরেও সেগুলো চলতে থাকে। ঠাকুর গ্রামের লোক ছিলেন, তাঁর যে ভাষা, তাঁর যে approach, সব কিছু এক ভাবে চলতে থাকবে। অন্য দিকে স্বামীজীর সমাধির আগে একটা রাজকীয় ভাব ছিল, সমাধির পরেও সেটা বরাবরের জন্য থেকে গেল। ভগবান বুদ্ধ সমাধির আগে একটা নির্বিকার ভাবে থাকতেন, সমাধির পরে নির্বিকার ভাবেই থাকলেন। গীতায় যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা বলা হয়, সেটা এক বিশেষ সাধুদের কথা বলা হয়েছে, সব সাধুদের ওরকম হবে না। যিনি জ্ঞানী, যিনি সমাধিবান পুরুষ, আগে দেখুন সাধনার আগে তিনি কি ছিলেন, সাধনার পরেও তাই থাকবেন। সিদ্ধি লাভের পর তাঁর কোন পরিবর্তন হবে না। দুর্বাসা মুনি অভিশাপ দিতেই থাকবেন, বিশ্বামিত্র মেয়েদের পিছনে দৌড়াতেই থাকবেন, কিন্তু মাঝখান থেকে জ্ঞান হয়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করলেন, পরে ষোল হাজার বন্দি রাজকন্যাদের বিয়ে করলেন। প্রবণতার কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু মাঝখান থেকে যে জ্ঞান হয়ে গেল, সেই জ্ঞান লাভের পর গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধতে পারবেন না, সত্যভামা, সেও বাঁধতে পারবেন না, আর রুক্মীণিও বাঁধতে পারবেন না। কাউকে তিনি বধ করবেন, শাসন করবেন, কিন্তু তার মধ্যে কোন বিষ থাকবে না, কারণ ওটাই ওনার স্বভাব, ওই স্বভাব নিয়েই তিনি বড় হয়েছেন। যদিও আমরা এনাদের নিয়ে আলোচনা করতে পারি না, কারণ এনারা হলেন অবতার। কিন্তু যাঁরা সাধু, মহাত্মা, যেমন তুলসীদাস বিয়ের আগে সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, একজন সৃজনশীল মানুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, তখনই হনুমান চালিশা রচনা করেন। এই ধরণের মানুষ ভক্তিলাভ করে রামচরিতমানস লিখবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। জ্ঞান লাভের পর মানুষ আপনাকে কিভাবে দেখবে যদি জানার আগ্রহ থাকে, তাহলে এখন থেকেই আপনার নিজেকে ঠিক করে নিতে হবে। কারণ এখন আপনি যা আছেন, জ্ঞান লাভের পর তাই থাকবেন। জ্ঞানের পর আপনি দুর্বাসা মুনি হয়ে থাকবেন, না বিশ্বামিত্র হয়ে থাকবেন, নাকি বশিষ্ঠ মুনি হয়ে থাকবেন, এখন থেকেই ঠিক করে নিন।

ঠাকুর বলছেন, **“জীবের আমি লয়েই তো যত যন্ত্রণা। গরু ‘হাম্বা’ (আমি) ‘হাম্বা’ (আমি) করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদবৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয় – তখন খুব পেটে”**। (হাস্য)

ঠাকুরের এই কথার মূল ভাব হল, জ্ঞান যদি না হয়ে যায়, মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকবে। সেই একই গরু তো জন্মাবে না; গরুর যে চেতনা, আর তার চামড়া, দুটো আলাদা জিনিস, সেটাকে নিয়ে বলা হচ্ছে না। আপনার যে চেতনা, তা যে রূপেই হোক, যদি জানেন যিনি দেখছেন তিনিই দেখবেন, একই identity continue করছে; জন্ম-জন্মান্তরে আপনার ওই একই জিনিস চলতে থাকবে। এই জন্মে এক রূপে আছেন, পরের জন্মে অন্য রূপে থাকবেন, তার পরের জন্মে অন্য একটা রূপে থাকবে, কিন্তু হাম্বা হাম্বা অর্থাৎ আমি আমি এই বোধটাও কখন চলে যাবে না, চলতে থাকবে।

আমি মানে মন, মন মানেই শক্তি, মনোনাশ যতক্ষণ না হয়, শক্তি শেষ যতক্ষণ না হয়, আমি থাকবে, আমি থাকলেই জন্মে জন্মে প্রচুর মার খেয়ে যেতে হবে, ঠাকুর এটাকে বলছেন – তাই তো অত যন্ত্রণা, লাঙলে জোরে, রোদবৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয় – তখন খুব পেটায়। কেন এত যন্ত্রণা? একটাই কারণ, 'আমি' 'আমি' করে বলে। প্রচুর মার খাওয়ার পর প্রকৃতি একটু আদর করবেন, ওই আদরের জন্য আবার আমিটা জোর পেয়ে গেল। এরপর এমন চড়-চাপড় মারবে, তখন ভিতরে বিরক্তি এসে গিয়ে ত্যাগের ইচ্ছা জাগবে। যখন দেখল মারটা বেশি হয়ে গেল, প্রকৃতি ভাবল যদি ত্যাগের রাস্তায় চলে যায়, এতো আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। প্রকৃতি তখন একটু মিষ্টি ফল ধরিয়ে দেবে।

ছাগলগুলিকে যখন বলি দিতে নিয়ে যায় তখন ছাগলকে কাঁঠাল পাতা, কচি কচি ঘাস খাইয়ে দেয়। আমরাও ওই একটু মিষ্টি ফল, একটু আদর, ভালবাসা পেয়ে হাড়িকাঠে বলি হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমরা এ-ভাবেই বলি হচ্ছি। একটা ঘটনা আগেও আমি বলেছিলাম। মঠে বসে আছি। এক বয়স্ক দম্পতি আমার দিকে এগিয়ে এসেছে। বয়স্ক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি মঠের সন্ন্যাসী'? আমি বললাম, হ্যাঁ। 'আমরা সুইসাইড করতে চাই'। আমি এত রেগে গেলাম যে, বলেই ফেললাম, 'সামনে গঙ্গা আছে, যান ওখানে ঝাঁপ দিন'। তারপর নরম হয়ে বললাম, 'আপনাদের সমস্যা কি'?

সংক্ষেপে ঘটনা হল, এনারা প্রচুর বড়লোক, কিন্তু উচ্চমানের একটা পরিবার। বাড়িতে বউমা শ্বশুড় শাশুড়ির উপর খুব অত্যাচার করে। আমি মজা করে বললাম, 'আপনার স্ত্রীকে মারধর করে নাকি'? ভদ্রলোক বললেন, 'মাঝে মাঝে গায়েও হাত তোলে'। 'আপনরা আলাদা একটা ঘর ভাড়া করে থাকছেন না কেন'? ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের অনেকগুলো বাড়ি আছে, ভাড়া কেন করতে যাব'! 'তাহলে আপনি ওদের সাথে ওই জঞ্জালের মধ্যে কেন পড়ে আছেন'? 'কি করি, ওখানে নাতিটা আছে কিনা, একবার মিষ্টি করে যখন দিদা বলে, প্রাণটা তখন জুড়িয়ে যায়'। দিদা নাতিকে ছাড়া থাকতে পারছেন না বলে, বয়স্ক ভদ্রলোকও ওখান থেকে সরে আসতে পারছেন না। 'উনি না সরলে আপনি সরে যান'। 'স্ত্রীকে ছেড়ে কি করে আমি যাই'! 'স্ত্রী কেন যাবেন না'? 'নাতি আছে, তাই'। ওই নাতিকে নিয়ে ওখানে পড়ে থাকতে চাইছে বলে বউমার কাছে গালাগাল তো খাচ্ছেই তার সাথে মারও খাচ্ছে। ওই নাতি 'দিদ্দা' 'দিদ্দা' 'দাদ্দা' 'দাদ্দা' করবে, 'আমার নাতি', 'আমার নাতি' করে হাম্বা হাম্বা করছে; যার ফলে পেটাই খাচ্ছে, চামড়া দিয়ে ঢোল বানিয়ে চড়াম্ চড়াম্ করে মার খাচ্ছে। গরু রোদ-বৃষ্টিতে লাঙল টানছে, তারপর জুতো হচ্ছে, ঢোল হচ্ছে। এই অবস্থায় কে তাঁকে পথ দেখাবে। যদিও গঙ্গায় ঝাঁপ দেননি, কিন্তু যদি ঝাঁপ দিতেন তাহলে কি হত? এই জন্মে মানুষ হয়ে ওই রকম মার খাচ্ছিল, এরপর মরে ছাগল হয়ে বাচ্চার পিছনে ম্যা ম্যা করে দৌড়াতে থাকবে। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই ঘুরবে।

হিন্দুরা এটাই বলেন, মরে গেলেই যে মুক্তি পেয়ে যাবে, একেবারেই না; জ্ঞান যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ এভাবেই তুমি ঘুরবে। ঠাকুর যখন বলছেন সংসারে থাকলে কি হবে না, অবশ্যই হবে, ওই কিছুদিনের জন্য একটু সুখ হবে, দিয়ে আবার সেই কষ্ট।

"তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে 'তুঁহু' 'তুঁহু' (অর্থাৎ 'তুমি', 'তুমি')। যখন 'তুমি', 'তুমি' বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর, আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা"।

ব্রহ্ম ও শক্তির আলোচনা করার সময় তিনটে সত্যের কথা বলা হয়েছিল – আমি, তুমি ও তিনি। তুমিটাই জগৎ, আমরা যে সারাক্ষণ জগৎ জগৎ করছি, আসলে তুমি, শুধু তুমিকে নিয়েই যা কিছু। আমিও জগৎ রূপে আছি ঠিকই, কিন্তু আমিই আবার তিনি রূপে আছেন। আমি যখন জগৎ রূপে আছি, তখন মার খাচ্ছি। প্রচুর মার খেতে খেতে একটা জায়গায় এসে বলে, আর না। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, আগেকার দিনে গ্রামের মায়েরা সংসারের সব কাজ করতেন। সব কাজ করার পর একবার যখন স্নানের জন্য বেরিয়ে গেলেন, তখন আর ডাকলেও ফিরে আসবেন না। আমরা কষ্ট সহ্য করি ঠিকই, কিন্তু একটা অবস্থার পর আর যখন কষ্ট নিতে পারি না, তখন বলে দিই, অনেক হয়েছে, আর না। ওই যে বেরিয়ে গেল, আর সে ফিরে আসবে না।

যাদের আমরা খুনী, ডাকাত, ধর্ষণকারী দেখছি, এদের কাছে জগৎ খুব সত্য। মনে করছে একটা মেয়ের শীলহানি করতে পারলে আমি খুশী হব, মেয়েটির প্রাণ যাচ্ছে, সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, এটা বোঝার ক্ষমতা এদের নেই। আইন যখন তাকে এসে খুব মারতে শুরু করে, তখন একটা জায়গায় এসে তার চেতনা জাগে – নাঃ আর এদিকে নয়। এবার সে ওই জায়গা থেকে ঘুরে গেল। এই করে করে তমোগুণের বৃত্তিগুলি কমতে শুরু হয়ে রজোগুণের বৃদ্ধি হবে, সেখান থেকে সত্ত্বগুণ জাগতে থাকবে, একটু সত্ত্বগুণ এলে সে ধর্মের পথে আস্তে আস্তে পা ফেলতে আরম্ভ করবে। এরপর যখন দেখে তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস, তখন গিয়ে তার মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে শুরু করে।

"রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে, রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি"।

গীতায় ভগবান বলছেন, *যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।* ভক্তদের যার যেমন ভাব, তার শ্রদ্ধাকে আমি তেমনই রেখে দিই। শ্রীরামের প্রতি হনুমানের যে ভাব, হে রাম! তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস, হনুমানের তাই হবে। তফাৎ হল, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ওই একটা ভাব হয়ত অনেক জন্ম ধরে চলবে। কিন্তু ঠাকুর বা মহাবীর হনুমানের মত ব্যক্তির ভাব কিছু দিন অন্তর অন্তর পালটায়। ঠাকুর প্রায়ই বলছেন, আমার ভাব এখন পাল্টাচ্ছে। এনারা হলেন ভাবঘন পুরুষ, ভাবের স্টোরহাউস, কখন অদ্বৈত ভাবে আছেন, কখন দ্বৈত ভাবে আছেন, ভগবানকে কখন মা রূপে দেখছেন, কখন বন্ধু রূপে দেখছেন, কখন পিতা রূপে দেখছেন, কখন নিজের রূপে দেখছেন। এই জিনিসটাকেই ঠাকুর এখানে হনুমানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন।

আমরা ধরেই নিচ্ছি মাস্টারমশাই কথামৃতের সব কিছু খুব সততা ও বিশ্বাসের সঙ্গে রেকর্ড করেছেন, এতটাই বিশ্বাসযোগ্য যে, যেখানে 'সকলের হাস্য' সেটাও লেখা আছে। আমি তাই অবাক হয়ে ভাবি, বিদ্যাসাগর মশাই এত পণ্ডিত মানুষ, তিনি সেখানে বসে আছেন, আরও অনেকে আছেন, সবার মাঝখানে ঠাকুর গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগর অত বড় সংস্কৃতের পণ্ডিত, তিনি চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন, মাঝে মধ্যে একটা দুটো কথা বলছেন। আমরা বলতে পারি, তিনি একজন ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের বাড়িতে কেউ এলে তাঁর কথা শুনতে হয়, নিজের কথা চাপিয়ে দিতে নেই, এটাই ভদ্রলোকের পরিচয়। দ্বিতীয়, দক্ষিণেশ্বরের কথা মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবাই শুনছেন। লাটুর মত নিরক্ষর একজন চাকরও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন, নরেন্দ্রের মত পড়াশোনা করা লোক, অধর সেনের মত অত বড় ডেপুটি, এনারাও ঠাকুরের কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন।

আমাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার শ্রোতাদের কিছু ভাল হচ্ছে তো? কি ভাল হবে! বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিত, ঠাকুর সেখানে ঢেলে যাচ্ছেন, আর আমরা দিনের পর দিন সেটার উপর আলোচনা করেই যাচ্ছি, তাও বিদ্যাসাগরের এপিসোড শেষ করতে পারছি না। বিদ্যাসাগরের তাতে কি হল? কিছুই না। মাস্টারমশাই তাঁর ছাত্রদের ঠাকুরের কাছে পাঠাচ্ছেন, মাস্টারমশাইকেই বিদ্যাসাগর তিরস্কার করছেন। নরেনের মত ছেলে তাঁর স্কুলে শিক্ষকতা করছেন, নরেনকে তিনি গুরুত্বই দিলেন না। বিদ্যাসাগরের মধ্যে তখন হয়ত সত্ত্বগুণ কিছুটা উঠেছে। সত্ত্বগুণও বড় বন্ধন। তমোগুণীরা বরঞ্চ শিখে নেবে, রজোগুণীরাও শিখে নেবে, কারণ রজোগুণীরা বেরোবার জন্য ছটফট করছে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মধ্যে এখনও বেরোবার জন্য সেই ছটফটানিটা হচ্ছে না। সত্ত্বগুণী কিনা, সত্ত্বগুণ, অর্থাৎ জ্ঞান ও সুখ এই দুটো আরও বড় বন্ধন। ঠাকুর ঢেলেই যাচ্ছেন, বিদ্যাসাগর মশাই একটিও কথা বলছেন না। মন দিয়ে শুনছেন ঠিকই, যার জন্য বলছেন, আজ নূতন কথা শুনলাম। কিন্তু একটা দীর্ঘকালীনের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রভাব হওয়ার কথা, সেটা একেবারেই দেখা যায়নি। অনেকে বলবেন, কেন পরের জন্মে হবে। আমরা এখানে পরের জন্মের কথা বলছি না, এই জন্মের কথাই বলা হচ্ছে। ঠাকুর আবার বলছেন –

“**সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। ‘আমি’ তো যাবার নয়। তবে থাক শালা ‘দাস আমি’ হয়**”।

ঈশ্বরের প্রতি যদি ভালবাসা, ভক্তি, ভাব আনতে হয়, তুমি-আমি এক এই ভাব দিয়ে হবে না, আমি তোমার দাস, এই ভাব নিয়েই চলতে হয়। এই জিনিসটাকেই আরও বিস্তারে বলছেন –

“**আমি ও আমার এই দুটি অজ্ঞান। ‘আমার বাড়ি’, ‘আমার টাকা’, ‘আমার বিদ্যা’, ‘আমার এই সব ঐশ্বর্য – এই যে ভাব এটি অজ্ঞান থেকে হয়**”। আমরা তুমি, আমি ও তিনি এই তিনটেকে নিয়ে আলোচনা আগে করলাম, যখন আমি তুমির সঙ্গে জুড়ে দেয়, তখনই এই জিনিসগুলি আসে। আমার আমিত্বকে যখন সংসারের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি – এটাই অবিদ্যা। এটাই যখন ঈশ্বরের সাথে জুড়ে দিচ্ছি – এটাই বিদ্যা। **‘হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এ-সব তোমার জিনিস – বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব – এ-সব তোমার জিনিস’ – এ-ভাব জ্ঞান থেকে হয়**”। কারণ ঈশ্বরই এখন প্রধান হয়ে গেলেন, ‘তুমি’ যেটা আছে, এটা তাঁর।

এবার ঠাকুর মৃত্যু প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন। “**মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত**”। হিন্দুরা এটা চিরদিনই করতেন। স্বামীজীও আমেরিকাতে গিয়ে বলছেন, আমরা মৃত্যুকে জয় করেছি। স্বামীজী বারবার বলতেন, সন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভালবাসবে। মৃত্যুকে ভালবাসা মানে যে সে হতাশা, বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেছে তা না, মৃত্যুকে সে ভয় করে না। বলছেন, “**মরবার পর কিছুই থাকবে না**”। কিছুই থাকবে না মানে, এখন যেখানে আছেন, এর কিছুই থাকবে না। কিন্তু আপনার যে সংস্কার-আদি, এগুলো চলতে থাকবে, মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এগুলো যাবে না।

“**এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা**”। হিন্দুরা চিরদিনই বলেন যে, বিবর্তনের স্কেলে আমাদের নীচে যেমন অনেকেই আছে, তেমনি আমাদের উপরেও অনেকে আছেন। কিন্তু এই বিবর্তনে আমাদের একটা সুবিধা আছে, কারণ আমাদের মানব-শরীর এমন যে এই শরীর দ্বারা এখানে কর্ম করা যায়, বাকি সব শরীরে শুধু ফল পাওয়া যায়। পিঁপড়ে হয়ে, বিছে হয় জন্মালে শুধু ফলটুকু পাওয়া যাবে, কর্মের স্বাধীনতা সেখানে নেই। অন্য দিকে দেবতারা আমাদের উপরে, ওনারাও ফল পাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদেরও কর্মের স্বাধীনতা নেই। কর্মের স্বাধীনতা একমাত্র মানব শরীরে সব থেকে বেশী পাওয়া যায়। ঠাকুর এটাই বলছেন – এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা।

সেইজন্য আমাদের এক মিনিটও ফাঁকা বসে থাকতে নেই। ধ্যান যদি না হয়, জপ করুন; জপ করা যাচ্ছে না, পূজা-অর্চনা করুন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন। এগুলোর কোনটাই করা হচ্ছে না, সংসারের

কাজ করুন; ঘরদোর পরিষ্কার করে একেবারে ফিটফাট রাখুন, কেউ এলে যেন বলতে পারে, আরেব্বাস্ এ যে দেখছি একেবারে বেলুড় মঠের গর্ভগৃহ। কারণ আপনি যা কিছু করছেন, সব কাজই পূজার মত করছেন। জামা-কাপড়, বই, টেবিল, চেয়ার সব কিছু ফিটফাট। এইসব করার পর হাতে যদি সময় থাকে, তাহলে ভাবুন দুটো পয়সা কি ভাবে রোজগার করা যায় – দুটো লোকের ভাল কি করে করা যেতে পারে। কারণ আমাদের এখানে আসা হল কর্ম করার জন্য।

কর্ম করলে তমোগুণের নাশ হয়। অনাসক্ত ভাবে করলে বা ঈশ্বরের সেবা করছি, ভক্তি করছি, এই ভাব নিয়ে করলে রজোগুণ সত্ত্বগুণে পাল্টে যায়। আর ওই জায়গাতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব যদি লাগানো যায়, তখন এই সত্ত্বগুণই আপনাকে ত্রিগুণাতীতের দিকে নিয়ে যাবে। সেইজন্য মৃত্যুকে মনে রাখতে হয়, আর তার সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এখানে আমরা কর্ম করতে এসেছি। কারণ মৃত্যুর পর আমাকে অন্য আরেকটা শরীর ধারণ করতে হবে। সেই শরীর দিয়ে কর্ম করে করে মারা যাবার পর আবার আরেকটা শরীর নিয়ে আসব। কিন্তু আমাকে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে হবে, আমার মুক্তি চাই।

"যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি–কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে 'এ-বাগানটি আমাদের', 'এ-পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না, দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।"।

সেইজন্য সব সময় আমাদের মনে রাখতে হয়, এখানে আমার বলে কিছু নেই। আমরা মনে করছি, এটা আমার, ওটা আমার, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমার স্বামী, আমার বাড়ি; কিন্তু একটা কিছু হয়ে গেলে চোখের নিমেষে সব খালি হয়ে যাবে, কিচ্ছু থাকবে না। এটাকেই ঠাকুর আরও টেনে নিয়ে গিয়ে বলছেন –

"ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 'মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দিব'–তখন একবার হাসেন, এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে আমি বাঁচাব। কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা–এ কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে 'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আর-একবার হাসেন; এই মনে করে হাসেন, আমার জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, 'এ-জায়গা আমার আর তোমার'।

এই কথাগুলো ঠাকুরের নিজস্ব কথা না, গ্রামের প্রচলিত কথাগুলিকেই ঠাকুর একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করছেন। এই কথাগুলি দিয়ে ঠাকুর সেই আধ্যাত্মিক সত্যটাই বলতে চাইছেন – কর্তা একমাত্র ঈশ্বর। ঠাকুরের কথাগুলো শোনার পর ভাবতে গেলে অবাক লাগে যে, কামারপুকুরে ঠাকুরের নিজের রক্তের সম্পর্কের যারা, সারাটা জীবন দড়ি ফেলে নিজের লোকেদের জ্বালিয়ে গেল। আর ওদিকে জয়রামবাটীতে মায়ের ভাইয়েরা সারা জীবন মাকে দড়ি ফেলে জ্বালিয়ে গেল। মুখার্জী পরিবারেই জন্ম নিন, চ্যাটার্জী পরিবারেই জন্ম নিন, আর ভট্‌চার্যী পরিবারেই জন্ম নিন, দড়ি ফেলাটা যাবে না। অবতারের যিনি নিজের লোক, তারাও অবতারকে ছাড়ছে না, এটাই মায়া। ভগবান হাসেন – বেশ আছে। মূল বক্তব্য, যখনই ঠাকুর কারুর সাথে কথা বলছেন, তিনি বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছেন, যার মাটি যেমন তৈরী, বৃক্ষও সেখানে তেমন তৈরী হবে। কথামৃত যখন পড়ছি, বা যে কোন শাস্ত্র যখন পড়ি, তখন মনে রাখতে হয় – সবাইকে শাস্ত্র সেই একই কথা বলবেন, ফল যেটা হবে, সেটা নির্ভর করে আমার আপনার মাটি কেমন তৈরী আছে।

ঠাকুর এবার উপায় নিয়ে বলছেন। উপায় হল – বিশ্বাস ও ভক্তি। বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে ঠাকুর এখন অনেকগুলো কথা বলবেন। ঠাকুর এই বলে শুরু করছেন –

"তাঁকে বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক"।

একটু পরে আরেকটা বাক্য আসবে, দুটোকে মিলিয়ে আমরা আলোচনা করব। বিদ্যাসাগর মশাইকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, **(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) – "আচ্ছা, তোমার কি ভাব?"**?

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "আচ্ছা সে-কথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব"। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর যদি দেখতেন কারুর ভিতর একটুও গুণ আছে, ঠাকুরের কেবলই মনে হত, কিভাবে তাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। অনেক আগেকার কথা, বেলুড় মঠের একটা ঘটনা আগেও আমি বলেছিলাম, একজন ভক্ত ঠাকুরের সেবার জন্য একটা ফল দিয়েছেন, ফলটা প্রায় পুরোটাই পচে গেছে। ফলটা ফেলে দেওয়ার কথা হচ্ছিল। ওই সময় যে মহারাজ ভাণ্ডারের দায়ীত্বে ছিলেন, তিনি দেখলেন ফলের একটু অংশ ভাল। উনি খুব কায়দা করে ফলের ভাল অংশটা বটি দিয়ে কেটে আলাদা করে নিলেন। ওইটুকু অংশ তিনি ঠাকুরের ভোগে দিতে চাইলেন। আপত্তি করাতে তিনি বলছেন, 'দেখ ভক্ত কত ভক্তি নিয়ে ঠাকুরকে ফল দিয়েছে, এখন সে হয়ত খেয়াল করে দেখেনি যে ফলটা পচে গেছে, একটু যে অংশটা এখনও পচে যায়নি, সেটা তো ঠাকুরকে দেওয়া যেতে পারে'।

ঠাকুর ঠিক সেই রকম, যার ভিতর একটুও গুণ আছে, গুণ বলতে আমরা সত্ত্বগুণকে বলছি, যার ভিতর সামান্য একটু সত্ত্বগুণ আছে, যেটা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের দিকে যেত পারে, ঠাকুর তখন বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেন, কিভাবে তাকে টেনে তুলে আনতে পারেন। বিদ্যাসাগরের এত নাম, সত্ত্বগুণী লোক, দয়া আছে, করুণা আছে, বিদ্যা আছে; ঠাকুরও বিদ্যাসাগরকে ঢেলে যাচ্ছেন। একজন ভদ্রলোক, যিনি ঈশ্বর মানেন না, তাঁরও সত্ত্বগুণ থাকতে পারে।

আমার নূতন বই 'The Hindu Way', বাংলাতেও 'হিন্দু জীবনধর্ম' নামে বেরিয়েছে, সেখানে দেখানো হয়েছে, একজন মানুষ ঈশ্বরকে না মানতে পারেন, ধর্মকে না মানতে পারেন অর্থাৎ সচারচর আমরা ভক্তি, বিশ্বাস নিয়ে যা মনে করি, এগুলোকে না মেনেও তিনি কিন্তু একজন পারফেক্ট ভদ্রলোক হতে পারেন। কিন্তু তাই বলে যে, তার ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ আছে, তা না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি যাঁর অনুরাগ আছে, প্রথমেই তাঁকে একজন ভদ্রলোক হতেই হবে। সত্ত্বগুণ না হলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয় না। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের পরম্পরায় আমরা আগেকার মহারাজদের আমাদের বলতে শুনেছি, First be a gentlemane then be a Monk, তোমাকে আগে একজন ভদ্রলোক হতে হবে, তারপর সাধু হবে। সন্ন্যসী হওয়ার আগে তুমি একজন ভদ্রলোক হও, কারণ ভদ্রলোক হওয়া মানে ভিতরে সত্ত্বগুণের আধিক্য হওয়া।

সত্ত্বগুণের পর দরকার পড়ে একটা ভাব, একটা সম্পর্ক, কিভাবে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে জুড়েছেন। যাঁরা মন্ত্র নিচ্ছেন, শুধু বেলুড় মঠ থেকে না, যে কোন জায়গা থেকে মন্ত্র নিয়ে থাকতে পারেন, মন্ত্র জপ করছেন, ধ্যান করছেন, সবই করছেন, কিন্তু ওর সাথে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – ইষ্টের সাথে একটা যে কোন ভাব দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা। ঠাকুরের সঙ্গে যে ভাব, এটাই যদি missing থাকে, তাহলে আপনি ধর্ম জীবনে এগোতে পারবেন না। আপনি যতই ধর্মের অনুষ্ঠান করুন, ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে জুড়তে হবে।

ধরুন আমরা মেনে নিচ্ছি, আপনি ঠাকুরের ইষ্টমন্ত্র নিয়েছেন। আপনি যাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছেন, তিনি আপনাকে বলে দিয়েছেন, এই তোমার মন্ত্র আর ইনি তোমার ইষ্ট ইত্যাদি। কিন্তু আপনার ভাব যেটা তৈরী হবে সেটা নিজেকেই তৈরী করে নিতে হবে। তার জন্য আপনাকে দেখতে হবে আপনার মনের প্রবণতা কোন দিকে, আপনার ভিতরের ইমোশানস্‌গুলি কেমন, আপনি কেমন স্বভাবের; সাধারণ ভাবে আপনি কি সব কিছু বিচার করে দেখতে চান, নাকি আপনার ভিতর প্রচণ্ড ইমোশানস্‌ আছে। একবার এক মহারাজের সঙ্গে বেলুড় মঠের মঙ্গল আরতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। উনি খুব মিষ্টি করে বলছেন, 'আহা, সকালবেলা যখন গর্ভ মন্দিরের দরজা খোলা হয়, তখন ঠাকুরকে কেমন ছোট্ট শিশুর মতন দেখায়'। মহারাজের কথা শুনে আমি একটু চমকে উঠেছিলাম, ঠাকুরকে ছোট শিশুর মত দেখায়! এটা উনি কি কথা বলছেন! পরে আমি ভেবে দেখলাম, ওই মহারাজ আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভোরবেলা যখন মন্দিরে যাচ্ছেন তখন কোথাও যেন তাঁর মনের মধ্যে ওই বালগোপাল, নাড়ুগোপাল, বালকৃষ্ণ ভাব কাজ করছে। ঠাকুরও পরে কথামৃতে বলবেন, একটা ভাব অবলম্বন করতে হয়।

কৃষ্ণভক্তিতে কত রকমের ভাব নিয়ে আসা হয়েছে, শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রে আমরা অতটা আনিনি। শ্রীরামচন্দ্রকে ওই আদর্শ পুরুষোত্তম রূপে, আর কিছু কিছু রামলালা ভাব আছে। কিন্তু কৃষ্ণের ক্ষেত্রে সব রকম ভাব নিয়ে আসা হয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি যত রকমের ভাব হতে পারে, ভাগবতে সব ভাবের বর্ণনা আমরা পেয়ে যাই। ঠাকুর নিজের জীবনে সমস্ত রকম ভাব নিয়ে সাধনা করেছেন, আর রীতিমত এগুলো রেকর্ডিং হয়ে গেছে। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, প্রথমে জপধ্যান করলাম ঠিকই আছে, কিন্তু যতক্ষণ ওই একটা ভাব না তৈরী হয়, যে কোন ভাব হতে পারে, একটা ভাব না তৈরী হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হবে না।

কবি সুরদাস তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল রূপে দেখতেন আর তুলসীদাস তাঁর ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রকে মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে দেখতেন। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী পুরো আলাদা। কিন্তু দুজনেরই ফল হল ঈশ্বরলাভ, দুজনেরই ফল হবে জ্ঞান লাভ। এই ভাব ভিতর থেকে আসতে হবে। তখন কি হয়, দৈনন্দিন জীবনটাই পুরো পাল্টে যাবে। তখন যিনি ঈশ্বরকে শিশু রূপে দেখছেন, ওই বাল ভাবটাই তাঁর ভাব। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন স্টাফ আছে, ওকে দেখি বালকৃষ্ণের ছবি বা মূর্তি যদি হাতে এসে যায়, ওই ছোট্ট কৃষ্ণের জন্য বালিশ, তোষক জোগার করবে। দেখে খুব ভাল লাগে, আজকালকার দিনে এত পড়াশোনা করা ছেলে, এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়ীত্বে আছে, কিন্তু এই যে শ্রীকৃষ্ণের বাল ভাব, এটাই তার ভাব।

এই যে ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার ভাব কি রকম, তাঁর মুখ থেকে শুনে নেওয়ার পর ঠাকুর দেখবেন ওনার ভিতরে কোন গোলমাল আছে কিনা, যদি গোলমাল থাকে সেটাকে তিনি ঠিক করে দেবেন। বিদ্যাসাগর ঠাকুরের থেকে বয়সে বড়, পণ্ডিত লোক। কিন্তু ঈশ্বরীয় ভাব যাদের ভিতরে নেই, তারা নিজের কথা চট্‌ করে বলতে চাইবে না। বিদ্যাসাগর এখানে বুদ্ধি করে ঠাকুরের কথাকে পাশ কাটিয়ে বললেন, "আচ্ছা সে-কথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব"। এরপর ঠাকুর আবার বলছেন –

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)–তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না"।

আগের বাক্যটা – তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়, আমরা পরে আলোচনা করব বলেছিলাম। ঠাকুর বুঝে গেছেন, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পাণ্ডিত্য আছে, সংস্কৃতের বিরাট পণ্ডিত, শাস্ত্র জানেন, শুদ্ধ জীবন, দয়া, করুণা সবই আছে; কিন্তু ভক্তি, ভাব এই জিনিসগুলোর অভাব ছিল। এর আগে আগে ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কত প্রশংসা করলেন, কিন্তু তিনি দেখছেন ঈশ্বরের ব্যাপারটা বিদ্যাসাগরের এখনও

শুরু হয়নি। বঙ্কিমবাবুকে ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি তো বাপু বড় ছ্যাঁচড়া। বিদ্যাসাগরের অতটা বাজে অবস্থা নেই। কিন্তু ঈশ্বরের, ঈশ্বরের সাধকের প্রতি যে একটা সম্মানের ভাব থাকবে, সেটা আসছে না।

আমরা যে পড়াশোনা করি, সবটাই ইনফরমেশান রূপে আমাদের কাছে আসে। কোন একটা জিনিসকে নিয়ে মানুষ যখন খাটতে শুরু করে, তখন ওই জিনিসটাই ধীরে ধীরে জ্ঞান রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা যাদের পড়াশোনা করা লোক মনে করি, শাস্ত্র জানে, এদের সবারই ক্ষেত্রে ইনফরমেশান রূপেই সব কিছু আসছে। আর ইনফরমেশান সব সময় একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যে মানুষ যত পড়াশোনা করেছে, ওটা তত তার মাথায় বোঝা হয়ে আছে। এই বোঝার মধে আরেকটা বড় বোঝা এসে চেপে যায়, তা হল, একটা অহঙ্কার এসে যায় – আমি এত কিছু জানি। কিন্তু এই জ্ঞানকে যতক্ষণ বাস্তবে পরিণত না করতে পারছে, ততক্ষণ ওই জ্ঞানটা সরাসরি তার কাছে একটা বোঝা হয়ে থাকবে। ফিজিক্সেও তাই, কেমেস্ট্রিতেও তাই, বায়োলজিতেও তাই। ফিজিক্সের সব থিয়োরী, ফরমূলা মুখস্ত করা হয়ে গেছে; কিন্তু একটা প্রবলেম এলে তার সমাধান করতে পারছে না।

শাস্ত্র আর তত্ত্ব, এই দুটোর মধ্যে বিরাট তফাৎ। ঠাকুর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে কত নেগেটিভ কথা বলছেন, তা সত্ত্বেও তো আমরা এখানে এত শাস্ত্রচর্চা করে যাচ্ছি। একটা তফাৎ আছে। ধর্ম সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে তত্ত্বের উপরে। কেউ একজন, যিনি আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করেছেন, সেই তত্ত্বের উপরেই করেছেন। তাঁর শিষ্যরা নিজের আচার্যকে দেখে, তাঁর আচার আচরণ ও অন্যান্য জিনিসগুলিকে দেখে, আর নিজের জীবনে সেগুলো নকল করে। নকল করার সময় মনে করে, আমিও যদি এই রকম করি, আমারও উপলব্ধি হবে। মাঝখানে আসল জিনিসটা হারিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আফ্রিকার একটা দ্বীপে আমেরিকার লোকেরা একটা রানওয়ে বানিয়েছিল। আমেরিকার প্লেনগুলো ওখানে নামত, প্রচুর যুদ্ধের সরঞ্জাম আর প্রচুর খাদ্য সামগ্রী ওখানে মজুত করত। দ্বীপের আদিবাসীদেরও তারা খাওয়া-দাওয়া দিত। আদিবাসীরা ওখানে বন্য পশু শিকার করে খেত, সেখানে হঠাৎ এত ভাল ভাল খাবার-দাবার পাওয়াটা ওদের কাছে বিরাটা পাওয়া। ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেল। যুদ্ধ শেষ, আমেরিকানরা ওখান থেকে ওদের বেসক্যাম্প তুলে নিয়ে চলে গেল। দ্বীপের আদিবাসীরা আর ওই খাবারগুলো পাচ্ছে না। ওদের একজনের হঠাৎ মাথায় এলো, খাওয়া তো আকাশ থেকে প্লেনে করে আসত। এতদিন ধরে প্লেনের আসা-যাওয়াটা ওরা লক্ষ্য করেছে। রানওয়ের কাছে একজন একজন বসে থাকত, কানে সে একটা হেডফোন লাগিয়ে রাখত, আর ওখান থেকে সে নির্দেশ দিতে থাকত। লোকগুলো তখন মাটির খুরি বা বাটি দিয়ে একটা হেডফোন বানালো, একটা কাঠি দিয়ে এরিয়ালও বানিয়ে ফেলল। আর দিনের পর দিন ওখানে বসে আছে এই ভেবে যে, ওই লোকটা যা যা করত সেটা আমিও করব, তাহলে প্লেন আসবে, প্লেনে খাবার আসবে। কিন্তু এখানে মূল যে জিনিসটা, সেটাই নেই। আসল হেডফোনটাও যদি আপনি পেয়ে কানে লাগিয়ে রাখেন, তাতেও প্লেন আসবে না।

আমাদের ঠিক এই সমস্যাটা হয়। শাস্ত্রে তত্ত্বের বর্ণনা থাকে, ওই তত্ত্ব যিনি লিখেছেন, তিনি তত্ত্বটা যেভাবে বুঝেছেন, তত্ত্বের বর্ণনা ঠিক সেই ভাবে থাকে। ওর মধ্যে বেশী চলে গেলে ধীরে ধীরে মূল তত্ত্ব থেকেই হারিয়ে যাবে। এই সব কিছু মিলিয়ে যদি দেখা যায়, কেউ যদি বেশী পড়াশোন করে নেন, কোথাও যেন মূল জিনিসটা থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু পরে ঠাকুর আবার বলবেন, মানুষ যখন পড়াশোনা করে তখন সে একটা তত্ত্বকে জানার জন্য, জানতে চাইছে জিনিসটা কি। ঠাকুর এত সাধনা করলেন, সিদ্ধিও পেলেন, কিন্তু যখনই কোন সাধুকে পেতেন, তাঁর সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন, জানার জন্যই করতেন। মা কালীর কাছে গিয়ে তিনি প্রার্থনা করতেন, মা আমাকে দেখিয়ে দে, বেদে কি আছে, পুরাণে কি আছে, তন্ত্রে কি আছে, এটা কি, সেটা কি। পড়াশোনাতে দোষ নেই, কিন্তু সমস্যা হল, ওই পড়াশোনাটা টেনে অন্য দিকে নিয়ে চলে যায়।

অন্য এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, কোন একটা দিকে বেশী এগিয়ে গেলে, ঈশ্বরের দিকে আর মন যায় না। এমনকি শাস্ত্র পড়ার দিকেও যদি মন বেশী চলে যায়, তাতেও সে আর এগোতে পারবে না, একটা জায়গার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে জয়েন করার আগেই সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন। ওনার ইচ্ছে হয়েছিল আরও পড়াশোনা করবেন। শরৎ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বারণ করে দিলেন, অনেক হয়ে গেছে, আর না। স্বামী আত্মস্থানন্দজীর মুখেই আমরা শুনেছিলাম, উনি তখনকার দিনের গ্রাজুয়েট ছিলেন, ওনার খুব ইচ্ছে ছিল মাস্টার ডিগ্রি করবেন। কিন্তু উনি যে মহারাজের সান্নিধ্যে ছিলেন, তিনি নিষেধ করলেন। মহারাজের একজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, দুজনেরই সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে ছিল। বন্ধুটি কিন্তু এমএ পড়তে চলে গেলেন। পরবর্তি কালে উনি এমএ পাশ করলেন ঠিকই, কিন্তু মাঝখান থেকে ওনার আর সাধু হওয়া হল না। বেশী পড়াশোনা করতে গেলে কোথাও গিয়ে জগতের দিকে তাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে।

পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে তাঁকে জানা যায় না, এই কথা বলে ঠাকুর এবার গান করছেন – ‘কে জানে কালী কেমন’। গানের পর ঠাকুর এবার মূল বক্তব্যে নেমে আসছেন – “**বিশ্বাস আর ভক্তি চাই**”।

এই কথা বলার পর ঠাকুর নামকরা সেই গল্পটা বলছেন, যেখানে একজন মানুষ কিভাবে কিভাবে লঙ্কায় চলে গেছে, এখন সে ফিরে আসতে চাইছে কিন্তু পারছে না। তখন বিভীষণ লোকটিকে একটা জিনিস দিয়ে বললেন, এটা তোমার কাপড়ের খোটাতে বেঁধে নাও। লোকটি সমুদ্রের উপর দিব্যি হেঁটে চলে আসছে। হঠাৎ তার কি মনে হল, একবার দেখি তো কাপড়ে কি বাঁধা আছে। লোকটি খুলে দেখে একটা কাগজ আর তাতে ‘রাম’ এই নাম লেখা। আরে শুধু ‘রাম’ নাম, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ডুবে যায়। দেখাচ্ছেন বিশ্বাসের কত জোর। যতক্ষণ বিশ্বাস ছিল ততক্ষণ হেঁটে আসছিল। এগুলো কাহিনী, কাহিনীকে কখন আক্ষরিক রূপে নিতে নেই। কিন্তু কাহিনীর মাধ্যমে যে বক্তব্য বলতে চাওয়া হয়েছে, সেটাকে কক্ষণ ছাড়া যায় না।

একটু যদি আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞানে ঢোকা যায় তাহলে এই জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এখানে ঠাকুর যদিও ‘বিশ্বাস আর ভক্তি’ শব্দ নিচ্ছেন, পরে আবার ‘ভালবাসা’ শব্দ নিয়ে আসবেন। এই সব কটা শব্দকে শাস্ত্রে একটা টেকনিক্যাল শব্দে বলে দেওয়া হয়েছে, সেটা হল ‘শ্রদ্ধা’। শ্রদ্ধা শব্দটাই বাংলাতে বোঝানর জন্য বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা এই শব্দগুলি দিয়ে বোঝান হয়। শ্রদ্ধা শব্দকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়, আপনি যে শাস্ত্র নিজে পড়েছেন, গুরুর মুখে শাস্ত্রের কথা শুনেছেন, শাস্ত্রের কথা পড়া ও শোনার পর শাস্ত্রের কথাগুলো দিয়ে মনে যে ভাব তৈরী হয়েছে এবং যেটা আপনার কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে – এটাই শ্রদ্ধা।

এই বহির্জগৎকে ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন আমরা নিই, তখন তা আমাদের ভিতরে মনের সংসার তৈরী করে। ওই মনের সংসারটা আমাদের কাছে আসল সংসার। ফলে আমার সংসার আর আপনার সংসার কখনই এক হবে না। একই জিনিস আমরা দেখছি, কিন্তু আমার সংসার আলাদা, আপনার সংসার আলাদা। শাস্ত্র যখন আমরা পড়ছি, গুরুর কাছে যখন শাস্ত্রবাক্যগুলি শুনছি, তখন শাস্ত্রবাক্যের প্রতি, তত্ত্বকথাগুলোর প্রতি আমাদের একটা বিশ্বাস জন্মায়, হ্যাঁ, এটাই সত্য। হ্যাঁ এটাই সত্য, যখন হয়ে যায়, তখন আপনার মন ওই রঙে রঙে গেল। যখন মন ওই রঙে রঙে গেল, এবার আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম ঠিক ওই ভাবেই হবে।

এর একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত হল, জেহাদীদের বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের নামে লড়াই করতে করতে যদি মরে যায়, তাহলে সে স্বর্গে যাবে, সেইজন্য সে আর মৃত্যুকে ভয় পায় না। এর ভাল-মন্দে আমরা যাচ্ছি না। অন্য দিকে কিছু দিন আগেও হিন্দুদের যে বিধবারা ছিলেন, তাদের এমন শুচিবাঈ রোগ ছিল যে, একটু এদিক থেকে সেদিক কিছু হয়ে গেলে নিজেদের পবিত্র করতে থাকত। উদ্দেশ্য হল, তোমাকে

বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তোমার স্বামী কোন কারণে মারা গেছে। আর আগেকার দিনে মেয়েদের তুলনায় ছেলের সংখ্যা কম ছিল, তার সঙ্গে বক্তব্য হল, তোমার যা হওয়ার হয়ে গেছে, এবার তুমি ঈশ্বরের দিকে মন দাও, কারণ সবাইকেই ঈশ্বরের দিকে যেতে হবে। নানা রকমের সমস্যা ছিল বলে, ওনারা বিধবা বিবাহ করতেন না।

যদিও মনু বিধবা বিবাহ অনুমোদন করে গেছেন। শব্দটাই হল *পুনর্ভূঃ*, যার আবার বিবাহ হয়েছে। লোকেদের মনে একটা ভুল ধারণা ঢুকে গেছে যে, হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রথা নেই। দ্বিতীয় বিবাহ আমাদের হিন্দু ধর্মে পুরোপুরি অনুমোদন করা আছে। রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে যাচ্ছে, ওটা দ্বিতীয় বিবাহ, কারণ সীতার আগেই একজনের সাথে বিবাহ হয়ে গিয়েছে। হিন্দু ধর্মের এত দুরবস্থা যে, হিন্দুদের নামে গালাগাল দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে। বিধবা বিবাহ হবে না, মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহ হবে না, হিন্দুধর্মের কোথাও নেই। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলছেন, তোমার তো শিশুপালের প্রতি মন ছিল, শিশুপালও তোমাকে চাইছিল, তুমি তার কাছে চলে যেতে পার। আমাদের সমাজ দ্বিতীয় বিবাহ, বিধবা বিবাহের বিরোধী কখনই ছিল না। হয় কি, সমাজের পরিস্থিতি যখন পাল্টে যায়, তখন নিজেকে বাঁচানর জন্য কিছু কিছু জিনিস করে।

বিধবাদের ছিল শুচিবাঈ, উদ্দেশ্য হল মন শুদ্ধ, পবিত্র করা, শুদ্ধ পবিত্র হলে ঈশ্বরের কৃপা হবে। ঈশ্বরের কৃপালাভের দিকে মন যাচ্ছে না, অন্য দিকে সারাটা দিন গা ধুয়ে যাচ্ছে। এটাও একটা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা এখানে মানে একটা বিশ্বাস তৈরী হয়ে গেছে, আমাকে এভাবে শুচি রাখতে হবে।

কিন্তু শ্রদ্ধার আসল রূপ দেখা যায় কঠোপনিষদে নচিকেতার মধ্যে। নচিকেতার বাবা তাঁকে বলে দিলেন, তোমাকে যমকে দিলাম। নচিকেতার শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস, বাবা যখন বলে দিয়েছেন ঠিক আছে, আমি যমের কাছেই যাব, আর বাবাকে আমি রক্ষা করব, যমলোকের দিকে আমি চললাম। এগুলো হল explanatory শ্রদ্ধা, আসল শ্রদ্ধাটা হয়, গীতায় যেমন বলছেন, *যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ*, তোমার শ্রদ্ধাটা যেমন, তুমি তাই। ইংলিশে অনেক সময় দেখা যায় একটা বাক্য বলে দিয়ে কারুর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া হয়, যেমন, You are what বলে একটা catchy phrase বার করে দেয়। অনেকগুলো জিনিস দিয়ে বলা হয়, যেমন খারাপ অর্থে বলবে – You are what your wealth is, তোমার কত টাকা তার উপর নির্ভর করে আপনি কি। You are what your intelligence is, You are what your mind is, You are what your mentality is, এই ধরণের নানা রকম বাক্য দিয়ে বলা হয়। কিন্তু আসলে ঠিক ঠিক যদি আপনি বোঝেন, তাহলে জানবেন, You are what your shraddha is, এটাই ultimate truth। বাকি যাবতীয় যা কিছু সব ওটারই পরিণাম। তার মানে, যিনি টাকা-পয়সাকে সম্মান দেন, তাঁর টাকা-পয়সার প্রতিই শ্রদ্ধা আছে, টাকা-পয়সাটাই তাঁর কাছে শেষ কথা। আর যারা তাঁকে দেখছে, যারা তাঁকে মানছে, সম্মান দিচ্ছে; তাদের কাছেও টাকা-পয়সাই একমাত্র গুরুত্ব। সেইজন্য বলছে, You are what your wealth is। যারা নিজের দেহ ছাড়া কিছু বোঝে না, তারা বলবে, You are what your beauty is। কিন্তু এই সব কটাই হল ওই একটা জিনিসের বিভিন্ন রূপ, সেটা হল শ্রদ্ধা। যে জিনিসটার প্রতি তোমার বিশ্বাস ছিল, যেটাকে তুমি অর্জন করলে, সেটাকেই তিনি শ্রদ্ধা বলছেন।

এই সব কটার গোড়ায় যদি যাওয়া হয়, তাহলে হবে, You are what your shraddha is। শ্রদ্ধাটা হল পুরোপুরি মস্তিষ্কের গঠন, মন কি আকার ধারণ করে আছে, কি ছাঁচে তৈরী; এটাই শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা মানে ছাঁচ। আপনার মন কি ছাঁচে আছে, এবার আপনার সমস্ত কিছু ওই ছাঁচ অনুযায়ী হবে। যেমন যে কোন শিশুর কাছে খেলাই সব, ফলে যা কিছু ওকে দেওয়া হবে, সে খেলা রূপেই নেবে। আরও ছোট শিশু, দু-তিন মাসের, তার কাছে আহারটাই একমাত্র সব। হাতের কাছে যা পাবে সেটাই ও প্রথমে মুখে দেবে, মুখে নিয়ে দেখবে এটা কি। পেট ভরা থাকলে ওটাকে ছুড়ে ফেলে দেবে। আমরা

শাস্ত্রের যে শ্রদ্ধার কথা বলছি, এই শ্রদ্ধা এখনও শিশুর মধ্যে তৈরী হয়নি। কিন্তু অল্প যেটুকু আছে, সেটাই সে মুখে দিয়ে দেখতে চাইছে জিনিসটা কি। পশু যখনই নিজের ঘরের বাইরে আসে, তখন সব কিছু শুকে শুকে দেখবে, এটা আমার আহার কিনা, আহার ছাড়া পশুরা কিছু বোঝে না। ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা জিনিসটা হল মনের ছাঁচ, মনের ছাঁচে এসে সব জিনিস পড়বে, যেটা ওই ছাঁচে বসবে, সেটাই থাকবে, ছাঁচে যেটা বসবে না, সেটা বেরিয়ে চলে যাবে।

শাস্ত্র পড়ার সময় সবাইকে মাথায় রাখতে হবে, এই শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে আমি আমার ছাঁচ ঠিক করছি; তবেই শাস্ত্র পড়া সার্থক হবে। ঠাকুর অর্থকরী বিদ্যার কথা বলছেন। শাস্ত্র কেন পড়ছি? একটা ডিগ্রি পাব বলে। আগেকার দিনেও বেশীর ভাগ পণ্ডিতরা এই উদ্দেশ্য নিয়েই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, ঠাকুর যেটার নাম দিয়েছিলেনে – চালকলা বাঁধা বিদ্যা। এখনকার দিনে লোকেরা চাকরি করে মাসের শেষে মাইনে পায়। তখনকার দিনে সমাজ সেই বিদ্যাকে যতটা সম্মান দিচ্ছে, সেই হিসাবে পণ্ডিতদের অর্থ সম্মান দেওয়া হত। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরলাভ হয়, তাহলে তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর বিচার কত ক্ষুরধার, এগুলো আর বিচার্য হবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছে, বিশ্বাস আর ভক্তি এটা হল শ্রদ্ধা।

এখানে ঠাকুর যে গল্পটা বলছেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মনে বিশ্বাস বাড়ানর জন্য বলছেন। লোকেদের মধ্যে যে ইমোশানালিজম, এই ইমোশানালিজম মনকে শুধু একটি ডাটা দিলে ওই দিয়ে পুরো একটা বাড়ি বানিয়ে দেবে। মনের এটা একটা সাংঘাতিক ক্ষমতা – pattern making। বাংলার খুব প্রচলিত কথা – অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, অল্প একটু জানে, সেটা দিয়েই মনে করছে সব জানা হয়ে গেছে, আমার থেকে কেউ বেশী জানে না। তার সাথে সাথে এটাও হয় যে, কেউ একজন দুষ্টলোক ছিল, সে অমুক স্কুলে পড়াশোনা করত। সেটা জানার পর সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলব, ওই স্কুল তো! তার মানে সে বদমাইশ হবেই হবে। তুমি অমুক রাজ্যের লোক? ওই রাজ্যের লোকেরা তো এই রকমই হয়। একটা তথ্য, সেটা দিয়ে সবটাকে এক করে দিচ্ছে। Pattern making – এটা মস্তিষ্কের একটা সাংঘাতিক ক্ষমতা।

এখানে বলছেন, তোমার শ্রদ্ধা যেমন, তুমি তেমনটি হবে, তোমার ভক্তি তেমনটি হবে, তুমি ঈশ্বরের দিকে তেমনটি এগিয়ে যাবে, এটাকে আমরা টেনে নামিয়ে দিয়েছি ইমোশানালিজিমে। মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছে, সবাই বুঝে গেছে বাঁচার কোন আশা নেই, তারপরেও বলবে, আমি বলছি বিশ্বাস করুন বাঁচবেই বাঁচবে, এই উঠে বসল বলে। ঠাকুর এখানে এই বিশ্বাসের কথা বলছেন না। এই বিশ্বাস যখন ফিল্টারড্ হয়ে আসে, কারবন কপি হয়ে আমাদের জীবনে যখন আসে তখন ওটা আত্মবিশ্বাস হয়ে আসে। স্বামীজী বারবার বলছেন, আত্মবিশ্বাস না হলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে দুটো একই কথা, দুটো সম্পর্কযুক্ত। শাস্ত্রের কথাগুলো শুনে যাচ্ছে, শুনতে শুনতে মনের মধ্যে ওই কথাগুলো ঢুকছে, ঢুকে মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা তৈরী হয়, ওই শ্রদ্ধা দিয়ে সে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে দেয়, ঠিক এই জিনিসটাই যখন নিজের উপর আসে তখন ওটা আত্মবিশ্বাসে নেমে যায়।

আত্মবিশ্বাসটা অহঙ্কার না। নামকরা যত বড় বড় আর্মি জেনারেল ছিল, আলেকজাণ্ডার ছিল, চেঙ্গিস খাঁ ছিল, কুবলাই খাঁ ছিল, নেপোলিয়ন ছিল, এরা সবাই কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিল। একবার কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন একটা যুদ্ধ করতে গিয়ে দেখছে শত্রুপক্ষের ষাট হাজার সৈন্য। নেপোলিয়ন ওদের খবর পাঠিয়ে বলে দিল, 'তোমরা আত্মসমর্পণ কর'। ওরা সবাই শুনে হাসছে, 'তোমরা কুড়ি হাজার আর আমরা ষাট হাজার'। নেপোলিয়ন বলে পাঠাল, 'আমাকে তোমরা গুণতির মধ্যে নাওনি, আমি একাই এক লাখ, তার মানে এক লাখ কুড়ি হাজার আর তোমরা এর অর্দ্ধেক ষাট হাজার, ভালয় ভালয় আত্মসমর্পণ করে নাও, তা নাহলে কেউ তোমরা বাঁচতে পারবে না'। ওরা শুনল না, যুদ্ধ হল, নেপোলিয়ন সবাইকে মেরে পিটিয়ে শেষ করে দিল। মাত্র কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে ষাট হাজার সৈন্যদের হারিয়ে দিল। নেপলিয়নের আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। স্বামীজী সেইজন্য

নেপোলিয়নের বিরাট ফ্যান ছিলেন। এই আত্মবিশ্বাসটা মুর্খের আত্মবিশ্বাস নয়। যার জন্য ওয়াটারলুতে যখন গেল, সেখানে মার খেয়ে গেল। এত বড় শক্তির উপাসক, কিন্তু অহং তাকে ঠেলে নামিয়ে দিল, আর তাকে একাকী মরতে হল। কিন্তু তখনও সে তার রাজার ভাব ছাড়ল না, রাজার ভাব কখন ছাড়েনি। এই আত্মবিশ্বাস জিনিসটা সময়ে এইভাবে আসে। কিন্তু ঠাকুর এই জিনিসগুলিকে নিয়ে এখানে বলছেন না। তবে ভারতের দুরবস্থা দেখে, ভারতীয়দের উপরে তোলার জন্য স্বামীজী এই ধরণের অনেক কিছু বলতেন। ঠাকুরের কাছে ঈশ্বরই বস্তু, বাকি কোন কিছুই কিছু না।

ঠাকুর বলছেন, ভক্তি আর বিশ্বাস, মানে শ্রদ্ধা; এই দুটো জিনিস যদি থাকে, তাহলে শাস্ত্রের মাধ্যম দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন হয়, সেটা আর দরকার হয় না। উদ্দেশ্য হল, মনকে পুরোপুরি ঈশ্বরে ডুবিয়ে দেওয়া, ঈশ্বরে মজে যাওয়া। আপনি ঈশ্বরকে যেমন ভালবাসবেন, তেমন মজবেন; যতটা কম ভালবাসবেন, ততটা কম মজবেন। ঠাকুর এই নিয়ে মজার মজার গল্প বলছেন, একজন বিশ্বাসের জোরে নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে পার হবে, নামার আগে নিজের ধুতিটা গোটাচ্ছে। আবার দুই বেয়ানের গল্প বলছেন, একজন দু-হাত তুলে নাচছে, অন্য বেয়ান এক হাত তুলে নাচছে, কারণ সে তার বেয়ানের এ বাণ্ডিল সুতো সরিয়ে বগলে লুকিয়ে রেখেছে। এগুলো দিয়ে দেখাচ্ছেন, যতটা এদিকে কম হবে, ওদিকেও ততটা কম পড়বে। যদি পুরোটাই ডুব দেওয়া হয়, তাহলে তাঁতেও পুরো ডুবে থাকা যাবে। কিন্তু আমাদের সেই রকম বিশ্বাস এখনও আসেনি।

"**কথায় বলে হনুমানের রামনামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে 'সাগর লঙ্ঘন' করলে! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হল**"।

অনেক সময় আমরা দেখি যে, আমাদের ভক্তরা এই কথাগুলি আক্ষরিক ভাবে নেন। এখানে বক্তব্যটা কি বলতে চাইছেন সেটাকে ধরতে হয়, কথাগুলিকে আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। আমরা যদি বাল্মীকি রামায়ণে যাই, তাহলে দেখা যাবে সেখানে হনুমানের লঙ্কা-গমন অন্য ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে কি ঠাকুর এখানে ভুল কিছু বলছেন? একেবারেই না। বক্তব্য হল, জিনিসটা এই ভাবেই হওয়ার কথা। স্বামীজী নামকরা যেসব স্তব রচনা করেছেন, তাতে তিনি বলছেন, ঠাকুরের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসে আমরা সমুদ্রকে লঙ্ঘন করে দেব, হিমালয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেব। এগুলোর জন্য দরকার ভাব, ঠাকুরকে আপনি কিভাবে দেখছেন। ওখান থেকে একটা তো হল মনের শক্তি বাড়ায়, দ্বিতীয় ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, নিয়ে ঈশ্বরের সাথে এক করে দেয়।

কিন্তু এর থেকেও বেশী হল, মনের মধ্যে যত অশান্তি, মনে অশান্তি আসে পাপবোধ থেকে; সংসার জ্বালা চিরদিনই ছিল। কৃষকদের আত্মহত্যা নিয়ে এত সোরগোল হচ্ছে, কিন্তু এটা বলছে না যে, ভারতবর্ষে প্রত্যেক তিন মিনিট অন্তর একটা করে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। অথচ নিউজপেপার খুললে মনে হবে ভারতের সব চাষীরা আত্মহত্যা করে নিচ্ছে। গোলমালটা ভিতরে, ভিতরেই অশান্তির বীজ। বাইরের অশান্তিতে কেউ আত্মহত্যা করে মরে না, মরে ভিতরের অশান্তিতে। ভারতে আগে কি অভাব ছিল না? আমরা ষাটের দশকে বড় হয়েছি, তখনও সবুজ বিপ্লব হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী যবে থেকে সবুজ বিপ্লব আনলেন, তবে থেকে ভারতে খাওয়া পেতে শুরু হল। তার আগে সারা দেশে সপ্তাহে একদিন দুদিন করে খাওয়া জুটত, তখন তো লোকেরা আত্মহত্যা করত না। হঠাৎ সবাই আত্মহত্যা করতে শুরু করল কেন? ভিতরটা পচে গেছে বলে। দিনে দিনে আরও পচে যাচ্ছে। সবাই চাইছে বসে বসেই যেন টাকা-পয়সা এসে যায়, কিভাবে কাজকর্ম না করে ঘরে বসে বসে টাকা পেয়ে যেতে পারি, অপরের টাকাকে কি করে আমার পকেটে নিয়ে আসতে পারি। পণপ্রথা নিয়ে কত কাণ্ড হচ্ছে। কোন শাস্ত্র বলছে মেয়ের বাড়ির লোকেদের পাত্রপক্ষকে পণ দিতে হবে? মনুস্মৃতি আদি সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রে কঠোর ভাবে নিষেধ করা আছে। যদি দেওয়া হয়, ওটা কন্যার জন্য; শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা কোন দিন ওই টাকাতে

হাত দিতে পারবে না, মরে গেলেও সেই টাকা পাবে না। অথচ সারা দেশে পণপ্রথা নিয়ে কত বধূ নির্যাতন হচ্ছে। কি হচ্ছে দেশে? কারণ ভিতরটা পচে যাচ্ছে।

"যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তাহলে পাপই করুক, মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই"।

এই কথাগুলো বলা মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। কিছুক্ষণের জন্য আমরা মেনে নিচ্ছি, যাঁরা কথামৃতের আলোচনা শুনছেন, তাঁদের সবারই একটু ভক্তি আছে। এবার কল্পনা করুন, হঠাৎ ঠাকুর এই জায়গাতে উপস্থিত হয়েছেন। বলা হয় যে, যেখানে রামকথা পাঠ বা রামগান হয়, সেখানে মহাবীর হনুমান নাকি স্বয়ং হাতজোড় করে বসে থাকেন। আমরা কথামৃতের আলোচনা করছি, ঠাকুরও হাজির হতে পারেন; একবার ভাবুন তো, ঠাকুর এখানে এসে গেলেন, এখন আপনার মনের ভাব কি হবে? আপনি ঠাকুরের কাছে কামিনী-কাঞ্চনের বর চাইবেন? আপনার মাথায় কি বাড়ির দু-পয়সার সমস্যাগুলি বা বাইরের সমস্যাগুলি থাকবে? কখন কোন মতেই আপনার মনে এসব আসবে না। যার ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে; সে কি আর পাতক, মহাপাতক কর্ম করবে? কখনই করবে না। এখানে বক্তব্য হল, যদি হয়ে যায়, আর দ্বিতীয় হল, যদি তুমি এ-রকমটি করে থাক; যেদিন তুমি বলে দিলে, আর না, আজ থেকে আমার জীবন পরিবর্তন করে দিলাম, এরপর তার আর কিসে ভয় হবে! আদিতে জুদাইজিমে ব্যাপ্টিইজিমের যে ধারণা ছিল, সেখানে এই ধারণাটাই ছিল। এতদিন যা ছিল, এই মুহূর্ত থেকে সব শেষ।

রামকৃষ্ণ মিশনে যখন সন্ন্যাসাদি হয়, সেখানেও পদে পদে ঠিক এই ট্রেনিংটাই দেওয়া হয় – এখন পর্যন্ত যা ছিল, এই মুহূর্তে সব সমাপ্ত হয়ে গেল। হিন্দী বেল্টে খুব নামকরা কথাই হয় – জাত না পুছো সাধো কি। যে সাধু, তার জাত, জাত মানে – জন্মগত যা কিছু আছে, আর সাধুকে জিজ্ঞেস করবে না। সন্ন্যাসের পর যা কিছু আছে, সেগুলোকে নিয়ে জিজ্ঞেস করবে। আগের জন্মের কথা কেউ যেমন আমাদের জিজ্ঞেস করে না, ঠিক তেমনি আপনি যেমনি সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন, এরপর আপনার আগের কথা নিয়ে কেউ আপনাকে প্রশ্ন করবে না, কারণ আপনার আগের জীবন শেষ হয়ে গেছে। এখানে ওই অর্থেই বলছেন, সন্ন্যাসের আগে আপনি যাই করে থাকুন, মহাপাতকই হোক আর যাই হোক, আপনি এখন শুদ্ধ হয়ে গেছেন। এই বলে ঠাকুর ভক্তের ভাব আরোপ করে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বিশ্বাসের মাহাত্ম্য নিয়ে গান গাইছেন – 'আমি দূর্গা দূর্গা বলে মা যদি মরি'।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য

মাস্টারমশাই পরিচ্ছেদ পাল্টে দিয়ে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নিয়ে আসছেন, কিন্তু বিষয় একই চলছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ – বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়"।

আগে বললেন, বিচার করে তাঁকে পাওয়া যায় না। এখানে এসে বলছেন – তিনি ভাবের বিষয়। সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন, বেদান্ত দর্শন বা যে কোন দর্শনই যখন দেখি, তখন একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আমরা দুটো সত্তাকে সব সময় মানি। ওই দুটো সত্তাকে আপনি আলাদা মনে করতে পারেন, একটা একটার উপর নির্ভর মনে করতে পারেন বা একটা সত্তাকে মিথ্যা বলতে পারেন, কিন্তু সত্তা দুটি। একটি হল পরমাত্মার সত্তা, আরেকটি হল মনের সত্তা, বা মনের জগৎ – মন আর ঈশ্বর। বেদান্ত দর্শন বলে, সেই চৈতন্য থেকেই চেতনা এসেছে, মন মানে চেতন, চৈতন্য থেকে চেতনা। তাঁর এমন একটা দিব্যশক্তি যে, মনের উপর ওই চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় বলে মনকে চেতন রূপে দেখায়। বেদান্ত বলে, বাস্তবে চেতনা আর চৈতন্য এক। কিন্তু সাংখ্য বা যোগে শুরুতে বলা হয়, ওই

জায়গাতে বাস্তবিক কিছু আছে, কিন্তু চেতনা জিনিসটা যে প্রতিবিম্বিত, এটাকে মানছেন। তার মানে এবার যা কিছু হবে, দুটো স্তরে হবে – একটা হল মনের কাজ, আরেকটা হল মনের বাইরের কাজ।

চৈতন্যের কোন কাজ নেই, কারণ চৈতন্য পরিপূর্ণ, চৈতন্য অনন্ত আর চৈতন্য আনন্দময়, সেখানে কোন ক্রিয়া নেই, সেখানে কিছু হতে পারে না। কিন্তু যেমনি মনের জগতে ঢুকলেন, তখনই এই সব কিছু শুরু হয়ে যায় – তখন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, কর্ম শুরু হয়ে যায়, নানা রকম চিন্তন শুরু হয়ে যায়। ফলে যখনই আমরা কোন বিচার করছি, তার মানে সেখানে মনের ক্রিয়া চলছে, যেখানেই মনের ক্রিয়া সেটা কখনই চৈতন্য হতে পারে না। তার মানে যতক্ষণ আমরা বিচার করছি, ততক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হতে পারে না, অসম্ভব। যুক্তিতেই এটা সম্ভব না। রামচরিতমানসে তুলসীদাসের একটা খুব সুন্দর চোপাঈ আছে – আমি মুখ ভার করে থাকব, আর হাঃ হাঃ করে হাসব, দুটো এক সঙ্গে কখন হয় না।

ঈশ্বর দর্শন মানেই মনের ক্রিয়ার অভাব। আর আপনি বলছেন, আমি মনের ক্রিয়া দিয়ে মনের ক্রিয়ার অভাব করাব, কি করে সম্ভব! মনের ক্রিয়া আর মনের ক্রিয়ার অভাব দুটো একসাথে কখনই হতে পারে না। সেইজন্য যতক্ষণ শাস্ত্র বিচার চলছে, যতক্ষণ এই বোধ আছে যে, আমি জপ করছি, আমি ধ্যান করছি, যতক্ষণ এই বোধ আছে যে, আমি প্রার্থনা করছি, আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, ততক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হতে পারে না। এটা এত সহজ যুক্তি যে এর আলোচনারও দরকার হয় না। কিন্তু ঠাকুর প্রত্যেক পদে পদে এই জিনিসটাকে আনবেন। কারণ, জিনিসটা অত্যন্ত সহজ ঠিকই, কিন্তু যে কোন সহজ জিনিস ঠিক ঠিক ভাবে ধারণা করা বা বোঝা অত্যন্ত কঠিন হয়। সহজ জিনিস দিয়ে জগতের বাকি যত জটিল জিনিসকে বোঝান হয়। ফলে যৌগিক জিনিসকে বোঝা আমাদের পক্ষে খুব সহজ, সহজটাকে বোঝা যায় না।

কোন বাচ্চা ছেলেকে 'এক' জিনিসটাকে কিছুতেই বোঝান যাবে না, সেইজন্য উপমা দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বোঝাতে হয়। যোগ জিনিসটাকে বাচ্চাদের বোঝান যাবে না, কিন্তু এক যোগ এক সমান দুই, এটা যদি একবার সে মেনে নেয়, তখন বলবে, মা তুমি বলছ বলে আমি মেনে নিলাম। এরপর কিন্তু বাকি সব যোগ চটপট তাকে শিখিয়ে দেওয়া যাবে। কারণ সহজকে চেনা যায় না, জানা যায় না, সহজকে নেওয়া যায় না। সহজ লেখা যেগুলো হয় সেগুলো ধরা যায় না, কথামৃত সেইজন্য আমরা সহজে বুঝতে পারি না, উপনিষদও সেইজন্য বুঝতে পারি না। মনে হবে সব পড়ে ফেলেছি। ঠিক তেমনি, এই যে বলছেন, বিচার দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না, এটাও অত্যন্ত একটা সহজ যুক্তি। বিচার মানেই মন এখন সক্রিয়। মন সক্রিয় মানেই, ঈশ্বর দর্শন হবে না। যতক্ষণ মন সক্রিয় থাকবে, ততক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হবে না। মন শান্ত মানে, মন শুদ্ধ; শুদ্ধ মনও যা, শান্ত মনও তাই। ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক। তার মানে ওটাই – শান্ত মন আর আত্মা এক।

ঠাকুর এই বলে গান শুরু করলেন – 'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে'। এই গান করতে করতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, হাত অঞ্জলিবদ্ধ। যখন যে অবস্থায় ঠাকুর থাকতেন, মনে ক্রিয়ার অভাব হয়ে যেত বলে শরীরটাও ওই রকম হয়ে যেতে। মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন, **"দেহ উন্নত স্থির। নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন! সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদগ্রীব হইয় এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন"**।

বিদ্যাসাগর অবশ্যই নির্বিকল্প সমাধির কথা আগে পড়ে থাকবেন, একটা অবধারণা তাঁর অবশ্যই আছে। কিন্তু চোখের সামনে এ-রকম সমাধিবান তো দেখা যায় না, ঠাকুরের মত মুহুর্মুহু ভাব, ভক্তি সমাধি হচ্ছে, এই ধরণের মানুষও দেখা যায় না। বিদ্যাসাগরও তাই নিস্তব্ধ হয়ে একদৃষ্টে ঠাকুরের অবস্থা দেখছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কহিতেছেন। - "ভাব ভক্তি, এর মানে – তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে"।

বিদ্যাসাগরের উপর আমার পড়াশোনা খুবই সীমিত। তবে আমার মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ভক্তিকে ওই স্তরে নিয়ে যাননি, যেখানে তিনি ঈশ্বরকে 'মা' বলে দেখবেন। আগের পরিচ্ছেদে আমরা ভাব নিয়ে আলোচনা করলাম, সেখান থেকে ভক্তি, ভালবাসা নিয়ে বলা হল। এগুলো সব একই জিনিস। আমরা আগে যে শ্রদ্ধার কথা আলোচনা করলাম, এই শ্রদ্ধাও আসে ভালবাসা থেকে। যতক্ষণ একটা জিনিসকে না ভালবাসা যায়, ততক্ষণ সেই জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা কখন আসবে না। শাস্ত্রকে যদি আপনি নাই ভালবাসেন, তাহলে কি করে আপনি আশা করতে পারেন যে শাস্ত্রের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আসবে! শাস্ত্রের প্রতি ভালবাসা না থাকলে শ্রদ্ধা আসবে না, শ্রদ্ধা না হলে মনের গঠনটাও পাল্টাবে না, মনের গঠন না পাল্টালে জীবনও পাল্টাবে না।

সাধারণ ভাবে দেখা যায়, শতকরা নিরানব্বই পয়েন্ট নয় ভাগ মানুষ নিজের মাকে ভালবাসে। কারণ মাকে কেন্দ্র করেই আমাদের অস্তিত্ব গড়ে ওঠে, এর অন্য রকমও অনেক সময় দেখা যায়, পরে বড় হয়ে অনেকে মাকে পছন্দ করে না। কিন্তু সাধারণ ভাবে মাকে ভালবাসতে সবাইকে দেখা যায়। ঠাকুর যে সময় এই কথাগুলো বলছেন, সে-সময় কলকাতায় একটা বিচিত্র অবস্থা। ঈশ্বরকে পাওয়ার যত রকম বিধি হিন্দুদের আছে, কোনটাই ঠিক ঠিক ভাবে চলবে না, ঠাকুর সেইজন্য প্রেমাভক্তি নিয়ে আসছেন। বৈধী ভক্তি ঠাকুর রাখছেন না, বৈধী ভক্ত হল, পূজা করা, অর্চনা করা, কীর্ত্তন করা, তীর্থ করা ইত্যাদি। ঠাকুর চাইছেন ঈশ্বরের ভালবাসায় তোমরা ডুবে যাও। ঠাকুর নিজের অবস্থা দেখিয়ে, কথার ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে একটা ছাপ ফেলতে চাইছেন।

ঠাকুর রামপ্রসাদের এই গানের শেষ লাইনটা বলছেন – 'সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে'। ঠারে ঠোরে এই শব্দের অর্থ হল, নিজের মত বুঝে নেওয়া। সব কিছু পরিষ্কার করে বলা নেই, কিন্তু আন্দাজ করে নিতে পারছে কি বলতে চাইছে, ভিতরে ভিতরে ওটা বুঝে নেওয়া।

"রামপ্রসাদ মনকে বলছে – 'ঠারে ঠোরে' বুঝতে। এই বুঝতে বলছে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলছে – তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি"।

ঠাকুর শাক্ত মত ও বেদান্ত মতকে এক জায়গায় এনে মিলিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের আগেকার অনেক মহারাজরা প্রায় সময় বলতেন, ঠাকুর না শাক্ত, না অদ্বৈত। এগুলো কিছুই না, আসলে এটাই অদ্বৈত; অদ্বৈত কোন কিছুকে বাদ দেয় না। অদ্বৈত সৃষ্টিকেও নাকচ করে না, মাণ্ডুক্যকারিকা সৃষ্টিকে নাকচ করে ঠিকই, কিন্তু সেখানে অন্য একটা স্তর থেকে বলছেন। যে মনকে দিয়ে সামনের জিনিসকে ভুল বলা হয়, তাহলে যে মন দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যাচ্ছে, সেই মাধ্যমটাই যদি ভুল হয়, তাহলে তো ঈশ্বরও ভুল হয়ে যাবে। ব্রহ্ম আর শক্তি দুটো এক।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ"। জগতে এই দুটো জিনিস – ব্রহ্ম আর শক্তি। হয় পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে যান, নয়তো জগৎকে ভোগ করার জন্য শক্তি অর্জন করুন। মাঝামাঝি যদি থাকেন, বাকিরা আপনাকে পিষে শেষ করে দেবে। শক্তির অন্য সমস্যা আছে ঠিকই, যেমন আলেকজাণ্ডার সমস্ত এশিয়া জয় করে ফেরার সময় মাঝ পথেই মারা গেল, নেপোলিয়ন কোন কারাগারে গিয়ে মারা গেল। এই সমস্যাগুলো আছে, কিন্তু যত দিন থাকবেন রাজার মত থাকবেন। মাঝামাঝারিতে যে কজন আছে, কীটের মত পায়ের তলায় পিষে দেবে।

হিন্দুদের দর্শন একেবারে পরিষ্কার – ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ঈশ্বরের দিকে না এলে তুমি শক্তি অর্জন কর, দরকার হলে তুমি রজোগুণী হয়ে যাও। সবটাই শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তিটাও শক্তি, বিদ্যার শক্তিটাও শক্তি। ওই শক্তি এবং ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদে যে শক্তির কথা বলা হচ্ছে, দুটো শক্তি এক না। এখানে বলতে চাইছেন, ব্রহ্মাণ্ডের যে ক্ষমতা, যে শক্তি, যাঁকে মা বলে ডাকা হয়, কালী বলে ডাকা হয়, সেই আধ্যাত্মিক শক্তি; যে শক্তি এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করে তাকে পালন করছেন, সেই শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি, যিনি মহেশ্বর, তিনিই সব কিছুকে চালাচ্ছেন। "**যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি, অগ্নি বললেই দাহিকাশক্তি বুঝা যায়; দাহিকাশক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়**।", দুটোকে আলাদা করা যায় না, অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি দুটো এক – খুব নামকরা কথা। ঠিক তেমনি ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।

"**তাঁকেই 'মা' বলে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস**"।

আগে যে শক্তির কথা বলা হল, তাঁকেই মা বলে আমরা ডাকছি; কিন্তু শক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ, সেইজন ব্রহ্মকে মা বলা। ঠাকুর তাঁর মাকে খুব ভালবাসতেন। স্বামীজী তাও মাকে বকঝকা করতেন, ঝগড়াঝাটিও হত, কিন্তু ঠাকুর খুব ভালবাসতেন মাকে। মাকে নিয়ে যখনই প্রসঙ্গ হত, তখন ঠাকুর মাকে নিয়ে খুব মধুর সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। এই যে বলছেন, মা বড় ভালবাসার জিনিস কিনা, ফলে কি হয় – চট্ করে মন ধরে নেয়। একটা যদি কিছু বোধ থাকে, একটা যদি কোন অভিজ্ঞতা থাকে, তখন ওটা ঈশ্বরের পথে খুব সহজে নিয়ে যাবে। সাধারণ ভাবে আমরা সবাই বলছি, মা খুব ভালবাসার জিনিস, কিন্তু দেখা যায়, ছেলে একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর বা মেয়ে একটু সাবালিকা হওয়ার পর তখনও মাকে একটা আশ্রয় রূপে দেখে ঠিকই, কিন্তু নিজের মনের মত কোন মেয়ে বা ছেলের ভালবাসাটা তখন খুব গভীর হয়ে যায়।

ভাগবতের রাসলীলাতে ওই ভালবাসাটাই ঈশ্বরের ভালবাসায় transform করে দিচ্ছেন। ঠাকুর ওটাই transform করছেন মাতৃরূপে। মা যে কেমন ভালবাসার জিনিস, সবাই জানে মা কি রকম ভালবাসার জিনিস। তোমার ভিতরে যে একটা শক্তি আছে, এই বোধটা যদি তোমার থাকে, তাহলে ওই শক্তিটাকেই তুমি কাজে লাগাও, বাইরে থেকে নূতন করে কিছু আনার দরকার নেই। মহাভারতে এই জিনিসটার উপরই খুব জোর দেওয়া হয়েছে – তোমাকে কিছু হতে হবে না, তুমি যা আছ ঠিক আছ, এটাকেই কাজে লাগিয়ে তুমি নিজের আত্মোন্নতি করতে পার।

মহাভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গীটাকেই ঠাকুর এবার অন্য ভাবে আনছেন। মা বড় ভালবাসার জিনিস, মায়ের প্রতি এই যে ভালবাসা এটা তোমার ভিতরের স্বাভাবিক শক্তি, সবারই হবে না, কিন্তু অনেকরই হবে। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। কারণ ভালবাসা মানেই শ্রদ্ধা, আগে যেটা বলা হল, মনটা পুরো ওই রঙএ রঙে গেছে। ভালবাসা এমন জিনিস, যদিও ছেলে আর মেয়ের ভালবাসাটা superficial, কিন্তু superficial হলেও যতক্ষণ ভালবাসাটা আছে এক অপরের মধ্যে ডুবে আছে, ফোন আর ছাড়ছে না। আগেকার দিনে ফোন ছিল না, কিন্তু চিঠির পর চিঠি লিখেই যেত। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা আরও গভীর কিনা, ভালবাসল মানেই ওই একটার মধ্যে ডুবে গেছে, এবার এক করে দেবে। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। কিভাবে ওই ভাব আনা হবে, ভক্তির মাধ্যমে, ভালবাসার মাধ্যমে, বিশ্বাসের মাধ্যমে; উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া। এক হওয়ার জন্য দরকার ভাব আনা; ওই ভাবটা হল, নারদভক্তিসূত্রে বলছেন *পরমপ্রেমরূপা*, একেবারে একনিষ্ঠ প্রেম।

ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস এই কথা বলে ঠাকুর আবার গান করছেন, যার শেষ দুটি লাইনে বলছেন – 'কালীপদ-সুধাহ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)। তবে পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়'।।

ব্যাখ্যা করে ঠাকুর বলছেন, "**চিত্ত তদ্‌গত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা**"। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা, বিশ্বাস এই জিনিসগুলিকে নিয়ে যখন আলোচনা করা হচ্ছিল বা তার আগে যখন শ্রদ্ধা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল, তখন সেখানে ঠিক এই জিনিসটাই বলা হয়েছিল। উদ্দেশ্যটা হল মন কিভাবে তাঁতে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। কবীর দাস এত বড় সাধক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন যে, যাদের মধ্যে এর অভাব দেখতেন তাদের ব্যঙ্গ করে খুব নামকরা ভজন রচনা করলেন, মন ন রাঙায়ে রাঙায়ে যোগী কপড়া, মনটাকে ঈশ্বরের রঙে রাঙালে না, এদিকে কাপড়টা গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে নিয়েছ। এরও আবার উত্তর আছে, বাইরের রঙটাই আস্তে আস্তে ভিতরে ধরে, রঙ ছাড়ে কিনা, ধীরে ধীরে ভিতরের দিকেও যায়।

যাই হোক না কেন, ভাল করে দেখ সত্যিই কি ঈশ্বরকে পেতে চাওয়াটাই তোমার উদ্দেশ্য কিনা। আমরা তো আসলে ঈশ্বরকে পেতে চাই না। আমাদের চাওয়াটা হল, স্বামীজীর কথায় – বাড়িতে অনেক কিছু আছে, দামী আসবাব আছে, দামী জামা-কাপড় আছে, জাপানী ফুলদানি আছে, তার সাথে ঠাকুর-দেবতাও আছে। ঠাকুর-দেবতা মানে, বাড়িতে একটা গিন্নি আছে, দুটো বাচ্চা আছে, ভাল একটা চাকরি আছে, গাড়ি আছে, এর সাথে ঠাকুরও আছেন। এখানে বিষয়টা হল, যদি কেউ বলে, আমার এসব কিছু লাগবে না, আমি ডুবে থাকতে চাই। গানে ঠাকুর বলছেন, চিত্ত তদ্‌গত হওয়া, তদ্‌গত মানে ডুবে যাওয়া, পুরোপুরি ঈশ্বরে ডুবে যাওয়া, ডুবে যাওয়া মানে এক হয়ে যাওয়া। আর সুধাহ্রদ মানে অমৃতের হ্রদ, ওই অমৃত হ্রদে ডুবে যাওয়া। যে কোন ভালবাসাতে যখন কেউ ডুবে যায়, তখনই তার ব্যক্তিত্ব পালটায়, তার আগে পালটায় না।

সদ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া মা, সব সময় সন্তানে ডুবে থাকে। ছোট্ট শিশুর কান্না শুনে মা ঠিক বুঝতে পারে, ওর এখন খিদে পেয়েছে, নাকি ঘুম পেয়েছে, না অন্য কিছুর জন্য কাঁদছে, কোথাও শিশু বেদনা অনুভব করছে কিনা। মা ঠিক বুঝতে পারে, কারণ মা এখন সন্তানের সাথে এক হয়ে গেছে। যেখানে ভালবাসা, সেখানেও একই জিনিস দেখা যায়, একই রকম চিন্তা, একই রকম ভাবনা দুজনের মনের মধ্যে চলে। তদ্‌গত, দুটো মন এক হয়ে যাওয়া। এগুলোকে নিয়ে নিওরোলজিস্টরা অনেক গবেষণা করছেন সত্যিকারের কি হয়। দেখা যায় যে যাকে ভালবাসে, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে, তাদের মন একই ধরণের তরঙ্গ ছাড়তে থাকে। ঠিক সেই রকম ঈশ্বরে যখন ডুবে গেল, তখন এই বহির্জগৎ, সেখান থেকে যে অন্তর্জগৎ, তারও বাইরে চলে গেল।

ঠাকুর বলছেন, "**ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়**"। পরে কথামৃতেই আমরা দেখব, স্বামীজীকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করবেন, অমৃত ভাণ্ড আছে, আর মনে কর তুই মাছি হয়েছিস, কিভাবে অমৃত পান করবি? নরেন বলছেন, কিনারায় বসে পান করব, তা নাহলে ডুবে যাব। ঠাকুর বলছেন, ওরে অমৃতে ডুবে গেলে মানুষ অমর হয়ে যায়। এগুলো উপমা, উদ্দেশ্য হল জ্ঞানপ্রাপ্তি, অমৃত মানে জ্ঞান, ওই জ্ঞানে যখন ডুবে গেল তখন সে ওই জ্ঞানের সাথে এক হয়ে গেল, জ্ঞান আর জ্ঞাতা অভেদ। এটা সব ধর্মেই বলা হয়, অন্যান্য ধর্মের মহাপুরুষরা একই কথা বলেন। উদ্দেশ্যটা হল ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এটা সবার জন্য নয়, কিন্তু সবার জন্য নয় বলে এই বিদ্যাকে আমরা বাদ দিয়ে দেব, তা তো নয়।

একবার আমি দিল্লী মেট্রোতে যাচ্ছিলাম। আমাকে ফাঁকায় পেয়ে একজন ভদ্রলোক আমাকে ধরেছে, আপনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী? রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী জানার পর বলছেন, 'আপনার কজন ভক্ত আছে'? 'আমার তো কোন ভক্ত নেই, ঠাকুরের আছে'। তিনি নিজের মোবাইলটা বার করে আমাকে দেখিয়ে বলছেন, 'আজকের দিনে এর কত ভক্ত আপনি ভেবে দেখেছেন? আপনি কি ভেবে

দেখেছেন, আপনাদের জীবনে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে'? আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি নীলস বোরের নাম শুনেছেন? জানি শোনেননি, উপদেশ দিচ্ছেন কিনা, যাঁরা উপদেশ দেয় সাধারণ ভাবে তাঁদের বেশী জ্ঞান থাকে না'। বললেন, 'না, জানা নেই'। 'আইনস্টাইনের নাম নিশ্চয় শুনেছেন'? বললাম, 'আইনস্টাইন আর নীলস বোরকে কজন বোঝে, কিন্তু বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চালানো হয় শুধু আইনস্টাইন আর নীলস বোরকে পড়ানোর জন্য। আইনস্টাইন আর নীলস বোর এনারা হলেন ফিজিক্সের প্রণেতা, কজন এনাদের জানেন, কজন এনাদের কথা বোঝেন। কিন্তু শুধু ওই বিদ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এতগুলো ইউনিভার্সিটি চলছে'। তখন ভদ্রলোকের স্টেশন এসে যাওয়াতে নামতে যাচ্ছেন, পাশের ভদ্রলোক তাঁকে বলছেন, 'পড়াশোনা করা সন্ন্যাসী, এনাদের সাথে আলফাল কথা বলতে যেও না'।

যে জিনিসগুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে, এগুলো সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব না, তাই বলে যে আপনি বিদ্যাটাকেই উপড়ে ফেলে দেবেন, তা তো হয় না। আমাদের ঋষিরা কত প্রজন্ম ধরে সাধনা করে করে এই বিদ্যাটা অর্জন করেছেন। আর আজ যদি আমাদের একটু গাফিলতির জন্য এই বিদ্যাটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি সর্বনাশটা হবে, আমরা কেউ কল্পনাই করতে পারব না।

"কেউ কেউ মনে করে, বেশি ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়। এ-যে সুধার হ্রদ! অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে 'অমৃত' বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না – অমর হয়"।

তখনকার দিনে ঠাকুরকে সবাই বলত, পরেও বলত, ঈশ্বর ঈশ্বর করে মানুষটা বেহেড হয়ে গেছে। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য ঠাকুর এই কথা বলছেন। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন একটা কোন কিছুকে নিয়ে খুব চিন্তা করে, পরে বেহেড হয়ে যায়। যার জন্য ইংরাজীতে একটা কথা বলা হয়, Absent minded professor, প্রফেসররা পড়াশোনা নিয়ে এত চিন্তা করেন যে, কোন কিছুতে হুঁশ থাকে না। নিউটনের নামে কাহিনী আছে, উনি এত বড় বৈজ্ঞানিক, মন তাঁর এত কেন্দ্রিত ছিল, ওনার একটা বিড়াল ছিল; বিড়ালটার আসা-যাওয়া করতে অসুবিধা হত বলে তিনি একটা ফুটো করে দিলেন। বিড়ালটার একটা বাচ্চা হয়েছে। ওনার মনে হল বিড়ালের বাচ্চাটা কিভাবে যাবে? ওই ফুটোর পাশে আরেকটা ফুটো করে দিলেন। ওনার এটা খেয়াল হল না যে, যে ফুটো দিয়ে বিড়ালটা যাবে, সেই ফুটো দিয়ে বিড়ালের বাচ্চাটাও আসা-যাওয়া করতে পারবে।

কিন্তু এর থেকেও বেশি আসে গ্রীক কাহিনীগুলিতে। আমাদের ভারতের গল্পগুলো একটু আইডিয়ালিস্টিক, পাশ্চাত্যের গল্পগুলো রিয়ালিস্টিক। গ্রীক ট্রাডিশানে দুটো খুব নামকরা গল্প আছে, একটা হল পিগমালিয়ান, যার উপর পরে বার্ণার্ড'শ মাই ফেয়ার লেডি নাটক লিখলেন। দ্বিতীয় গল্প হল নার্সিসিয়াস। পিগমালিয়ানের কাহিনী হল, একটা লোক এত সুন্দর প্রতিমা বানিয়েছে যে নিজের প্রতিমাকে নিজেই ভালবেসে ফেলেছে। প্রতিমা দেখে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছ, প্রতিমার সামনে থেকে সে আর সরে আসছে না। নার্সিসাসও ঠিক সেই রকম। ওকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। একবার পুকুরের জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছে, নিজের প্রতিবিম্বকে দেখে সে নিজেকে এত ভালবেসে ফেলেছে যে, সে জলের ধারে বসে শুধু নিজের প্রতিবিম্ব দেখে যাচ্ছে। সবাই এসে ওকে বোঝাচ্ছে, নার্সিসাস তাদের কোন কথা শুনছে না। সারাদিন সারারাত নিজের ছবি দেখতে দেখতে না খেয়ে ওখানেই মরে গেল।

যে কোন একটা জিনিসকে নিয়ে কেউ যদি সব সময় ভাবতে থাকে বা চিন্তা করতে থাকে, একটা সময় সে বেহেড হয়ে যায়। সেখান থেকে লোকেরা মনে করে, মানুষ যদি বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করে তার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। পরে ঠাকুর বলবেন, ঈশ্বর তো আর জাগতিক কিছু না, জাগতিক জিনিসকে নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা করলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তনে, চৈতন্যের চিন্তন করলে মানুষ মরে যায় না, সে অমর হয়ে যায়। আবার ঠাকুর বলছেন –

"পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু না। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহলে আর এ-সব কর্মের বেশি দরকার নাই"। কর্ম মনের শুদ্ধির জন্য করা হয়। মন তমোগুণে থাকে, কিছু করতে চায় না, যেটা ভারতের সব থেকে বড় রোগ, ভারতে মূলতঃ তমোগুণের প্রাধান্য। ভারতীয়দের মানসিকতা হল, আমি বসে বসে কাটাব, কাজ করব না, মাইনেটা ঠিক সময়ে পাওয়া চাই। একবার বেলুড় মঠের পোস্ট অফিসে একটা পোস্টাল অর্ডার কনভার্ট করার ছিল। ওখানে যে ভদ্রলোক কাজ করেন, তাঁকে বলা হল। উনি আবার ইউনিয়নের লিডার। ওনাকে শুধু একটু হিসাব করতে হবে কত ডলারে কত টাকা হবে, আজকে ডলার আর টাকার এ্যক্সচেঞ্জ রেট কত জেনে নিয়ে সেটা দিয়ে গুণ করবে; সেটাই উনি করবেন না। ওই নিয়ে আমাকে গালাগাল, আমাদের ইউনিভার্সিটিকে গালাগাল, নিজের পোস্টমাস্টারকে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাতে লাগলেন।

এরা হল তমোগুণী। যারাই চাইছে কাজ করব না, মাইনে পাব আর বসে বসে খাব, একেবারে ঘোর তমোগুণী। কর্ম করলে তমোগুণের বিষটা কমতে থাকে। এই তমোগুণকে দূর করার জন্যই স্বামীজী এত কাজের তোড় নিয়ে এলেন – দেশসেবা করা, মানুষের সেবা করা, স্কুল চালানো, হাসপাতাল চালানো, বন্যাত্রাণ, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ ইত্যাদি। তমোগুণ কমলে আসে রজোগুণ। রজোগুণ এলে কি হয়, তুমি বাঁচ আর নাই বাঁচ, আমি রাজা আমি লুটেপুটে খাব। এই রজোগুণকে এবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রজোগুণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দরকার সাধুসঙ্গ। ঠাকুর এটাই বলছেন, পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ এই কর্মগুলো ধীরে ধীরে তমোগুণকে কাটায়। এরপর নিষ্কাম ভাবে করলে রজোগুণটা কেটে যায়। কর্ম করলে তমোগুণ যাবে, কিন্তু রজোগুণ এসে যাবে, সেটা অন্য দিক থেকে ক্ষতি করবে। নিষ্কাম ভাবে করলে তখন রজোগুণটা চলে গিয়ে সত্ত্বগুণ এসে যায়। এরপর কর্ম আপনাকে আর নিয়ে যেতে পারবে না, সে আপনি যতই পূজা করুন, জপ করুন, ধ্যান করুন, মন্ত্র পাঠ করুন। নিষ্কাম কর্ম আসে একমাত্র সাধুসঙ্গে আর শাস্ত্রপাঠে।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এত এগিয়ে গেছে এই রজোগুণের জোরে। বড় বড় কাজ করছে, লোকের উপকার করছে, সবই করছে কিন্তু সত্ত্বগুণ বলতে যেটা বোঝায় সেটা তাদের মধ্যে নেই। রজোগুণী বলে আমরা ওদের নিন্দা করি, কিন্তু জানি না যে, আমরা নিজেরা কতটা ঘোর তমোগুণী। তখন ঠাকুর বলছেন, তাঁর উপর ভালবাসা এলে এ-সব কর্মের আর বেশী দরকার পড়ে না, কারণ সে কর্ম করে করে শুদ্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলবেন, এই জগতে আসা কিছু কর্ম করার জন্য। কর্ম করা কেন? ভিতরে যে তমোগুণ রয়েছে, যে তমোগুণ আমাদের শুইয়ে রেখেছে, সেখান থেকে তোলার জন্য। একবার উঠে গেলে আর কিসের কর্ম দরকার।

"যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার"?

যখন সত্ত্বগুণ এসে গেল, যিনি সত্যিই ঈশ্বরের দিকে এগোতে চাইছেন, তাঁর আর এগুলো লাগবে না। কারণ তাঁর মনে পরিষ্কার এই সঙ্কল্প ছিল আমি ঈশ্বরের দিকে যাব। বাকিরা যারা কথায় কথায় ঈশ্বরের নাম নেয়, কথায় কথায় বলে আমি ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছি; চোখ-কান বন্ধ করে জানবেন এরা শতকরা নিরানব্বুই পয়েন্ট নয় ভাগ তমোগুণী, এদের দ্বারা কিছু হবে না। রজোগুণ এলে অনেক রকমের দুর্গুণ দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু তাও রজোগুণ তমোগুণের থেকে অনেক ভাল। তমোগুণ হল একটা পাথর। রজোগুণ হল এবার সে কিছু করছে, চুরি-চামারি করছে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ করছে, কিছু করছে; এরপর ওকে গাইড করে সৎপথে নিয়ে আসা যাবে। এরপর ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে খুব নির্দিষ্ট করে বলছেন।

“তুমি যে-সব কর্ম করছ, এ-সব সৎকর্ম। যদি ‘আমি কর্তা’ এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পার, তাহলে খুব ভাল”।

আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে কর্মযোগে এটাই বলছেন। কর্ম অবশ্যই করবে, কর্ম না করলে তো চিত্তশুদ্ধি হবে না। *অহং কর্তা*, আমি কর্তা এই ভাব নিয়ে কর্ম করবে, কিন্তু *ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*, ঈশ্বরের জন্য আমি চাকরের মত করছি। ঠাকুর যে এখানে বলছেন, ‘আমি কর্তা’, একই কথা বলছেন, ‘আমি’, অর্থাৎ আমার আমিত্বটা যেন না থাকে। আমরা আগে উল্লেখ করেছিলাম, বাড়ির যে সেবক, সে মুখে বলে, এটা আমার বাগান, এটা আমার, সেটা আমার, কিন্তু মনে মনে ভাল করে জানে এগুলো কোন কিছুই আমার না। ওই ভাব নিয়ে কর্ম করার কথা বলা হচ্ছে, এটা ঈশ্বরের কাজ, কিন্তু আমি করছি।

“এই নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়”।

এটাই কর্মযোগ। একটা হল, কাজ করা খুব দরকার, কাজ না করলে তমোগুণী হয়ে থাকবে; সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করার দিকে যেতে হবে। নিষ্কামকর্ম করতে করতে সত্ত্বগুণের দিকে চলে যাবে। যদি তখন মাথায় থাকে, আমাকে ঈশ্বরের দিকে যেতে হবে, এরপর এমন কি একটা কিছু হয়ে যায় যার কোন ব্যাখ্যা নেই, আমরা জানিও না; যেমন সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে আমরা জানি না, ঠিক তেমনি জ্ঞান কিভাবে হয়, আমাদের কাছে কোন উত্তর নেই। স্বর্গ থেকে পতন কিভাবে হয়েছে, আমাদের জানা নেই। খ্রীশ্চানরা খুব সহজ ভাষায় বলে দেয়, আদম আর ঈভ স্বর্গের আপেল খেয়েছিল বলে পতন হয়ে গেল; এটা ধর্মের সহজীকরণ। আসলে আমরা জানি না, এই মায়া কোথা থেকে কিভাবে এসেছে। ঠিক তেমনি মায়ার নাশ কিভাবে হয়, সেটাও কেউ জানে না। কিন্তু এটা জানা আছে, একবার যখন পড়ে গেল, তখন জগৎ কিভাবে চলে এটা আমরা জানি; ঠিক তেমনি ফেরত যাওয়ার জন্য কি করতে হয়, সেটাও আমরা জানি। কিন্তু ওই বিভাজন রেখার ব্যাপারে নামার সময়েও জানা নেই, উপরে যাওয়ার সময়েও জানা নেই। মন একেবারে যখন শুদ্ধ হয়ে গেল, তখনও ঈশ্বরের প্রতি টান আছে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর যেমন মা কালীর দর্শন পেলেন, ঠিক সেই ভাবে ঈশ্বরীয় জ্ঞান হয়ে যায়।

“কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে”।

কর্ম করে যাওয়া মানে, স্থূল ভাবে কর্ম কমে যাবে, ঠিক তা না। Sense of responsibilityটা কমে যায়। প্রথম হল যারা কাজ করে না, এরা অনেক রকম অজুহাত বার করবে যাতে কাজ না করতে হয়। দ্বিতীয় হল যারা কাজ করে, এরা নিজেকে সব কাজে প্রাধান্য দেবে, ক্ষমতাটা আমি ধরে রাখব, সব কাজে ‘আমি’টা প্রথমে থাকবে। এই ‘আমি’ ভাব চলে যাওয়ার পর, ঠাকুরের অশেষ কৃপা হলে এই আমি ভাব যায়, তা নাহলে সহজে যায় না; এদের মধ্যে তখন আসে Sense of responsibility। ঠাকুর বলছেন, মা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন। অনেককেই দেখবেন সংসারে কেউ নেই, থাকলেও সে-রকম কোন দায়-দায়ীত্ব নেই, কিন্তু নিজে থেকেই একটা কিছুকে টেনে এনে ওর মধ্যে সারাক্ষণ ডুবে থাকবে। রাস্তা থেকে একটা বিড়ালকে ঘরে এনে তাকে খাওয়ানো, শোওয়ানো, এটা সেটা করতে থাকবে। সেখান থেকে বিড়ালের প্রতি তার একটা দায়ীত্ববোধ তৈরী হয়ে যায়।

এটাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেটা আমার নয়, সেটাকে নিয়েই বেশী লাফালাফি করতে থাকি, সত্যিকারের এটা একটা সমস্যা। সাধু-সন্ন্যাসীদের এই সমস্যা খুব বেশী হয়। কোন কিছুতে নেই, কিন্তু কোন গৃহস্থ ভক্তের একটা কোন সমস্যা নিয়ে আগ বাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু

করে দিল। লঙ্কায় রাবণ মল, বেহুলা কেঁদে আকুল হল। কোন প্রয়োজন নেই, কেউ আপনার সাহায্য চাইছে না, আপনার হস্তক্ষেপ কেউ চাইছে না, কিন্তু আমরা গায়ের জোরে একটা দায়ীত্ববোধ চাপিয়ে লাফালাফি করতে থাকি। ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীমা শোকাতুরা, কোন দিকে তাঁর মন নেই। হঠাৎ দেখছেন মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে রাধু কাঁদছে। ওই দেখে মায়ের মধ্যে থপ্ করে যেন একটা মায়ার আবরণ এসে গেল। মাকে এবার রাধুর সাথে জুড়ে দিল ওই দায়ীত্ববোধ – ওকে কেউ দেখার নেই, আমিই দেখব। কিন্তু মা হলেন সাক্ষাৎ জগদম্বা, তাঁর মধ্যে মায়ার আবরণ থাকবে না, কিন্তু যে পদ্ধতিতে মা মায়ার আবরণ নিয়ে এলেন, ঠিক এই পদ্ধতিতেই সব ক্ষেত্রে হয়। তারপর যখন মায়ের লীলাসংবরণ করার সময় এসে গেল, তখন তিনি রাধুকে ও রাধুর ছেলেকে নিজের কাছ থেকে একেবারে সরিয়ে দিলেন।

আমার আপনার ক্ষেত্রে বন্ধন এত নাটকীয় ভাবে আসে না, আর বন্ধন কাটানোটাও এত নাটকীয় ভাবে হয় না। আমাদের ক্ষেত্রে বন্ধন স্বাভাবিক ভাবে আসে, আর যাওয়াটাও স্বাভাবিক ভাবেই যায়। গঙ্গায় যে বান আসে, বান এক ভাবে আসে আবার ভাটা অন্য রকম হয়। ট্যাপের জল এক ভাবেই পড়ে, এক ভাবেই বন্ধ হয়। আমরা হলাম ট্যাপের জল, দায়ীত্ববোধ আমাদের ঘিরে রেখেছে। প্রথমে আমরা হলাম অলস, অলসতা থেকে বন্ধন হয়ে যায়; আমার চাই, আমার চাওয়া থেকে ধীরে ধীরে চলে আসে দায়ীত্ববোধ। পরের ভাল করা, এই জিনিসটা যত বয়স বাড়ে তত অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু যাদের সত্যিকারের সমস্যা আছে, যে সমস্যার জন্য সে ঈশ্বরে পুরোপুরি মন দিতে পারছে না, কারণ মায়ের বয়স হয়েছে, বাবা অসুস্থ, এদের দেখার কেউ নেই, সেখানে সত্যিকারের একটা দায়ীত্ববোধ রয়েছে। আমরা যে আবর্জনার বর্ণনা করলাম, এখানে ঠাকুর ওগুলোর বর্ণনা করছেন না। এখানে বর্ণনা করছেন, কামনা-বাসনা যা কিছু আছে, সেটা যখন চলে গেল, যেখানে দায়ীত্ববোধ রয়েছে, এটাকে আস্তে আস্তে ঈশ্বর কমিয়ে দেন।

কামনা-বাসনাগুলিকে আমাকে বের করে দিতে হবে; একটা গাড়ি আছে, দুটো গাড়ি লাগবে, এটা চাই, সেটা চাই, এই চাই চাইটাকে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এই নিয়ন্ত্রণ ঠাকুর কক্ষণ করবেন না। এগুলো নিয়ন্ত্রণ হয়, যখন ঈশ্বরের দিকে মন যায়। ঈশ্বরের দিকে মন যাওয়ার পর যে দায়ীত্ববোধগুলি থাকে, সেগুলোকে ঠাকুর কমিয়ে দেন, যাতে আরও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে। যদি দেখা যায় একটার পর একটা দায়ীত্ব আসতে থাকে, তাহলে বুঝবেন এখনও আপনার দেরী আছে। ঠাকুর কর্ম কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা উপমা দিয়ে বলছেন।

গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি তার কর্ম কমিয়ে দেন। শাশুড়িরা তখনও বউমাদের খাটাতো, এখনও খাটাচ্ছে, এখন অবশ্য বেশী অত্যাচার করলে বউমা ৪৯৮ ধারায় কেস ঠুকে দেবে। কিন্তু আগেকার দিনে বউমাদের উপর খুব অত্যাচার করত। এখন বউমারা বদলা নিচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে বউমাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সেটাই এখন সমষ্টি পাপ হয়ে শাশুড়িদের উপর চাপছে। বউমা অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি ঠিক করে দিত একে দিয়ে কতটা কাজ করানো যেতে পারে। যত মাস এগোতে থাকত তত বউমার কাজ কমিয়ে দিচ্ছে। ঠাকুর যে সমাজে ছিলেন, তিনি যেটা দেখেছেন, সেটাকে তিনি উপমার জন্য ব্যবহার করছেন, যাতে সহজে লোকেরা বুঝতে পারে।

"তুমি যে-সব কর্ম করছ এতে তোমার নিজের উপকার"।

এটা একটা অত্যন্ত দরকারী কথা। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যে কাজই করছি, এই কাজ আমার নিজের ভালর জন্যই করছি। এটা যদি আপনার বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে আপনি এই জিনিসটাকে সব সময় মনে রাখবেন – আপনি যত ভাল খাবারই খান, যত ভাল পানীয় পান করুন না কেন, বাহ্য-প্রস্বাব যদি বন্ধ হয়ে যায় আপনি মারা যাবেন। শুধু এই উপমাটা মাথায় রাখবেন, কাজ মানে বাহ্য-প্রস্বাব। প্রস্বাব করলে অন্যের কারুও ভাল হয় না, নিজের ভালই হয়। ঠিক তেমনি কাজ

করলে অপর কারুর ভাল হয় না, নিজের ভাল হয়। এই জিনিসটাকে যিনি ভাল করে বুঝে নেবেন, *কর্মবন্ধং প্রহাষ্যসি*, কর্ম বন্ধন আপনাকে ছেড়ে দেবে।

আমাকে কোন সন্ন্যাসী ভাইরা বা যে কেউ যখন বলেন, 'এই যে তুমি এত বই লিখছ, এতে কিছু লোকের তো মঙ্গল হচ্ছে'? আমি সবাইকে এটাই বলি – 'ভাই আমি এত আত্মকেন্দ্রিক লোক যে, আমি কোন দিন নিজের মঙ্গল ছাড়া কিছু চাই না। আমার হাতে প্রচুর সময় আছে, সময় কাটাতে না পারার জন্য যাতে পাগল না হয়ে যাই বই লিখি'। মানুষ যখন নিজের সন্তানকে ভালবাসছে, নিজের ভালর জন্যই ভালবাসছে; অপর কাউকে ভালবাসছে, নিজের ভালর জন্য; চাকরি করছেন নিজের ভালর জন্য, কারণ চাকরি যে টাকা পাচ্ছেন ওটা দিয়ে আপনার পেট চলছে। এই জিনিসটাকে যে বোঝেনি, বুঝতে হবে সে একটা তমোগুণী লোক। কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু তমোগুণী।

"নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই করছেন; যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু-ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে-লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে"।

স্বামীজীর খুব নামকরা কথা, world is like dog's curly tail, এটাকে নিয়ে একজন মহারাজ মজা করে বলতেন সপুচ্ছবাদ সিদ্ধান্ত। প্রথম সিদ্ধান্ত হল, এই জগৎটা হল কুকুরের লেজ। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত – এই লেজকে কোন দিন সোজা করা যাবে না। তৃতীয় সিদ্ধান্ত, তাও তুমি কুকুরের লেজকে সোজা করার চেষ্টা করতে থাকবে। চতুর্থ সিদ্ধান্ত – কারণ এতে তুমি নিজে সোজা হয়ে যাবে। এই চারটে সিদ্ধান্তকে নিয়ে বলা হয় – সপুচ্ছবাদ। তুমি করবে জগতের ভাল? কি ভালটা তুমি করবে? যিনি এই চন্দ্র-সূর্য করেছেন সেখানে তুমি করার কে? তাও তোমাকে কাজ করতে হবে, কারণ কাজ করতে গেলে তুমি নিজেই সোজা হয়ে যাবে। মা-বাবা দুর্ঘটনায় মরে গেলে কি তাদের সন্তানরা বড় হয় না? কেউ একজন ঠিক তাকে তুলে নিয়ে বড় করে দেবে; এই ধরণের কত ঘটনা আছে। স্টিভ জবস্ এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব, তিনি একজন অরফ্যান্, কিন্তু কোথায় তাঁকে নিয়ে চলে গেল। আমরা মনে করছি, আমরা বিরাট কিছু করছি, কিছুই করছি না। আগে নিজের ভাল করুন, অপরের ভাল করার চেষ্টা করতে হবে না। ভক্তরা এসে যখন মাঝে মাঝে আমাদের বলেন, মহারাজ এটা আপনার ভালর জন্যই বললাম। তখন আমি সব সময় তাঁদের হাতজোড় করে এটাই বলে দিই, প্লীজ্ আপনি নিজের ভালটা ভাবুন, আমাকে ছেড়ে দিন। বাচ্চা বয়স থেকে আমাকে ভাল করতে এসে আমার মাস্টাররা পিটিয়েছে, বাবা-মা ধরে মার দিয়েছে। সারা জীবন মারই খেয়ে যাচ্ছি, আমার আর ভাল লাগবে না। যারা আমার ক্ষতি করতে চাইছে তারা অনেক ভাল, কিন্তু যারা আমার ভাল করার চেষ্টা করেছে, তাদের কাছে আমি বেশি কষ্ট পেয়েছি। আমিও তাই এখন কারুর ভাল করার চেষ্টা করি না। এরপর ঠাকুর এই প্রসঙ্গটা শেষ করছেন, বিদ্যাসাগর মশাই কতটা বুঝতে পারবেন আমাদের জানা নেই।

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই"। এতক্ষণ ঠাকুর যত রকমের ভদ্রলোক সেজে ছিলেন, এবার ভদ্রলোকের সব সাজগোজ খসে পড়ে যাচ্ছে, একদম সরাসরি ধাক্কা মারছেন। তুমি পণ্ডিত, তোমার নাম আছে, দান আছে, সব আছে, আমার থেকে বয়সে বড়, কিন্তু তুমি নিজেকে জান না, অথচ তোমার ভিতরে সোনা আছে।

এখানে দুটো কথা, সোনা সবারই ভিতর আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই এত উচ্চমানের যে, ওই সোনাটা যেন একটুতেই বেরিয়ে আসতে পারে। স্বামীজী যখন বলছে, each soul is potentially divine, তখন তিনিও এটাই বলছেন – অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ক্ষেত্রে সোনার উপর আবরণটা যেন একেবারে ক্ষীণ।

ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, "**একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বউ-এর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে; ওইটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া, আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না**"। (সকলের হাস্য)

এরপর ঠাকুর কাঠুরের এগিয়ে পড়ার বিখ্যাত কাহিনীটা বলছেন। এক কাঠুরে বনে কাঠ কাটত। একজন ব্রহ্মচারী তাকে বলে দিলেন, তুমি এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাওয়া বলার উদ্দেশ্যটা হল, যে পথেই থাক, জীবনে কোথাও কখন থেমে পড়বে না, সব সময় এগিয়ে যেতে হবে। দুটো জিনিস – ব্রহ্ম আর শক্তি; হয় তোমাকে পুরোদমে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, নয়তো শক্তির দিকে পুরোদমে এগোও, মাঝখানে যদি থাক তাহলে ঢ্যামনা হয়ে মরতে হবে। দুটোর মধ্যে একটাকে জয় করে দেখাও। হয় আপনাকে শক্তি দিকে এগিয়ে শক্তির খেলা দেখাতে হবে, তা নাহলে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য সব কিছু ত্যাগ করে দিন। হয় বলুন, আমি জগৎকে জয় করে দেখাবো, আমার মুঠোর মধ্যে জগৎকে নিয়ে আসব, নয় বলুন আমি ঈশ্বরকে পেতে চাই, সব কিছু ত্যাগ করে দিলাম। মাঝামাঝারিতে থাকা মানেই কেউ আপনার খবর নেবে না। মাঝামাঝারিতে থাকলে কেউ এসে লাথি মারবে, ক্যাঁ ক্যাঁ করে কাঁদবেন, এর কাছে ওর কাছে দৌড়াবেন; আজকে পুলিশের কাছে, কাল নেতার কাছে, পরশু প্রেসের কাছে, পরের দিন কোর্টের দরজায়। আপনার যদি ক্ষমতা থাকে, আপনাকে সার্ভিস দেবে, সহানুভূতি জানাবে; আর ক্ষমতা যদি না থাকে, আপনার সামনে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

ঠাকুর বলছেন, কাঠুরে যেমন এগিয়ে গেল, সেই রকম সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে, এরপর বলছেন, "**নিষ্কামকর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি**"। (সকলে নিঃশব্দ)

তাঁর কৃপা নিয়ে আগে আগে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। তাঁর কৃপা কিভাবে হয়, কেন তিনি কৃপা করেন কেউ জানে না, জানার কোন উপায় নেই। ঠাকুর অনেক উদাহরণ দেবেন, তার মধ্যে একটা হল, নদী থেকে জল আনার জন্য যে খাল কাটা হয়, সেখানে পুরোটা না কেটে একটু অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়। জলের তোড়ে ওটুকু না কাটা অংশটা এমনিতেই ভেঙে যায়। ঠাকুর একটা উদাহরণ দিচ্ছেন। বড় গাছ কাটার সময়ও তাই করা হয়, একটু বাকি থাকতে কাটা বন্ধ করে দেয়, গাছের ভাড়ে গাছটা এমনিতে ভেঙে পড়ে যায়। তার সাথে ঠাকুর এই যে বলছেন, ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। এটাই ultimate test, ঈশ্বর সরাসরি কথা বলেন। অন্যান্য যে লক্ষণগুলি রয়েছে, যেমন জগতের সব কিছুর ত্যাগ, অথচ সবারই প্রতি করুণ, সবারই প্রতি ভালবাসা, এগুলো থাকবে। জপধ্যান থাকবে, তপস্যা থাকবে, তার সাথে এটাও আছে। শুধু একটা লক্ষণ দিয়ে হয় না, অনেকগুলি লক্ষণ থাকে। এরপর সপ্তম পরিচ্ছেদে আসছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু

"**সকলে অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। যেমন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে, নয়টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন**"। এখানে ব্যখ্যা করার কিছু নেই, রাত হয়ে আসছে, ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর ফিরতে হবে। ঠাকুর অনেককেই ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে নেওয়ার জন্য বলতেন। বিদ্যাসাগর মশাইকে ঠাকুর বলছেন।

“শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) – এ-যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন – তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য) **বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে। বরুণ রাজার খপর নাই”!**

ঠিকই বলছেন, আসলে আমরা সবই জানি, কিন্তু মনে করিয়ে দিতে হয়। মহাভারতে বর্ণনা আছে, যুদ্ধের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। তারই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে গিয়ে সোজা কুন্তির কাছে চলে গেলেন। কুন্তিকে গিয়ে বলছেন, পাণ্ডবদের জন্য আপনার কোন সন্দেশ আছে? কুন্তি তখন শ্রীকৃষ্ণকে বিদুলা উপখ্যান বলেন। বিদুলা উপাখ্যানে বিদুলা একজন রানী ছিলেন, তিনি তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন, তোমার মধ্যে তেজ নিয়ে এসো, তেজে ভরপুর হয়ে যাও। যুদ্ধ শেষ হয়ে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী বনে চলে যাচ্ছেন, সেই সময় কুন্তিও বনে যেতে চাইছেন। খবর পেয়ে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইয়েরা দৌড়ে এসে বলছেন, ‘মা! বনেই যদি তোমার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাহলে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে কেন তুমি বিদুলার সংবাদ পাঠিয়েছিলে’। কুন্তি তখন খুব সুন্দর বলছেন, ‘বনবাসে থেকে থেকে তোমাদের তেজ তখন ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের তেজকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য আমি ওই সংবাদ পাঠিয়ে ছিলাম’। আমাদেরও একই জিনিস হয়, আমরা সবই জানি, কিন্তু তেজটাকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে একটু খোঁচা দেওয়ার জন্য কিছু বলতে হয়। বিদ্যাসাগর মশাই বয়সে বড়, ভিতরে একটা অহং ভাব আছে, বলছেন।

“বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) – তা আপনি বলতে পারেন”। ঠাকুরও হাসতে হাসতে বলছেন, **“শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম (সকলের হাস্য) – বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে”**। সবাই কথা শুনে আনন্দ উপভোগ করছেন। ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগর মশাইকে বলছেন। **“শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা”**। ঠাকুর কি করে বলবেন – আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, সেইজন্য এ-ভাবে বলছেন। যদিও ঠাকুর রেগে গেলে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলে দিতেন, কিন্তু ঠাকুর জানতেন কিভাবে একজনের সাথে কথা বলতে হয়। ঠাকুর এখানে খুব মিষ্টি করে কথা বলছেন, চেষ্টা করছেন কিভাবে এনাকে ঈশ্বরের পথে আনা যায়।

“বিদ্যাসাগর – যাব বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না”! এখনও এই রীতি চলে, আপনি এসেছেন, আচ্ছা আমিও আপনার কাছে যাব।

“শ্রীরামকৃষ্ণ – আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর – সে কি! এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন”। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কথাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলছেন।

“শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – **আমার জেলেডিঙি।** (সকলের হাস্য) **খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পার। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়।** (সকলের হাস্য)

এগুলো সাধারণ কথাবার্তা। এখানে কেউ কাউকে ঠেস দিয়ে কিছু বলছেন না। আমরা যখন কথা বলি, আমাদের কথার মধ্যে অপরকে একটা ঠেস দিয়ে কথা বলার প্রবণতা থাকে। অনেক আগে আমাদের এখানে একজন ক্লাশ করতে আসতেন। অনেক দিন ক্লাশ করার পর তিনি ক্লাশে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি জানতাম না কেন ক্লাশে আসছেন না। একদিন ওনার সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ক্লাশে আসা বন্ধ করে দিলেন কেন’? উনি বললেন, ‘কি করে আপনার ক্লাশ করি, আমার কি সেই যোগ্যতা আছে যে আপনার ক্লাশ করব’? আমিও ওনাকে বললাম, ‘ঠিকই, ঠাকুরও বলেছিলেন, গুরু শিষ্যকে তামাক সাজতে বলাতে শিষ্য ঠিক এই উত্তরটাই দিয়েছিলেন, আমি কি আপনার তামাক সাজার যোগ্য’!

বেশির ভাগ লোকেরা কথা বলার সময় হয় নিজেকে জাহির করার চেষ্টা থাকে, আর তা-নাহলে বিছে যেমন দংশন করে, সেই রকম কথা দিয়ে দংশন করতে চায়। এখানে ঠাকুরের কথার মধ্যে এসব কোন কিছু নেই, একটা কমনীয় ভাব, কথাটাও মিষ্টি, হাসিটাও মিষ্টি। বলা হয় যে, পরিহাস করতে হয়, কিন্তু উপহাস করতে নেই। কিন্তু প্রায়ই আমরা ভুল করে ফেলি, আমাদের 'হাস'টা থাকে, কিন্তু পরিহাস আর উপহাসের তফাৎটা ভুলে যাই। প্রায়ই আমরা মনে করি যে, আমি পরিহাস করছি, কিন্তু নিজের ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি আসলে উপহাস করতে চাইছেন। ঠাকুর এখানে পরিহাস করছেন। যাই হোক, বিদ্যাসাগর সহাস্যবদনে চুপ করে আছেন, ঠাকুর হাসছেন।

"**শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – তার মধ্যে এ-সময় জাহাজও যেতে পারে।**

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) – হাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে"। (সকলের হাস্য)। এর মধ্যে মাস্টারমশাই আবার নিজের মনে ভাবছেন, নবানুরাগের বর্ষা। কিন্তু আমরা জানি কোন অনুরাগই হয়নি।

ঠাকুর এবার যাবেন, গাত্রোত্থান করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। মাস্টারমশাই দেখছেন, ঠাকুর করে মূলমন্ত্র জপ করছেন। সাধু-সন্ন্যাসীরা এই জিনিসটা করেন, ওনারা কোথাও গেলে, কারুর বাড়ি গেলে একটু জপ করে দেন। কারণ সাধু-সন্ন্যাসীদের তো দেওয়ার কিছু নেই কিনা, কিন্তু দেওয়ার মত এই জিনিসটাই আছেন, যেখানে গেছেন সেখানকার সবার মঙ্গলের জন্য, বা কারুর মাথায় হাত রেখে করে একটু জপ করে দিলেন – আমার এটাই সম্পদ, ঠাকুরের নামে এটা তোমাকে দিলাম।

মাস্টারমশাই বলছেন – "**অহেতুক কৃপাসিন্ধু! বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন**"।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে লণ্ঠনের আলোতে দেখেন বাইরে বলরাম বসু দাঁড়িয়ে আছেন। বলরামবাবু বললেন, আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। ভিতরে কথাবার্তা হচ্ছিল, আপনার কথাবার্তা সবাই শুনছিল, তার মধ্যে আমি চলে গেলে বিরক্ত করা হবে।

বিদ্যাসাগর মশাই মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাড়া কি দেব? এতটুকু বুঝেছেন যে, সাধুপুরুষ ভাড়া কোথায় পাবে। মাস্টারমশাই বলে দিলেন, আজ্ঞা দরকার নেই, ও হয়ে গেছে। ভাড়া দেওয়ার প্রথাটা এখনও আছে। বিবাহ আদিতে অতিথিরা যাঁরা আসেন তাঁদের ভাড়া নিমন্ত্রণবাড়ির কর্তা দিয়ে দেন। বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। ঠাকুরের গাড়ি এবার দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করল। এরপর মাস্টারমশাই নিজের মত ব্যাখ্যা করছেন।

গাড়ি উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া দিল। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যাইবে। এখনও সকলে গাড়ির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর বলছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

ঠাকুরের জীবনের দিকে যদি আমরা তাকাই, আমরা এই একই দৃশ্য দেখতে পাই। যেখানেই ঠাকুর দেখতেন একটু আধ্যাত্মিক প্রকাশ আছে, সেখানেই ঠাকুর তাকে ধরে তার ভিতরে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশকে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।